দ্বিতীয় পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৭০০০০৬

স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী

স্মরণে

# ভূমিকা

কবিগুরুর মতো আমারও বলতে ইচ্ছা করে,

"এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই !"

প্রবন্ধে আমার কথা আমি অবাধে বলতে পারি, কিন্তু উপন্যাসে আমি যা খুশি লিখতে পারিনে। বাইরের আদেশে নয়, অন্তরের নির্দেশে আমি এমন সব কথা লিখি যা আমার কথা নয়, যা চরিত্রের কথা। তারা আমার সৃষ্ট হলেও আমার হাতের পুতুল নয়। যে যার স্বভাবের অনুসরণ করে। যার যা নিয়তি। আমি নিজেই ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখে বিস্মিত। ওরা আমার ইচ্ছামতো বাঁচবে না, যে যার ইচ্ছামতো বা বিধাতার ইচ্ছামতো বাঁচবে। আমি আমার মনটাকে খোলা রেখেছি।

এক বন্ধু প্রথম পর্ব পড়ে প্রশ্ন করেন, "এইসব চরিত্র কি আপনি মডেল দেখে এঁকেছেন ?" এব উত্তরে আমি বলি, "কোনো একটি চরিত্রের মডেল কোনো একজন নয়। একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তাই কাউকে চিনতে পারা যাবে না। চিনলে সেটা ভুল হবে ! কিন্তু এমন কথা আমি বলব না যে এঁরা সবাই আমাব কপোলকল্পিত।"

বই চার পর্বে শেষ হলে আমি আরো একটা স্বীকারোক্তি করব। তার দেরি আছে। আগে তো দেখি কার কী গতি হয়। আমিও কি জানি ?

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমি জানি। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ক্রমপরিণতি আমি জানিনে। লিখতে লিখতে জানতে পারব। উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশযাত্রা। এটা ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। আরম্ভের পূর্বে এর থীম্ ছিল রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। লিখতে লিখতে তার থেকে সরে এসেছি। উপন্যাস তার নিজের নিয়মেই চলে। আমাকেও সে নিয়ম মানতে হবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

# ক্রান্তদর্শী

( দ্বিতীয় পর্ব )

## ॥ এক ॥

দীপিকা বৌদির আদরের কুকুর এল্‌ফ স্বপনদার পায়ের কাছে চোখ বুজে শুয়েছিল। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথমটা গরর গরর করে, তার পরে ঘেউ ঘেউ করে দরজার দিকে তেড়ে যায়।

দরজার ওপার থেকে আওয়াজ আসে, "আসতে পারি ?"

স্বপনদা ফরাসী ভাষায় উত্তর দেন, "আঁত্রে।" উনি তখন মনে মনে প্যারিসে বাস করছিলেন। টেবিলের উপর একরাশ ফরাসী পত্রিকা খোলা। সেসব তিনি জার্মান দখলী ফ্রান্স থেকে বাঁকা পথে সংগ্রহ করেছেন।

বাবলী ঘরে ঢুকে বলে, "এটাকে তো আমি আগে কখনো দেখিনি। বাপ রে! কী বিকট গর্জন! যেন চোর কি ডাকাত পড়েছে।"

"ওঃ তুমি!" স্বপনদা চেয়ার ছেড়ে উঠে বাবলীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলেন, "আমার প্রিয় বোন চকোলেট। আমার প্রিয় বোন চকোলেট।" বলতে বলতে আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়। চোখে জল এসে পড়ে।

"কই, বৌদি কোথায় ?" বাবলী তার হাত থেকে ফুলের সাজি নামিয়ে রেখে বলে, "তোমাদের বিয়েতে আমি যোগ দিতে পারিনি। জেলের বাইরে থাকলেও ওসব বুর্জোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিইনে। যাক, বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন অভিনন্দন জানাতেই হয়। সেইসঙ্গে দিতে হয় কিছু উপহার। আমরা প্রোলিটারিয়ানরা ফুলই দিই। কই, তিনি কোথায় ?"

"তিনি!" স্বপনদা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "তিনি আমাকে তাঁর পেয়ারের কুকুরের বেবী সিটার করে বসিয়ে রেখে বাজার করতে বেরিয়েছেন! বাড়ীতে একটা পার্টি আছে। তোমার যদি অন্য কোনো এনগেজমেণ্ট না থাকে তবে যেয়ো না, থেকে যাও। আমাদের সঙ্গে খাবে। বিয়েতে তুমি যোগ দিতে না, কিন্তু বৌভাতে তো দিতে। তোমাকে আমি খুব মিস করেছি। তোমার বান্ধবী ক্যারামেলকেও। সেও কি ছাড়া পেয়েছে ?"

"না, টুর্গেনিভদা।" বাবলী বিষন্ন মুখে বলে, "সে অনেক কথা। কিন্তু তোমাকে আর আমি টুর্গেনিভদা বলব না। টুর্গেনিভ যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে গিয়ে সারাজীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন। আর তুমি! বিশ বছর না বাইশ বছর একনিষ্ঠ থাকার পর সবাই যা করে তুমিও তাই করলে। কোথায় রইল তোমার প্রেমের আদর্শ! তোমার অসাধারণত্ব! পারবে কি তুমি কখনো আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে? তুমি আমাকে হতাশ করলে, স্বপনদা!"

"আগে তো শোন সব কথা। তার পরে যা বলতে চাও বলো।" স্বপনদা চাকরকে ডেকে চায়ের হুকুম দিয়ে জমিয়ে বসেন।

"বেশ তো, শুনব।" বাবলী এলফের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে।

"চকোলেট তোমাকে আমি বার বার বলেছি আমি টুর্গেনিভ নই। আমার গুরু ফ্লোবেয়োর। বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছি আর একখানা 'মাদাম বোভারি' লিখতে। তাঁর মতো অবিবাহিত রয়েছি। এটা আর্টের প্রতি একনিষ্ঠতা। প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতা নয়। হ্যাঁ, প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেটা কতকাল একতরফা থাকতে পারে বলো? দশ বছর অপেক্ষা করেছি, বিশ্বাস করেছি যে ওর ছেলে বড়ো হলে ও আমার কাছে চলে আসবে। এদেশে না হোক ওদেশে গিয়ে আমরা বিয়ে করব। আমাদের ফোর আর্টস ক্লাবে এর নজির আছে। বুঝতে পারি আমাদের বেলায় তা হবার নয়। বৃথা অপেক্ষা। তখন ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব গড়ে তুলি। এখানেও মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু মন দেওয়া নেওয়া হলো না। আমি যাঁকে চাই তিনি আমাকে চান না। যিনি আমাকে চান আমি তাঁকে চাইনে। আমি তো বিয়ের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম। এমন সময় বাবার পরলোকের সমন আসে। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, আমি আর বেশী দিন নেই। আমার একটা সাধ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেটা ছিল তোমার মায়েরও সাধ। তিনি থাকলে তিনি তোমার উপর চাপ দিতেন। আমি কখনো চাপ দিইনি ও দেব না। কিন্তু আমি আশা করেছি ও করব যে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের বংশলতিকায় ছেদ পড়তে দেবে না। প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চাও করো, কিন্তু বিয়ে করলেই পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবে। নয়তো নয়। একথা শুনেই আমি মনঃস্থির করে ফেলি। ক্লাব তখন ভাঙনের মুখে।

যুদ্ধ নিয়ে নানা জনের নানা মত। কারো কারো মত ক্লাবের মূলনীতি-বিরোধী। নাৎসীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমি বাখ্ বেঠোভেন গোটে শিলারের বিরোধিতা করতে পারিনে। কেউ কেউ আবার নাৎসীদের জয় কামনা করেন। পুলিশ শুনতে পেলে রক্ষে আছে! আমার সঙ্গে যাঁর মতের মিল তিনিই হন তোমার বৌদি। তাঁর একটিমাত্র শর্ত। লাভ্ মী, লাভ্ মাই ডগ। তাঁকে ভালোবাসলে তাঁর কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে।" স্বপনদা হাসেন।

"এমন শর্ত কোনো কালেই শুনিনি। ধন্য বৌদি!" বাবলীও হাসে।

"শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। পুরূরবা যখন উর্বশীকে বিয়ে করতে চান তখন উর্বশী বলেন, আমার শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় দুটি মেষ বাঁধা থাকবে ও এরা কখনো অপহৃত হবে না। পুরূরবা বলেন, বেশ, তাই হবে। একদিন রাত্রিকালে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু মেষ দুটিকে হরণ করেন। উর্বশী তাদের উদ্ধার করার জন্যে কান্নাকাটি করলে পুরূরবা শয্যা থেকে উঠে বিবস্ত্র অবস্থায় বিশ্বাবসুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। উর্বশীর আরো এক শর্ত ছিলো পুরূরবাকে যেন তিনি কখনো বিবস্ত্র না দেখেন। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাঁর সেই রূপ দেখে উবশী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যান।" স্বপনদা বলতে বলতে এল্‌ফের উপর কড়া নজর রাখেন।

বাবলী ভয় পেয়ে বলে, "এল্‌ফ যদি চুরি যায়?"

"ভাবনার কথা বৈকি। তবে আমাদের বেলা তেমন কোন শর্ত হয়নি। আমি শুধু ভালোবেসেই খালাস।" স্বপনদা অভয় দেন।

"তা ভালোবাসার মতো কুকুর বটে। কোন্ জাতের?" বাবলী সুধায়।

"পোমেরানিয়ান। তার মানে জার্মান।" স্বপনদা বলেন।

"তা হলে আমি একে ভালোবাসতে পারব না। জানো তো তোমার প্রিয় জার্মানরা আমার প্রিয় রাশিয়ানদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাশিয়া যদি হেরে যায় সর্বনাশ হবে, স্বপনদা। বিপ্লব ব্যর্থ হবে। রাশিয়ায় ব্যর্থ হলে ভারতেও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তা হলে আমি কী নিয়ে বাঁচব! রুশকে তার চরম সঙ্কটের দিন যে-ই মদত দেবে সে-ই আমার মিত্র। সে যদি ইংরেজ হয় তবে সেও আমার মিত্র। আমাদের থীসিস বদলে গেছে। তাই আমাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জুলি তা শুনে রেগে আগুন। বলে, তোমরা দেশদ্রোহী। দেশের চরম সঙ্কটের দিন যে-ই মদত দেবে সে-ই আমার মিত্র।

সে যদি হিটলার হয় তো সেও আমার মিতা। একথা শুনলে কেই বা ওকে মুক্তি নেবে? ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, স্বপনদা। মনটা খারাপ বলে খারাপ। একযাত্রায় পৃথক ফল।" বাবলী আফসোস করে।

স্বপনদা শুম্ভিত হয়ে বলেন, "বিচ্ছেদ! ও যে বড়ো অলক্ষুণে কথা! আমার প্রিয় বোন চকোলেটের সঙ্গে আমার প্রিয় বোন ক্যারামেলের বিচ্ছেদ। না, না, কথাটা অতি রূঢ়। বলতে পারো মতান্তর। মনান্তর কখনো নয়।"

"জুলি আমাকে শাসিয়েছে আমাদের মিতা ইংরেজরা যেদিন লাথি খেয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে যাবে সেদিন আমরাও লাথি খেয়ে এক নৌকায় ভাসব। এদেশে আমাদের ঠাঁই হবে না। আমাদের পিতৃভূমি রাশিয়া। সেইখানেই আমাদের শেষ আশ্রয়। যদি সে তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।" বাবলীর কণ্ঠরোধ হয়।

"পারবে। পারবে। আলবাৎ পারবে।" স্বপনদা সুনিশ্চিত। "হিট-লারের দশা হবে নেপোলিয়নের মতো। হিটলার কি নেপোলিয়নের চেয়েও বড়ো? কেঁদো না, বোন চকোলেট। কেউ মদত দিক আর নাই দিক, রাশিয়া আত্মরক্ষা করবেই। ইংরেজ কেন ওকে মদত দিতে ছুটে গেছে, জানো? ইংরেজের আশঙ্কা রাশিয়া কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে আবার না একটা ব্রেস্ট-লিটোভস্ক সন্ধি করে। তখন হিটলার আবার মোড় ঘুরে ইংরেজের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।" স্বপনদারও সেই আশঙ্কা।

"অসম্ভব। জায়গা ছেড়ে দিয়ে সন্ধি! অসম্ভব! সন্ধিই অসম্ভব। একবার যে চুক্তি ভঙ্গ করেছে আবার সে তাই করবে। হিটলারকে ঢিট করতে হবে। তার জন্যে যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় তাও সই। জুলি একথা শুনে আরো ক্ষেপে যায়। বলে, মিলির মতো তুমিও আগে থাকতে বিলেতে পালিয়ে যেতে পারো। বিয়ে করে সুখে থাকবে।" বাবলী কাঁদো কাঁদো স্বরে শোনায়।

"মিলি মিলিটি কে?" স্বপনদা উৎসুক হন।

"নামকরা বিপ্লবী নায়িকা মধুমালতী মুস্তাফী। বিয়ের পর দত্তবিশ্বাস। স্বামী বহুদিন থেকে লণ্ডনের অধিবাসী। অগত্যা মিলিও বিয়ের পর সেখানকার বাসিন্দা। আগে থাকতে পালিয়ে গেছে এ কী রকম কথা! ইংরেজরাও কি ভারত থেকে পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? বিপ্লবের ঢের দেরি। আগে তো রুশ বিপ্লব নিষ্কণ্টক হোক। রাশিয়া রাহুমুক্ত হোক। তার পরে আমরা দিকে

দিকে আগুন জ্বালাব। আপাতত আমাদের হাতের তাস হাতে রাখতে হবে। লোকে বলবে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর। সেইজন্যেই আমাদের জেল থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। লোকের ভয়ে আমিও তো আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকি। তোমার কথা আলাদা। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, স্বপনদা।" বাবলী মিনতি করে।

"আরে না। আমি কি আমার বোনদের ভুল বুঝতে পারি! তোমাকেও না, ক্যারামেলকেও না। তোমাদের দিক থেকে তোমরা দুজনেই ঠিক। মানুষের মনটা উকিল। বলে গেছেন পরমহংসদেব। আমরা হাইকোর্টে গিয়ে নিত্য দু'পক্ষে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষের হয়ে মামলা লড়ি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র তো আদালত নয়। সেখানে দুই পক্ষ নয়, আরো এক পক্ষ। তার নাম নিয়তি। ডেস্টিনি। তোমাদের দুই পক্ষের যুক্তিই ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। তখন তোমরা দুজনেই আবার কোলাকুলি করতে পারো। এ বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ নয়। কেউ কি জানত যে বিপ্লবী নায়িকা মধুমালতী মুস্তাফী রাতারাতি ভোল পালটে বিলেত গিয়ে হাজির হবেন! নিয়তি। ডেস্টিনি। এই যুদ্ধের শেষ কী ভাবে হবে তা তুমিও জানো না, জুলিও জানে না, আমিও জানিনে, কেউ জানে না। হিটলারও না, স্টালিনও না, চার্চিলও না।" স্বপনদা চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দেন। হস্‌টেসের অনুপস্থিতিকে তিনিই হস্‌টেসের স্থলে অভিষিক্ত।

"চার্চিল!" চার্চিলের কথায় বাবলীর মনে পড়ে, "মিলি এখন চার্চিলের পরম ভক্ত। অমন নেতা নাকি হয় না। ব্রিটেনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। লেবার পার্টির সদস্যরাও ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

"চার্চিল!" স্বপনদা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, "পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। লেবার পার্টির অত বড়ো শত্রু কি আর আছে? শুধু লেবার কেন টোরি পার্টির অধিকাংশ সদস্য ওঁর উপর বিরূপ। যতবার মন্ত্রী হয়েছেন প্রত্যেকবারই মারাত্মক সব ভুল করেছেন। কত লোক যে ওঁর জন্যে যুদ্ধে বৃথা প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধের সময় আর কত অর্থ যে বরবাদ হয়েছে! এ যুদ্ধের আগের দশটি বছর ধরে ওঁর বনবাস। একজন ইংরেজও বিশ্বাস করত না যে ওঁর কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে। ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ যুদ্ধের সময় ওরা দলবাজি ভুলে যায়। লেবার পার্টির সদস্যরা বলেন চার্চিল যদি প্রধানমন্ত্রী হন তা হলেই ওঁরা কোয়ালিশনে রাজী হবেন। আর টোরিদের

অধিকাংশ ওঁর উপরে বিরূপ হলেও আর-কোনো নেতাকে পান না যিনি লেবারকে বাদ দিয়ে এককভাবে যুদ্ধ চালাতে পারবেন। নিয়তি! একেই বলে নিয়তি। নইলে দু'বছর আগেও কি কেউ বিশ্বাস করত যে চার্চিল আবার মন্ত্রী হবেন? প্রধানমন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা সোভিয়েট রাশিয়ার এত বড় শত্রু আর ছিল না। সেই মহাশত্রু কেমন করে মিত্র হলেন সে এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আমি যেটুকু বুঝি সেটুকু এই যে, রাশিয়া তো কোনোদিন ব্রিটেন আক্রমণ করবে না, করলে জার্মানীই করবে। কোনোদিন ফ্রান্স আক্রমণ করবে না, করলে জার্মানীই করবে। সুতরাং জার্মানীই এক নম্বর শত্রু। তার বিরুদ্ধে যুঝতে হলে পূব দিকেও মিত্র চাই, শুধু পশ্চিম দিকে নয়। পূব দিকের সেই মিত্র ছিল পোলাণ্ড। সে তো একমাসের মধ্যেই কুপোকাৎ। রাশিয়াই একমাত্র শক্তি যে জার্মানীকে রুখতে পারে। যদি প্রয়োজনমতো অস্ত্রশস্ত্র পায়। হলোই বা সে কমিউনিস্ট। বিপদে পড়লে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের এটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। সেই চার্চিল আর সেই স্টালিন! ভাবতে পারো একথা? ইতিহাসের পরিহাস। একদিন যেটা ছিল অসম্ভব আজ সেটা সম্ভব। আসলে যুদ্ধ ব্যাপারটা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত। আর সে শক্তিকে বলতে পারো ইম্‌পার্স´নাল। যেমন সাইক্লোন বা ভূমিকম্প। ব্যক্তি সেখানে নিমিত্তমাত্র। তা বলে চার্চিলের জায়গায় চেম্বারলেনকে বসিয়ে দিলে চলত না। তেমনি স্টালিনের জায়গায় ট্রটস্কিকে। বিপ্লবের দিন ট্রটস্কির ভূমিকা ছিল স্টালিনের চেয়ে বড়ো। ট্রটস্কি না হলে রেড আর্মির সৃষ্টি আর কেউ করতে পারতেন না। পরে ওঁর উপর দারুণ অন্যায় করা হয়েছে, তা তুমি স্বীকার করো আর নাই করো, বোন। কিন্তু আজকের দিনে স্টালিনই ভরসা।"

"যা বলেছ। আমরা উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছি তাঁরই মুখের দিকে। এতদিন তিনি পার্টির কর্ণধার ছিলেন। এখন সরকারের কর্ণধার হয়েছেন। শাসনযন্ত্র এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে। যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। হিটলার তাঁর তুলনায় কী! আঙুল ফুলে কলাগাছ! কিন্তু জার্মান সেনা যে হারে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আতঙ্কের কারণ না থেকে পারে না। মস্কোর পতন আসন্ন। লেনিনগ্রাডের পতন অদূরে। আমরা কি স্থির থাকতে পারি সম্ভব হলে ফ্রণ্টে গিয়ে লড়তুম। মনটা পড়ে আছে মস্কোতে, লেনিনগ্রাডে।

দেহটা কলকাতায়। তুমি তো টুর্গেনিভ নও, তুমি কী বুঝবে আমার যাতনা! অবশ্য কমিউনিস্ট তুমি কোন কালেই ছিলে না। বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি, এইটুকুর জন্যেই তোমার কাছে আসি। তা তুমি কি তোমার মাদাম ভিয়ার্দোর সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই কাটিয়ে দিলে? ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, কিছু মনে কোরো না।" বাবলী ফুলুরি খেতে খেতে বলে। স্বপনদার প্রিয় ভোজ্য।

"বান্ধববান্ধবী সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনি আছে। কিন্তু প্রেমিকপ্রেমিকা সম্পর্ক আর থাকতে পারে না। বহুদিন থেকেই নেই। মানুষের হৃদয় এক বিচিত্র বস্তু। একবার যদি হারায় তবে সহজে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। যতদিন না তাকে ফিরে পাচ্ছি ততদিন আর কাউকে হৃদয় দিতে পারিনে। হৃদয় না দিয়ে দেহ দিলে সেটা হতো দ্বিচারিতা। সেইজন্যে আমি বাবার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বিয়ে করিনি। একটা না একটা অজুহাতে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু ক্রমেই উপলব্ধি করছিলুম যে এমনভাবে চলতে পারে না। দেবতা বলো, মানুষ বলো, পশুপাখী বলো সকলেরই জোড় আছে। জুটি আছে। একক কেউ নয়। আমিই বা কেন ব্যতিক্রম হতে যাই? ফ্লোবেয়ারের মতো একনিষ্ঠ আর্টিস্ট হতে চাই বলে? এটা ঊনবিংশ শতাব্দী নয়। ফরাসী সমাজও নয়। ও রকম একটা ক্লাসিক লিখলে সেটা না হবে কালোপযোগী, না দেশোপযোগী। এখন আমি ভাবছি একখানা নাটক লেখার কথা। বিশ্বরঙ্গ-মঞ্চে যার অভিনয় দেখছি তারই আদলে লিখলে সেটাই হবে আমার 'ফাউস্ট'। ও বই লিখতে গ্যেটের ক'বছর লেগেছিল, জানো? চল্লিশ বছর। আমার বয়সেই তিনি আরম্ভ করেন। সমাপ্ত করেন আমার বাবার বয়সে। এর জন্যে চাই একটি নারী। এই বয়সেই তিনি নারী গ্রহণ করেন। তাকে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করেন সতেরো বছর বাদে। ও কী! চমকে উঠলে যে!" স্বপনদা বিস্ময়ের ভাণ করেন।

"রুশো যা মানতেন না, ভলতেয়ার যা মানতেন না, গ্যেটে স্বয়ং তাঁর যৌবনে যা মানেননি বৃদ্ধ বয়সে তাই মেনে নিলেন! গির্জায় গিয়ে মন্ত্রপাঠ করে সমাজসম্মত কনভেনশনাল ম্যারেজ। চমকে উঠব না?" বাবলী উত্তর দেয়।

"তোমরা কি তা হলে বিবাহও তুলে দিতে চাও?" স্বপনদা সুধান

"না, বিবাহ তুলে দেব না। তবে আইনের কড়াকড়ি রাখব না, ধর্মীয়

অনুষ্ঠান রাখব না। ইচ্ছা হলো একসঙ্গে থাকলুম, ইচ্ছা হলে সঙ্গত্যাগ করলুম। বিবাহ হবে বন্ধুতার মতো।" বাবলীর জবাব।

"ছেলে কার তা নিয়ে যদি বিরোধ বাধে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কার উপর বর্তাবে ?" স্বপনদা জেরা করেন।

"এক্ষেত্রে মায়ের সাক্ষ্যই শেষ কথা।" বাবলী গম্ভীরভাবে বলে।

"ছাখ, চকোলেট, সবাই তোমার মতো সত্যবাদিনী নয়। মিথ্যাবাদিনীও আদালতে দেখেছি। সব চেয়ে ভালো হচ্ছে সম্পত্তি বলে কিছু না থাকা। উত্তরাধিকার বলে কিছু না রেখে যাওয়া। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াতেও সম্পত্তি রেখে যাওয়া ও জন্মসূত্রে পাওয়া ফিরে আসছে। রাষ্ট্রের কাছে সব সন্তানই সমান, অবৈধ কেউ নয়। কিন্তু সমাজের চোখে কে কার সন্তান এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। সমাজটা যদি মাতৃতান্ত্রিক হতো তা হলে কেউ কেয়ার করত না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দেশেও সমাজ এখনো পিতৃতান্ত্রিক। কমি-উনিস্টরা যখন 'সমাজ', 'সমাজ' বলে চিৎকার করে তখন ওরা যা বলতে চায় তা 'রাষ্ট্র', 'রাষ্ট্র'। বিবাহের বেলা কড়াকড়ি গোড়ায় ছিল না। এখন একটু একটু করে ফিরে আসছে। এর জন্যে পুরুষদের দায়িত্বহীনতাও দায়ী। বাপ হবে, ছেলের দায়িত্ব নেবে না। সব দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র কাঁহাতক সহ্য করবে! ফরসী বিপ্লবের দিনেও এই দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়েছিল। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন প্যারিসে। যাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর একটি কন্যা হয়। সেই কন্যাকে কবি তার মায়ের দেশে ফেলে যান। জীবনে কোনো দিন স্বীকৃতি দেন নি। সম্প্রতি এই তথ্য আবিষ্কার করা গেছে। কবির মহিমা এতে খর্ব হয়নি, কিন্তু তিনি তো কেবল কবি নন, তিনি ঋষি।" স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

বাবলী তো হঁা। "বলো কী, স্বপনদা! ওয়ার্ডসওয়ার্থ!"

"হ্যাঁ, বোন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিবসে তিনি বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ছিলেন। সেকথা স্মরণ করে লিখেছিলেন—

'Bliss it was in that dawn to be alive
And to be young was very heaven.'

বিপ্লব যখন সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয় তখন আরো অনেকের মতো তাঁরও মোহভঙ্গ হয়। তিনিও কোতল হতেন, যদি না দেশে ফিরে যেতেন। ব্রিটেনও দিনে দিনে বিপ্লববিরোধী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের আমলে যুদ্ধে

জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্সবিরোধীও হয়। আদিপর্বের কথা গোপন রাখাই তো তখন নির্বিরোধী কবির আত্মরক্ষার পথ। তোমার মনে যা নিয়ে খটকা বাধছে তা এই বিবাহবহির্ভূত সন্তান। তখনকার দিনে বিবাহমাত্রেই ছিল যাবজ্জীবন বিবাহ। বিপ্লবীদের পক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত হয় তার অনেক পরে। তুমি যদি পুরুষমানুষ হতে আর তোমার বান্ধবী ক্যারামেল যদি হতো তোমার ধর্মপত্নী তা হলে এই যুদ্ধের ইস্যুতেই তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যেত। নয়তো তোমরা দু'জনেই জ্বলে পুড়ে মরতে। সন্তান থাকলে তার যে কী দশা হতো অনুমান করতে পারো।"

"জুলি আমাকে কী বলে শাসিয়েছে, শুনবে?" বাবলী কাঁদো কাঁদো সুরে বলে, "ইংরেজদের সঙ্গে আমরা যদি এক জাহাজে যাত্রা না করি তবে দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনী বলে আমাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে খাড়া করা হবে। এক রাশিয়া যদি স্বাধীন ভারতকে স্বীকৃতি দেয় তবে গুলী না করে আন্দামানে পাঠানো হবে।"

স্বপনদা সমবেদনা জানিয়ে বলেন, "ক্যারামেলটা একটা পাগলী। ওর কথা ধরতে নেই, বোন। স্বাধীন ভারতেও আইন আদালত উকীল ব্যারিস্টার থাকবে। আমরা তোমাকে নতুন সরকারের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনব। তবে ক্যারামেলকে ছাড়িয়ে আনবে কে জানিনে, স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে যদি অক্টোবর রেভোলিউশন হয় আর তোমরাই ওর দলের সবাইকে ধরে ধরে ধরে ফায়ারিং স্কোয়াডে খতম করো বা অপরাধ লঘু হয়ে থাকলে দ্বীপান্তরে পাঠাও। তখন আমরাও বেকার। আদালতও ফাঁকা। তোমরা যেভাবে রাশিয়ার মাছিমারা নকল করে চলেছ তাতে শ্রমিক কৃষক ভিন্ন আর সকলের আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ আছে। রাতারাতি ভোল পালটালেও ধনীরা কেউ প্রাণে বাঁচবে না, মধ্যবিত্তরাও মধ্যপদলোপী হবে। তুমি হয়তো তোমাদের এই দাদাটিকে বাঁচাতে চাইবে, কিন্তু আপনি বাঁচবে কি-না সন্দেহ। এক মাছের ভেড়ি থেকেই তোমাদের বছরে লাখ টাকা আয়।"

বাবলী অপ্রতিভ হয়ে বলে, "ওটা তোমার ভুল ধারণা। এদেশের কমিউনিস্টরা কখনো ওদেশের মাছিমারা নকল করবে না। এদের সবাই তো মধ্যবিত্ত। নিজেদের শ্রেণীটিকে লোপ করতে হাত উঠবে কেন? তবে, হ্যাঁ, প্রাইভেট প্রপার্টির উপর পাবলিকের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের মাছের ভেড়ি পাবলিক প্রপার্টি হতে পারে। তার বদলে আমরা যদি

ক্ষতিপূরণ না পাই তবে খোরপোষ পেতে পারব। মধ্যবিত্তদের এমন দাপট থাকবে না তা ঠিক। কিন্তু এমন বেকারিও থাকবে না। সব ছেলের চাকরি জুটবে। সব মেয়ের বর জুটবে। নয়তো চাকরি। অকারণ নরহত্যা মহান স্টালিনও করেননি। করেছেন বিরোধীদের মূলোচ্ছেদ করতে। বাধ্য হলে এদেশের বড়কর্তাও তাই করবেন। তার জন্যে বিরোধীরাই দায়ী।"

স্বপনদা হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "স্টালিন দ্য গ্রেট। যেমন পিটার দ্য গ্রেট। ক্যাথারিন দ্য গ্রেট। আচ্ছা, ইংরেজরা কতদিন তোমাদের সহযোগিতা পাবে?"

"যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয় ততদিন। তার আগে ওদের আমরা নড়াতে চাইনে।" বাবলীর সাফ জবাব।

"খুব ভালো কথা। কিন্তু লোকে যদি খেতে না পেয়ে দলে দলে মারা যায়, মেয়েরা যদি পরতে না পেয়ে দলে দলে বেআব্রু হয়ে ঘুরে বেড়ায় তার দায়িত্ব নেবে কারা? যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার কুলীমজুরের দরকার হয়, সিপাহীর তো হয়ই। তাদের অনিচ্ছা থাকলে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর। এর দায়িত্ব নেবে কারা? যুদ্ধের খরচ জোগানো কি কঠিন সমস্যা নয়? মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া এ সমস্যার আর কী সমাধান আছে? টাকার কোনো দাম থাকবে না, তাই জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হবে। তার দায়িত্ব নেবে কারা? ইংরেজরা তো অপ্রিয় হবেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও। তুমিও কি আর সে-রকম সমাদর পাবে!" স্বপনদা ঘাড় নাড়েন।

"সব বুঝি, দাদা। আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু রাশিয়া যদি হেরে যায় তবে বিপ্লবেরও সমাধি হবে। বিপ্লবী বলে আমি পরিচয় দেব কোন্ মুখে? আমি তো ভূতপূর্ব হয়ে যাব। রাশিয়ার হারজিৎ আমার পক্ষেও জীবনমরণ সমস্যা। জুলির কথা আলাদা। সেও বিপ্লবী, কিন্তু কৃষকশ্রমিকের কেউ নয়। সেও জনগণের কথা আওড়ায়, কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে মহাজনের বিরুদ্ধে লড়বে না। দ্রৌপদীর মতো সে বেণী বাঁধবে না, যতদিন না দুঃশাসনের নিধন হয়। কিন্তু তার পরে পাণ্ডবরা ভারতময় চোর পোষণ করবে। ও যদি জেলখানায় আরো চার পাঁচবছর কাটাতে চায় আমি বলবার কে? ওর থীসিসটাই ভুল। এ যুদ্ধে ইংরেজ হারতে পারে না। ইংরেজকে হারতে দেখলে আমেরিকা ছুটে আসবে। একদিকে রাশিয়া, আরেকদিকে আমেরিকা, এদের সঙ্গে লড়াই করে নাৎসীরা যে কেমন করে জিতবে তা আমার মাথায়

আসে না। কিন্তু বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর। জুলির বিশ্বাস হিটলার জিতবেই। ব্রহ্মচর্যের জয় হবেই, নিরামিষ আহারের জয় হবেই, আর্যত্বের জয় হবেই। স্বস্তিকচিহ্নের জয় হবেই। স্টালিনের সঙ্গে দু'বছরের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল বলে আমি জুলির সঙ্গে তর্ক করিনি। মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। কিন্তু চুক্তির খেলাপ করে হিটলারের সৈন্য যখন সোভিয়েট পিতৃভূমি আক্রমণ করে তখন কি আর চুপ করে সব কথা মেনে নিতে পারি! ঘরে আগুন লাগলে এক বালতি জল নিয়ে যে ছুটে আসে সে যদি এককালে শত্রু হয়ে থাকে তবু আজ তো সে বন্ধু। চার্চিল অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা পছন্দ করেন না, কিন্তু আমরা কেন ধরে নেব যে যুদ্ধের পরেও চার্চিল থাকবেন? তখন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি যদি ভারতের স্বাধীনতা মঞ্জুর না করেন আমরাই সকলের আগে মুক্তিযুদ্ধে নামব। শ্রমিক কৃষক একজোট হয়ে দিকে দিকে লাল ঝাণ্ডা তুলবে। সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাল কেল্লা দখল করবে। কংগ্রেসকে দিয়ে আপস ছাড়া আর কিছু হবার নয়। গান্ধীর দৌড় তো দেখা গেছে। আর সুভাষ বোস তো হাওয়া। শুনছি উনি নাকি জার্মানীতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করছেন। কিন্তু সেদেশে থেকে এদেশে আসবেন কোন্ পথে? রাশিয়া তো দুয়ার বন্ধ করেছে। স্বপনদা, জুলির জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত। ও বেচারী খামোখা জেলে পচছে। পারো তো তুমি ওকে জেল থেকে বার করে নিয়ে এস। বিচ্ছিন্ন হলেও আমি ওর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।" বাবলী একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

"আচ্ছা, বোন চকোলেট, আমি ওর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ওর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইব। তবে ওর যা জেদ! না একো রুপেয়া না একো জওয়ান। জেল থেকে বেরিয়ে ও যদি আবার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে ওই ধুয়ো ধরে তা হলে ওকে ওরা এবার কোর্ট মার্শাল করবে। এবার আর বিনা বিচারে আটক নয়, সামরিক বিচারে ফাঁসী বা দ্বীপান্তর বা কারাবাস। যুদ্ধের সময় যে-কোনো গভর্নমেণ্ট নির্মম। ইংরেজরা দিন দিন কঠোর হচ্ছে।" হুঁশিয়ারি দেন স্বপনদা।

বাবলী এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। "আচ্ছা, স্বপনদা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কি খুব রাগ করবে? তোমার বিয়েতে মাদাম ভিয়ার্দো কিছু মনে করেননি?"

স্বপনদা গম্ভীর হয়ে যান। "ভাখ চকেলেট, আমি টুর্গেনিভ নই, তিনিও

ম্যাদাম ভিয়ার্দো নন। বিয়ের আগে বাঁশরিকে আমি চিঠি লিখে খবরটা দিয়েছিলুম বইকি। লিখেছিলুম পিতার অন্তিম ইচ্ছা, আমারও অনিচ্ছা নয়। এর উত্তরে বাঁশরি কী লেখেন শুনবে? তোমার মুখে একটি কথা শোনার জন্যে আমি বছরের পর বছর কান পেতে রয়েছি। সেই কথাটি না বলে তুমি বিদেশে চলে গেলে, ফিরলে চার বছর বাদে। বাঙালীর মেয়ের বিয়ের বয়স একবার পার হয়ে গেলে পরে তার পাত্র জোটে না। বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন। লেখাপড়া তো তেমন শিখিনি যে চাকরি করব। শিখেছি ছবি আঁকতে। সেই সুবাদে দাদার সঙ্গে তোমাদের ফোর আর্টস ক্লাবে যাওয়া আসা করি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়। তুমি আমার ছবি দেখতে আমাদের বাড়ী আসতে শুরু করো। ওসব ছবির সমঝদার যত ছিল খরিদদার তত ছিল না। আমিও পেশাদায় আর্টিস্ট হতে চাইনি। তোমাকে চিঠি লিখে জানাই যে আমার গুরুজন আমার বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, পাত্রও পেয়েছেন। পাকাপাকি এখনো হয়নি, এখনো সময় আছে। কিন্তু তার আগে তোমার ফিরে আসা চাই। তুমি লিখলে ব্যারিস্টার না হয়ে দেশে ফিরলে তোমার জীবন ব্যর্থ হবে। তা তো ঠিকই। পুরুষমানুষের কাছে তার জীবিকাই পরম পুরুষার্থ। প্রেম তার তুলনায় গৌণ। আর নারীর কাছে প্রেমই মুখ্য, যদিও তার গুরুজন সেদিকে দৃক্‌পাত করেন না, ধরে বেঁধে বিয়ে দেন। তখন নারীর জীবন ব্যর্থ। বিদেশ থেকে ফিরে তুমিই আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমার জীবন ব্যর্থ হতে দেবে না। আমাকে উদ্ধার করবে। ও বিয়ে বিয়েই নয়। সত্যি সত্যি তুমি অপেক্ষা করেছিলে। আমি কিন্তু সন্তানের জননী হয়ে আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়ি। আমার ছবি আঁকার পাট উঠে যায়। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিই। তখন তুমি যদি বিয়ে করতে আমি আশ্চর্য হতুম না। আশ্চর্য হচ্ছি এই কথা ভেবে যে তুমি এতকাল যুদ্ধ করার পর অবশেষে প্রেমের যুদ্ধে হার মানলে। প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। আমার কথা ভুলে গেলেই আমি সুখী হব।"

"তার পরে?" বাবলী আরো শুনতে চায়।

"তার পরে আর কী? আই অ্যাম আ ডিফিটেড ম্যান। আমি একজন পরাজিত পুরুষ। আমার অহঙ্কার ছিল যে আমি অপরাজিত। মহাত্মা যেমন বলেন অহিংসার অসাধ্য কিছু নেই আমিও তেমনি বলতুম প্রেমের অসাধ্য কিছু নেই। আমার প্রেমই একদিন শ্যামের বাঁশরির মতো আমার

প্রিয়াকে টেনে নিয়ে আসবে। ওর বিবাহবিচ্ছেদ যদিও সহজ নয় তবু অসম্ভব নয়। কিন্তু সন্তানের মায়া ও কাটিয়ে আসবে কী করে? আমি হেরে গেছি। এমন এক সময় ছিল যখন এটা নিবারণ করতে পারা যেত। কিন্তু বিলেত না গিয়ে আমার স্বস্তি ছিল না, ইউরোপ না দেখে আমার শান্তি ছিল না, ব্যারিস্টার না হয়ে আমার মর্যাদা ছিল না। আমার জন্যে বাঁশরির জীবনটাও ব্যর্থ হলো। নিয়তি! ডেস্টিনি! এ ছাড়া তুমি আর কী ব্যাখ্যা দেবে? এখন এ ভাঙা জীবন জোড়া দিতে পারলে বাঁচি। দীপিকা যদি আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হয়।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

এল্‌ফ হঠাৎ এক লাফে বাবলীর কোল থেকে নেমে এক ছুটে নিচের তলায় গিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দেয়। না, চোর নয়, ডাকাত নয়, বাড়ীর গৃহিণী। পেছনে বাড়ীর চাকর রামদীন। তার সঙ্গে বাজার থেকে কেনা লটবহর। এল্‌ফ তাঁর আগে আগে সিঁড়ি ওঠে। আজকাল দোতালাতেই স্বপনদারা থাকেন। যেখানে এতদিন থাকতেন অধ্যাপক গুপ্ত। অধুনা স্বর্গীয়।

## ॥ দুই ॥

স্বপনদার স্বভাবই হলো গড়িমসি করা। যেটা আজ করার কথা সেটা তিনি কাল করবেন। যেটা কাল করবার কথা সেটা পরশু। যেটা বিলেত যাবার আগে করার কথা সেটা করবেন বিলেত থেকে ফিরে। অমনি করেই বাঁশরি দেবীকে হারালেন। দীপিকা দেবীকেও হারাতেন, যদি না পরলোকের ডাক শুনে বাবা অন্তিম ইচ্ছা জানাতেন। আর বেশী দিন নেই সেটা ডাক্তার-দেরও ধারণা।

তাঁর পাতানো বোনদের তিনি "আমার প্রিয় বোন" বলে ডাকতেন বাবলী ও জুলির মতো তাঁর প্রিয় বোনদের সংখ্যা ছিল সাত কি আটজন। এঁদের কারো কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা তাঁর পক্ষে অশোভন হতো। প্রস্তাব শুনে অপর জন যদি বলে, "ছি!" দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ফলে একজনকে তিনি "আমার প্রিয়তম বোন" বলতেও শুরু করেছিলেন। ক্লাবের অধিবেশন পালা

করে যাঁদের বাড়ীতে বসত তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। সেইসূত্রে গুরুজনদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। কারণে অকারণে দু'জনই দু'জনের বাড়ী গিয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করতেন। কুকুরকে যদিও স্বপনদা যমের মতো ডরাতেন তবু দীপিকাদের বাড়ী গেলে এল্‌ফকে বিস্কুট দিয়ে ভোলাতেন।

ক্লাবের নিয়ম ছিল ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান ফের্তা না হলে কেউ সদস্য হতে পারতেন না। ওটা কেবল পূর্ব পশ্চিমের মিলনের সেতু নয়, নরনারীর মেলামেশারও সোপান। গত সাত আট বছরের মধ্যে কয়েকটি শুভবিবাহের ঘটনাও ঘটেছে। দীপিকার গুরুজন আশা করেছিলেন যে সে-রকম ঘটনা তাঁদের বাড়ীতেও ঘটবে। কন্যা ইতিহাসে অক্‌সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু এমনি এদেশের সমাজ যে এর উপরেও পণ যৌতুক নিয়ে দরাদরি করে। গুরুজন নরম হলেও দীপিকা পাথরের মতো শক্ত। তাঁরও একটা পণ আছে। তাঁকে ভালোবাসলে তাঁর কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে। তাঁর পণে তিনি অটল। তাই বছরের পর বছর যায়, সমবয়সিনীদের সকলেরই বিয়ে হয়ে যায়, ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েও দীপিকা অনূঢ়া। তখনকার দিনে অভাবনীয় ব্যাপার। হ্যাঁ, হিন্দু সমাজে।

বাবার জন্যে স্বপনদা কিছুই করেননি, ছেলের জন্যে বাবা সব কিছুই করেছেন। একথা মনে আসতেই মনটা হু হু করে ওঠে। দু'চোখ জলে ভরে যায়। বিয়ে যদি কোনোদিন করতেই হয় তবে আজ নয় কেন? কাল অবধি বাবা যদি না বাঁচেন। কিন্তু কাকে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এমন সময় দীপিকার প্রবেশ। ক্লাবের মায়া যেন কাটতেই চায় না। সেই উপলক্ষে আগমন।

"আমার প্রিয়তম বোন দীপিকা", স্বপনদা না ভেবে চিন্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলেন, "আমি যদি বোন কথাটা বাদ দিই, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে?"

"এতদিন দাওনি কেন সেইটেই আমাকে ভাবায়। কিন্তু, জানো তো, আমি পাথর দিয়ে তৈরি। আমার একটা শর্ত আছে। লাভ মী, লাভ মাই ডগ।" দীপিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"তা হলে চলো আমার সঙ্গে বাবার ঘরে। দু'জনে মিলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করব।" স্বপনদা বলেন।

"কিন্তু অমন করে আমার শর্তটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। পরিষ্কার বলতে হবে আমার এল্‌ফকে তুমি ভালোবাসবে। আমার শোবার ঘরে সারা রাত ও ছাড়া থাকে। ও আমাকে পাহারা দেয়, আমিও ওকে পাহারা দিই।' দীপিকা বলেন।

স্বপনদার মনে পড়ে শতপথ ব্রাহ্মণের উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান। ওটা দীপিকাকে শোনান। "তুমি কি পূর্বজন্মে উর্বশী ছিলে? আর এল্‌ফ ছিল তোমার ভেড়া? তা নইলে এমন উদ্‌ভট শর্ত কার মাথায় আসে? কিন্তু ওই একটি শর্তেই আমি রাজী। ওর বেশী না।"

"না, আমার আর-কোনো শর্ত নেই। আমি তোমার তুমি আমার আর এল্‌ফ আমাদের।" দীপিকা সম্মতি দেন।

তখন থেকেই এ বাড়ীর এই রীতি। এল্‌ফ রাত্রে ছাড়া থাকে। আর কর্তাগিন্নীর শোবার ঘর ওরও শোবার ঘর। অন্যান্য ঘরেও ওর অবাধ প্রবেশ।

বৌদি ঘরে ঢুকতেই বাবলী তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া ধরিয়ে দেয় আর তাঁর গলায় পরিয়ে দেয় ফুলের মালা। তিনি চিনতে না পেরে স্বপনদার দিকে তাকান।

"অপরাজিতা সেন। ডাক নাম বাবলী। আমার প্রিয় বোন চকোলেট। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের বিয়ের খবর শুনে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এসেছে। আমি ওকে থাকতে বলেছি, আমাদের পার্টিতে যোগ দেবে। মনে করো এইটেই বৌভাত।" স্বপনদা বলেন।

দীপিকা বাবলীর গালে বিলিতী কেতায় চুমু খেয়ে বলেন, "হাউ সুইট অভ ইউ! আমার প্রিয় ননদ। কিন্তু জেলে ধরে নিয়ে গেল কেন?" দীপিকা জিজ্ঞাসু।

"যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে।" বাবলীর জবাব।

"তা হলে ছেড়ে দিল কেন?" দীপিকা বুঝতে পারেন না।

"আমাদের থীসিসটা বদলে গেল বলে। এ যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। এটা সোভিয়েট রাশিয়ার জনযুদ্ধ। অতএব আমাদেরও।" বাবলী বোঝায়।

"ও মা তাই নাকি!" দীপিকা কৌতুক বোধ করেন। "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরামের দল জনযুদ্ধে নামবে। ইংরেজরা ছত্রভঙ্গ করবে না?"

"আহা! তা কেন করতে যাবে? ওরা তো ইংরেজের শত্রু নয়, মিত্র। ওদের যুদ্ধ হচ্ছে ওদের আর ইংরেজদের কমন এনিমির বিরুদ্ধে। বর্বর ফাসিস্টদের বর্বর নেতা হিটলারের বিরুদ্ধে। সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্যে এই যুদ্ধ। এখানে ইংরেজরা আর আমরা এক শিবিরে।" বাবলী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে।

"আচ্ছা, আমি যখন অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করতুম সে-সময় ওখানকার বাঙালী ছাত্রদের মুখে শুনেছিলুম অপরাজিতা সেন বলে একটি কলেজের ছাত্রী হিজলী বন্দীশালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার এক ক্লাবে ঢুকে এক সাহেবকে গুলী করে। সাহেব বেঁচে যান। মেয়েটির শাস্তি হয়। তবে ফাঁসী কি দ্বীপান্তর নয়। কী দুর্জয় সাহস! আর কী জ্বলন্ত দেশপ্রেম! কোথায় যে নিবে গেল মেয়েটি! কেউ আর ওর নাম করে না। তোমার নামের সঙ্গে ওর নামের মিল আছে, বাবলী।" দীপিকা বলেন।

"চরিত্রের সঙ্গেও মিল আছে।" স্বপনদা মন্তব্য করেন। আগুন! আগুন! আমার প্রিয় বোন চকোলেট আগুন দিয়ে তৈরি।"

"এত যদি মিল তবে তুমি কি সেই অপরাজিতা?" দীপিকা অবাক হন।

"হ্যাঁ, বৌদি, আমিই সেই।" বাবলী উত্তর দেয়। "ইংরেজদের উপর আমার রাগ পড়ে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার এই জীবনমরণ সংগ্রামে স্বাধীন ভারতেরই উচিত সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তা যখন সে পারছে না তখন যে পারছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই তো যুদ্ধজয়ের পূর্ব শর্ত। ওরা আমাকে অশেষ কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু অসম্মান কখনো করেনি। এবার তো রানীর হালে ছিলুম। যুদ্ধের পরে আবার ওদের সঙ্গে মোকাবিলা হবে। আপাতত যুদ্ধজয়ই একমাত্র লক্ষ্য। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে।"

"রানীর হালে ছিলে বলছ, কিন্তু তোমার চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। তোমার কি অসুখ করেছিল?" বৌদি মমতার সঙ্গে সুধান।

"অসুখ নয়, বৌদি। অ-সুখ। আমার অন্তরে সুখ নেই। আমি অসুখী। আমার মতো অসুখী আর নেই।" বাবলী ভাবাবেগে ভেঙে পড়ে।

"কেন, ভাই বাবলী? কী তোমার দুঃখ?" বৌদি গলে যান।

"দুশমনরা চুক্তির খেলাপ করে অতর্কিতে রুশ পিতৃভূমি আক্রমণ করেছে, তা জানেন। মস্কো বিপন্ন, লেনিনগ্রাড বিপন্ন। আমরা কি আপাতত ওসব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাব? টাইমের বদলে স্পেস বিনিময় করব?

টাইম পেলে তৈরি হয়ে পালটা আক্রমণ করব ? স্পেস কেড়ে নেব ? জনগণমন অধিনায়ক রুশভাগ্যবিধাতা মহামতি স্টালিন কী চিন্তা করছেন বলতে পারব না। কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাডের বাসিন্দাদের জন্যে আমরা দিবারাত্রি চিন্তিত। এ তো গেল আমাদের কমরেডদের সকলের মাথাব্যথা। এর উপর আমার নিজের বুকে ব্যথা। আমার বান্ধবী জুলির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। মতামতের দিক থেকে আমরা এখন উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। যুদ্ধের ফলাফলের জন্যে সবুর না করে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতেই হবে। এই হলো ওর মত। তা হলে ইংরেজ কেমন করে রাশিয়াকে মদত দেবে ? কে জানে কেমন করে ? তা হলে রাশিয়া যুদ্ধে জিতবে কী করে ? কে জানে কী করে ? আচ্ছা, দেশ যদি আজ এখনি স্বাধীন হয় সে কি রাশিনাকে মদত দেবে ? না, তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়া কবে কী করেছে যে ভারত ন্যায়ত বাধ্য ? এখন এই অবোধ বালিকার সঙ্গে আমি কাঁহাতক তর্ক করব ! আমি শুধু বলেছি যে, জুলি, যদি হিটলার আর স্টালিন এই দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয় তুমি কাকে বেছে নেবে ? ও বলে, হিটলারকে। আর তুমি ? আমি বলি, স্টালিনকে। ব্যস্ ! এক কথায় তালাক। আমার মতো অসুখী আর কে ?" বাবলী থামে।

"সত্যি আমি এত দুঃখিত !" বৌদি বলেন দরদের সঙ্গে।

"এই সব নয়, বৌদি।" বাবলী আরো বলে, "আমার বড়ো সাধ ছিল যে স্বপনদা হবেন বাংলার টুর্গেনিভ, আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখবেন আমাদের জন্যে ও আমাদের নিয়ে। অমর করে দেবেন আমাদের। ওঁকে তো আমি টুর্গেনিভদা বলে ডাকতে শুরু করেছিলুম। উনি আমাদের হতাশ করেছেন। উনি টুর্গেনিভ নন। উনি আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখবেন না। লিখবেন আর একখানা 'ফাউস্ট'। জার্মান ক্লাসিকই এখন ওঁর আদর্শ। রুশ ক্লাসিক নয়। সহানুভূতিটা মনে হয় জার্মানদের প্রতি। ওই যে ফাউস্ট ও হিটলার ছাড়া আর কে ? শয়তানের সঙ্গে কার অমন চুক্তি ? ফাউস্টকে আখেরে জিতিয়ে দেওয়া মানে হিটলারকে আখেরে জিতিয়ে দেওয়া। স্বপনদা, তুমি আমাকে হতাশ করলে। আমার মাথাব্যথা আর বুকে ব্যথার উপর হাড়ে ব্যথা।" বাবলী নালিশ করে।

"আমার প্রিয় বোন চকোলেট, তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে।" স্বপনদা হতভম্ব হয়ে বলেন, "হিটলার তো বর্বর। আমি যার কথা লিখতে চাই

সে সভ্য মানুষ। যে মানুষ ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে মানবপ্রগতির ধ্বজাবাহক। সে মানুষ যে একটার পর একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে এটা কি সে সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্যবাদী বলে? না আছে এর কোনো গভীরতর ব্যাখ্যা? যেমন ফাউস্টের মতো শয়তানের সঙ্গে চুক্তি? শয়তান মানে অশুভ শক্তি।"

"বাবলী, তুমি তোমার দাদাকে ভুল বুঝেছ। উনি জার্মানদের ভালোবাসলেও হিটলারকে ও তার দলবলকে নয়। হিটলারের জয় উনি কামনা করেন না," বৌদি বলেন।

"দাদা," বাবলী নরম হয়ে বলে, "তা হলে তুমি টলস্টয়ের মতো আর একখানা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লেখ। তাতে রাশিয়ার জিৎ দেখানো হবে।"

"তা হলে তো আমাকে অবিলম্বে মস্কো যেতে হয়। ইংরেজ সরকার আমাকে পাশপোর্ট দেবে, না রুশ সরকার ভিসা দেবে? আমরা এদেশের লোক বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ দেখিনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলে এদেশের পটভূমিকাতেও অমন উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। এই বাল্যবিবাহের দেশে তুমি নায়িকা পাচ্ছ কোথায়? আগে তো সামাজিক পরিবর্তন হোক। কাল্পনিক চরিত্র দিয়ে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' হয় না। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, বোন। তুমি বলতে পারো, কেন? 'ফাউস্ট'? সেটাও কি আমার উচ্চাভিলাষ নয়? ওই নাম আমি ব্যাবহার করব না। ও কাহিনীও না। আমি শুধু অনুসরণ করতে চাই থীম্‌টা; মানুষ সভ্য হতে গিয়ে তার আত্মাকে বিকিয়ে দিচ্ছে। পরিবর্তে যা পাচ্ছে তা পার্থিব উন্নতি। যত উচ্চে উঠুক না কেন, অসন্তোষ ওর কপালে লেখা। অশান্তি ওর নিত্য সহচর। ত্রাণ করতে পারে ওকে ঐশী করুণা। আর নারীর প্রেম। আমারও মৌল বিশ্বাস ওই দুটিতে। মানুষকে বাঁচানো মানুষের সাধ্য নয়। সে যদি বাঁচে তো বাঁচবে ঐশী করুণায়। তোমরা কমিউনিস্টরা তো ঈশ্বর মানবে না। আমিও কি মানতুম? আমি হিউমানিস্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য মানবিকতার ভিতর থেকে এখন দানবিকতা বেরিয়ে এসেছে। আকাশ থেকে বোমা ফেলে এখন নির্বিচারে নারী শিশু বধ করছে। তার জন্যে এতটুকু বিবেকের দংশন নেই। এই আসন্ন প্রলয়ের দিন যদি আমি ঐশী করুণায় বিশ্বাস করি সেটা আমার প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়। আর নারীর প্রেম? এ

জগতে তার মতো আর কী আছে? আমরা পুরুষরা কি যোগ্য?" বলতে বলতে স্বপনদার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে।

বাবলী স্তব্ধ হয়ে শোনে। "হ্যাঁ, লেখবার মতো থীম বটে। ঐশী করুণা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু নারীর প্রেমের বেলা আমরাও তোমার সঙ্গে একমত। তবে নারী ও পুরুষ এখন পরস্পরের কমরেড। আমাদের দলের ছেলেরা আমাকে 'দিদি' বলে ডাকে না। বুড়োরাও 'বোন' বলে ডাকেন না। সকলের কাছেই আমি 'কমরেড'। আমিও সবাইকে বলি 'কমরেড'। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে। নরনারীর বাছবিচার একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার। তা বলে প্রেম একটা কুসংস্কার নয়। আমাদের পরিকল্পিত সমাজেও প্রেম থাকবে।"

"বাঁচালে। অন্তত একটা জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার মিল থাকবে। বুর্জোয়া বলে আমার লেখা অপাঙ্‌ক্তেয় হবে না।" স্বপনদা দীপিকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বাবলীর দিকে তাকান।

হঠাৎ এল্‌ফ তেড়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়। কলিং বেল বাজবার আগেই টের পায় কারা যেন আসছেন।

"আরে, এস, এস।" স্বপনদা দরজার সামনে গিয়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়ান। পার্টির অতিথিরা একে একে বা জোড়ে জোড়ে হাজির হন।

"ব্যাপার কী হে! আজকের এই পার্টি কেন? তোমাদের কারো জন্মদিন নয় তো। উপহার আনা হয়নি।" বলেন সুবিনয় তালুকদার।

"না, তেমন কোনো উপলক্ষ নেই। এমনি একটু আড্ডা দিতে খেয়াল হলো। ক্লাব উঠে গেছে। ভাব বিনিময় তো উঠে যায়নি। তোমরা যদি রাজী হও আমরা ক'জন মিলে ছোট একটা গ্রুপ গঠন করতে পারি। কালচারাল গ্রুপ। যুদ্ধবিগ্রহের দিনে কেবল যে মানুষ ধ্বংস হয় তা নয়, তার সৃষ্টিও ধ্বংস হয়। আমাদের কাজ হবে নতুন সৃষ্টির নকশা তৈরি করা। যাতে শূন্যতা পূরণ হয়।" স্বপনদা নিবেদন করেন।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুবিনয় বলেন, "এই নিয়ে ক'বার হলো? সেই স্কুলজীবন থেকেই তুমি একটার পর একটা গ্রুপ গঠন করে আসছ। পারলে কি একটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একবার একটা বাণী দিয়েছিলেন। তাতে ছিল, বাঙালীর উৎসাহ খড়ের আগুনের মতো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দপ করিয়া নিভিয়া যায়। তখন মানতে চাইনি।

এখন মানতে হচ্ছে। আড্ডা দিতে বাঙালীর জুড়ি নেই। আমরা আবার আড্ডা দেব। কিন্তু নতুন সৃষ্টির নকশা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করা বৃথা। তার জন্য চাই দৃষ্টি। দৃষ্টি আমাদের সীমিত। ইংরেজ এদেশে না এলে আরো সীমিত থাকত। ওরা চলে গেলে আমরা আমাদের পুরানো গণ্ডীতে ফিরে যাব। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোজগতে। ওরা লুটই করতে এসে থাকুক আর রাজত্বই করতে, ওরা নিয়ে এসেছিল আস্ত একটা যুগকে। যুগটাও যদি ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় তবে আমরা আবার পদাবলী আর মঙ্গলকাব্য আর পাঁচালী লিখব। নতুন সৃষ্টির নকশা? তার রূপায়ণ করবে কারা? কাদের জন্যে? তোমার আমার দিন গেছে বলেই ধরে নাও। আমরা কেবল বাঙালী নই, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ফসল। ফসল থেকে ফসিল। আমাদের সম্বন্ধে লেখা হবে, ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। এমনটি আগেও হয়নি, পরেও হবে না।"

"তার মানে," স্বপনদা টিপ্পনী কাটেন, "ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের অস্তিত্বও শেষ হয়ে এল। তার শূন্যতা পূরণ করবে মধ্যযুগের পুনরাবর্তন। কিন্তু আমি যা নিয়ে ভাবছি তা কেবল ভারতের ভবিষ্যৎ নয়, বিশ্বের ভবিষ্যৎ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ। মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধ যে শূন্যতা রেখে যাবে সেই শূন্যতার পূরণ। আমরা ক'জন কি শুধু বাঙালী, শুধু ভারতীয়? আমরা কি মানুষ নই? এ সঙ্কট মানবিকতারও সঙ্কট। মুসলমানরা যেমন বলে, ইসলাম ইন ডেঞ্জার, তেমনি আমারও বলতে ইচ্ছা করে, হিউমানিজম ইন ডেঞ্জার। আমরা এমন কিছু হারাতে যাচ্ছি যা পাঁচশো বছর ধরে ইউরোপকে সৃষ্টিশীল রেখেছে, দেড়শো বছর ধরে ভারতকেও, বিশেষ করে বাংলাকেও। এই যুদ্ধ যদি আরো সংক্রামক হয়, যদি রাশিয়া থেকে এশিয়ায় ছড়ায়, যদি ইরান হয়ে ভারতেও ঢোকে তা হলে আমরাও হব যুদ্ধক্ষেত্রের সামিল। মহাযুদ্ধ হচ্ছে মহাসংক্রমণ। দেশ স্বাধীন হলেও যে যুদ্ধ এড়াতে পারত তা নয়। এটা কোন একটি নেশনের একক সাধ্যের অতীত। কিন্তু এই মহামারীর পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা মানুষ বলে পরিচয় দিলেও হিউমানিজমের মহিমা উপলব্ধি করবে না। এইসব চিন্তা করেই আমি আবার এক গ্রুপের পত্তনে উদ্যোগী হয়েছি।"

"ওদিকে আরো একটা গ্রুপের পত্তন হয়েছে।" ইন্দ্রজিৎ রাহা সংবাদ দেন। "মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট গ্রুপ। হিউমানিজমকে

বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় তাকে র‍্যাডিকাল করা। কিন্তু আমাদের যা ঐতিহ্য তা লিবারল হিউমানিস্ট ঐতিহ্য। এর থেকে একচুল সরে গিয়ে যদি আমরা র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট হই তবে আরো একচুল সরে গিয়ে কমিউনিস্ট হিউমানিস্ট হব না কেন? তাই গোলে হরিবোল দেবার জন্যে রব উঠেছে সবাইকে হতে হবে অ্যান্টিফাসিস্ট। আবে, অ্যান্টিফাসিস্ট তো মোল্লা মৌলবী গুরু পুরোহিতরাও। যারা হিউমানিজমের ধার ধারে না তারাও। যারা বলে লিবারল হিউমানিজমের যুগ গেছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা অ্যান্টি-ফাসিস্ট হতে রাজী নই। আমি বরাবর লিবারল হিউমানিস্ট ছিলুম, এখনো তাই, পরেও তাই থাকব। যুগ যদি যায় যাবে। তাকে আটকে রাখার দায় আমার নয়। আমাদের গ্রুপেরও নয়। আচ্ছা, একটা ম্যানিফেস্টো বার করলে কেমন হয়? কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মতো লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টো। না, না, হাসির কথা নয়। আমি সীরিয়াস।"

বাবলী এতক্ষণ উসখুস করছিল, এবার দীপিকা বৌদির কানে ফিস ফিস করে বলে, "মাফ কোরো, বৌদি, আমার একটু কাজ আছে। আরেকদিন আসব।"

"সে কী!" স্বপনদা টের পেয়ে বলেন, "তুমি উঠছ কেন? তোমাকে তো বলেছি আজ এটা তোমার খাতিরে আরেকবার বৌভাত। লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস, চাটনি, মিষ্টি সব কিছুই পাবে। শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সেইজন্যে কথাবার্তা চালু রাখা দরকার। তোমাকে তো কেউ লিবারল হিউমানিস্ট হতে বলছে না। তুমি কমিউনিস্ট হিউমানিস্ট, আমরা লিবারল হিউমানিস্ট। আধাআধি মিল তো আছে। অমিল যেটা সেটা আপাতত চাপা পড়ছে। তবে আমরা ওই অ্যান্টিফাসিস্ট ভেক ধারণ করতে নারাজ। আমাদের পক্ষে ওটা হবে ভণ্ডামির ভেক। ভাগনার (Wagner) আমার প্রিয় সঙ্গীতকার। আমার যখন খুশি তখন আমি ভাগনার বাজাব। ওদিকে জার্মানীতে বসে হিটলারও তাই করছেন। হিটলার ভাগনার ভালো-বাসেন। ওঁর সঙ্গে আমার এইখানে একটা মিল রয়েছে। গুপ্তচরের ভয়ে আমি এটা গোপন করতে পারব না। আরো জোরে 'সিগফ্রিড' বাজাব। যে সঙ্গীত দেশোত্তর ও কালোত্তর তাকে ফাসিস্ট বলে চিহ্নিত করা মূর্খতা। আমি সেই মূর্খতার পায়ে আত্মসমর্পণ করব না। আমি জানতে চাই ক'জন অ্যান্টিফাসিস্টের এ সাহস আছে।"

এটা যেন বাবলীর প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। বেচারি একলা পড়ে গেছে, ওর নিজের দলবল এখানে নেই। মস্কো বিপন্ন, লেনিনগ্রাড বিপন্ন, ঠিক এই মুহূর্তে যদি কেউ 'সিগফ্রিড' বাজায় তাতে জার্মান পক্ষের মনের জোর বাড়ে, রুশ পক্ষের মনের জোর কমে। সঙ্গীতের উপরে হার জিৎ নির্ভর করে বইকি। বাবলী বলে, "স্বপনদা, তুমি কি কখনো চাইকোভস্কির 'নাটক্র্যাকার' বাজাও না?"

"বাজাই বইকি। রিমস্কি-কোরসাকোভও আমার প্রিয়।" স্বপনদা উত্তর দেন।

"তা হলে আমি শুনতে আসব, যেদিন বার্লিন বিপন্ন হবে সেদিন। ওঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না। ওঁদের সঙ্গীতও দেশোত্তর ও কালোত্তর। তা হলে তো কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সেদিন ধরা পড়বে তোমার নিজের সেন্টিমেন্ট কোন্ দিকে। তবে আমার মিনতি শোন। বুক ফুলিয়ে ভাগনার বাজাতে যেয়ো না। ওতে আমাদের শত্রুপক্ষের উল্লাস বাড়বে। আমাদের মিত্রপক্ষের বিষাদ গাঢ় হবে।' বাবলীর কণ্ঠস্বর কাঁপে।

"সঙ্গীতের কী অসামান্য প্রভাব!" অনীতা তালুকদার বলেন। "আমাদের দেশেই আমরা দেখেছি 'বন্দে মাতরম্' কেমন করে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামের বল জোগায়। আচ্ছা, মিস সেন, 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আপনাদের কী মত? ওটা কি অ্যান্টিফাসিস্ট সম্মেলনে গান করতে পারা যাবে?'

"ওতে মুসলমান কমরেডদের আপত্তি আছে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী' ওরা আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারে না। সেটাও আরেক রকম ভণ্ডামি। ওর বদলে 'জনগণমন'র প্রস্তাব উঠেছে। 'ভারত-ভাগ্যবিধাতা' কে? কেউ বলে ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বর, কেউ বলে ঈশ্বর। আমরা কমিউনিস্টরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। তাই আমাদের আপত্তি ঈশ্বরে। আর জুলিদের আপত্তি ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বরে। তৃতীয় কোনো সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 'ইণ্টারন্যাশনাল' আজকাল রাশিয়াতেও অচল। ওরা নাকি নতুন একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে, যেটা ওদের দেশোপযোগী। ওদেশে এখন দেশভক্তির জোয়ার এসেছে। দেশ বাঁচলে তো ধর্ম বাঁচবে। ধর্ম বলতে ওদেশে কমিউনিজম বোঝায়। 'পিতৃভূমি'র জন্যে ওরা প্রাণ দিচ্ছে। ওদেশেও তো কতক লোক আছে যারা কমিউনিস্ট নয়। ওরাও সমানে প্রাণ

দিচ্ছে। মতবাদের দিক থেকে যে যাই হোক না কেন, দেশরক্ষার বেলা সবাই ওরা পেট্রিয়ট। পেট্রিয়টিক সঙ্গীতই ওরা আজকাল বাজায়।" বাবলী বিশদ করে।

"আমরা ভারতীয়রাও তো পেট্রিয়ট। আমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন হলে আমরা কী বাজাব? এমন কোন্ সঙ্গীত আছে যাতে মুসলমানদের আপত্তি হবে না, কমিউনিস্টদের আপত্তি হবে না? অ্যান্টিফাসিস্ট বলে যাঁরা সম্মিলিত হচ্ছেন তাঁদের পায়ের তলায় কোন্ দেশের মাটি? কথাটার মধ্যে দেশের তো নামগন্ধ নেই। মতবাদেরও কি আছে? অ্যান্টিফাসিস্ট বললে কেবল যে কমিউনিস্ট বোঝায় তা নয়, লীগপন্থী মুসলমান, মহাসভাপন্থী হিন্দুও বোঝায়। অমন এক জগাখিচুড়ির জন্যে জান দেবে ক জন! দেশ যদি বিপন্ন হয়।" জিজ্ঞাসা করেন আদিত্য বর্মণ।

বাবলী উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খায়। দীপিকা বৌদি তার দশা দেখে মুখ খোলেন। "এ বেচারি সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। এর কাছে জবাবদিহি প্রত্যাশা করা অন্যায়। তা ছাড়া জবাবদিহির দায়টা তো কেবল কমিউনিস্টদের নয়। ন্যাশনালিস্টরাও কি হিটলারবিরোধী মুসোলিনিবিরোধী তোজোবিরোধী নন? তাঁদেরও জবাবদিহি করতে হবে। টার্কি যদি জার্মান শিবিরে যোগ দেয় তবে হিটলারের ফৌজ অনায়াসে ইরানে ঢুকবে, ইরান পেরিয়ে বেলুচীস্থানে। মুসলমানদের মতিগতি কোন্ দিকে তা তো এখন থেকেই আঁচতে পারা যাচ্ছে। ওরা চায় পাকিস্তান। হিটলারবাহিনী যেদিন বেলুচীস্থানে ঢুকবে সেদিন সেখানে পাকিস্তানের নিশান উড়বে।"

অতিথিরা সকলেই দমে যান। টুঁ শব্দটি করেন না। খবর আসে, খাবার তৈরি। আজ দেশী মতেই রান্না। সাহেবী মতে নয়।

বাবলী না থাকলে মহিলার সংখ্যা কম পড়ত। জোড় মিলত না। ও মেয়েকে বসিয়ে দেওয়া হয় ওরই মতো অবিবাহিত একজন পুরুষমানুষের পাশে। ওই আদিত্য বর্মণ। স্বপনদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান। কালচারাল গ্রুপ গঠন করতে উৎসাহী। বাবলীকেও সঙ্গে পেলে সুখী।

"নো কমিটমেণ্ট। আপনার দিক থেকেও না। আমাদের দিক থেকেও না। আপনাকে আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলব না। আপনিও আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলবেন না। আমরা কেউ ফাসিস্ট নই। তা বলে

অ্যান্টিফাসিস্ট বলে নাম জাহির করতেও চাইনে। ওর মধ্যে একটা রাজ-নৈতিক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যাঁরা অ্যান্টিফাসিস্ট বলে পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কমিটেড। আমরা কমিটেড নই। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে কেন আমরা আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে অপ্রিয় হতে যাই? ওঁদের অনেকেই এখন জেলে। ওঁরা কী মনে করবেন, আমরা যদি রাশিয়ার স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাই! ভারতের স্বার্থ বলতে কি স্বতন্ত্র কিছু নেই?" বর্ষণ সুধান।

"ভারতের স্বার্থ বলতে যদি বোঝায় ভারতের কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ, যারা শতকরা আশিজন, তা হলে ভারতের স্বার্থ এ যুদ্ধে কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বরক্ষা। এ লড়াই ভারতের কৃষক শ্রমিকদেরও লড়াই। তাই এর নাম জনযুদ্ধ। ইংরেজরা এর শরিক বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও আমাদর জাত যায় না। ওদের সঙ্গে আমাদের পাণ্ডব কৌরব সম্পর্ক। আপৎকালে পাণ্ডব ও কৌরব মিলে একশো পাঁচ ভাই। আমার প্রাণের বন্ধু মঞ্জুলিকাকে আমি কিছুতেই এ তত্ত্ব বোঝাতে পারিনি। ও বেচারি জেলে পড়ে আছে। কী করা যায়, বলুন। শতকরা আশিজনের স্বার্থটাই তো বড়ো। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপদে ওদেরও বিপদ। দেশ মানে কি খালি দেশের মাটি? না দেশের অধিকাংশ মানুষ?" বাবলীর পালটা প্রশ্ন।

বাবলীর ডানদিকে বসেছিলেন সুবিনয় তালুকদার। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দেন। "এমনও তো হতে পারে যে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ বিদেশী পুঁজি-পতিদের স্বার্থবিরোধী। তেমন ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিপতির হাত থেকে পরিত্রাণই কি সর্বপ্রথমে প্রার্থনীয় নয়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে ইংরেজরা ইংলণ্ডের বাইরে লড়ছে ভারতীয় জওয়ানদের কাঁধে চড়ে? গতবারের যুদ্ধে তেরো লাখ জওয়ান ওদের কাঁধে চড়িয়ে লড়েছিল। ক্যাজুয়ালটি এক লাখের উপর। কী লাভ হলো তাদের জাতভাইদের? তাদের শ্রেণীভাইদের? কী করে আমরা জানব যে এবারকার যুদ্ধের পর ইংরেজ আবার আমাদের ভাঁওতা দেবে না? একনম্বর ভাঁওতাবাজ ওই চার্চিল মহাপ্রভু। ওঁর নীতি হচ্ছে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ওঁর অনিচ্ছুক মুষ্টি থেকে স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবেই যুদ্ধের পরে। যদি ওঁর দেশ জয়ী হয়। তা হলে যুদ্ধের মাঝখানে কেন নয়? এটাই হলো ভারতের পেট্রিয়টদের

যুক্তি। রাশিয়ার পেট্রিয়টদের যুক্তির সঙ্গে এর অমিল কোথায়? রাশিয়ানরাও এখন পেট্রিয়ট হিসাবেই লড়ছে। ভারতীয়রাও পেট্রিয়ট হিসাবে লড়তে রাজী। যদি ইংরেজরা তাদের কাঁধ থেকে নামে। কংগ্রেস যদি স্বাধীন হয়ে সমান হয়ে লড়তে পারে তবে রাশিয়ার পক্ষেই লড়বে, মিস সেন।"

"দেশ যদি আজ এখনি স্বাধীন হয় আমিই সব চেয়ে সুখী হব, দাদা। কিন্তু এর জন্যে আমি ইংরেজকে জেরবার করতে পারব না। জেরবার হলে সে কেমন করে সোভিয়েটের শত্রুর সঙ্গে লড়বে? একবছর আগে আমরাও তো যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপে যোগ দিয়েছি ও জেলে গেছি। তখন ইংরেজ আমাদের শত্রু ছিল। এখন সে মিত্র। অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবস্থার পরিবর্তন।" বাবলী কৈফিয়ৎ দেয়।

স্বপনদা বিরক্ত হয়ে বলেন, "এরই নাম কালচারাল গ্রুপ! প্রাথমিক অধিবেশনেই রাজনীতি! চকোলেট, তুমি খাবারে মন দাও।"

"উনি নিজেই তো একটি খাবার!" রসিকতা করেন অদিতি রাহা। "অমন রসনারোচন নাম রাখল কে?"

"ওটা আমারই কীর্তি।" জবাব দেন স্বপনদা। "ওরা দুই বান্ধবী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বাবলী আর জুলি। আমার চোখে ওরা দুই বিপ্লবী নায়িকা নয়, দুটি নিরীহ নাবালিকা। আমি ওদের এক-জনকে খেতে দিই চকোলেট, আরেকজনকে ক্যারামেল। সেই থেকে ওদের ডাকনাম দাঁড়িয়ে যায় মিস চকোলেট আর মিস ক্যারামেল। ফী বার অবশ্য চকোলেট আর ক্যারামেল জোগাতে পারিনে। তবে ওরা যখনি আসে তখনি কিছু না কিছু খেতে পায়। দুঃখের বিষয় ক্যারামেলকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। সে এখন জেলে বসে লপসী খাচ্ছে।"

"না, দাদা।" বাবলী শুধরে দেয়। "দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। ওখানে ওর যা দাপট ওয়ার্ডররাই মেমসাহেব বলে সেলাম ঠুকছে। ওদের মনে ত্রাস জন্মেছে, প্রাণহানির নয়, চাকরিহানির। জুলি ওদের এই বলে শাসিয়েছে যে দেশ তো স্বাধীন হবেই, তখন সে যার যার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে তার তার চাকরি যাবে। ওর হাতে নোটবই দেখলেই ওরা ত্রাহি ত্রাহি করে। লপসী খাবে কে? জুলি? পরিজ ছাড়া ওর ব্রেকফাস্ট হয় না। কোয়েকার ওটস। আমেরিকায় তৈরি।"

"এই তোমাদের স্বদেশিয়ানা !" স্বপনদার মুখে হাসি। "অবশ্য আমরাও তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট করি। লোকে বলে সেটা সাহেবিয়ানা।"

"এখন তো ইংরেজ তোমাদের মিত্র। তোমরাও দেশের ঘরে ঘরে সাহেবিয়ানা চালাও।" পরামর্শ দেন বৌদি।

"শুধু সাহেবিয়ানা কেন? রুশিয়ানা।" জুড়ে দেন অদিতি রাহা। "ভাই, তুমি আমাকে একটা সামোভার কিনে দেবে?"

## ॥ তিন ॥

সামোভার যে কী বস্তু আর কোথায় কিনতে পাওয়া যায় এ বিষয়ে বাবলীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। মেয়েটি ঠাট্টাও বোঝে না। ভাবনায় পড়ে যায়।

"চায়ের কেটলী হচ্ছে বিদেশিয়ানা। ওকে বর্জন করতেই হবে। কিন্তু সামোভার তো স্বদেশিয়ানা নয়। আচ্ছা, চা জিনিসটাও তো বিদেশী। দেশ স্বাধীন হলে চা কফি সিগারেট থাকবে, না ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে? তোমরা কি হুঁকো ফিরিয়ে আনবে? সিদ্ধি খাবে?" কৌতুকের সঙ্গে সুধান বর্মণ।

"আমাদের এটা একটা আন্তর্জাতিক গ্রুপ। এখানে চা কফি সিগারেটও চলবে, কেটলীর মতো সামোভারও চলতে পারে। হুঁকো আর সিদ্ধি কিন্তু অচল, কারণ অনাধুনিক। আমরা রিভাইভালিস্ট নই।" স্বপনদা বিধান দেন।

"সামোভার চলুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই আপনার, মিস সেন, কমিউনিজমের নামে আপনারা রাশিয়ানিজম ডেকে আনবেন না।" হাত জোড় করেন তালুকদার। "আজকাল কেউ কেউ বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন সোভিয়েট রাশিয়া নাকি তাঁদের পিতৃভূমি। বিদেশ যদি কারো কাছে স্বদেশ হয় তবে স্বদেশও তাঁর কাছে বিদেশ। এঁরা কি তবে বিদেশী? অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"চ্যাটার্জি?" বর্মণ বলেন, "তাঁর পিতৃভূমি যদি সোভিয়েট রাশিয়া হয়

তবে তো তিনি চ্যাটারস্কি। আর তাঁর কমরেডরা ঘোস্কি, বোস্কি, মুখারস্কি, ব্যানারস্কি।"

"এ প্রসঙ্গে স্বপনমোহন তপনোভিচ গুপ্তোভ কী বলেন ?" রাহা বানিয়ে বানিয়ে প্রশ্ন করেন। "আর দীপিকা নরেশোভ্‌না গুপ্তোভা ?"

হাসির ধুম পড়ে যায়। এ এক মজার খেলা। স্বপনদা প্রতিবাদ করেন। "সে কী কথা। আমরা যে ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আমাদের পূর্বপুরুষ। তবে কালক্রমে আমরা বৈদ্য বৃত্তি অবলম্বন করেছি।" স্বপনদার নিবেদন।

"ধন্বন্তরি গোত্রটাও কি কালক্রমে বর্তেছে ?" রহস্য করেন রাহা।

"আর এই যে বাবলী দেখছ এঁদের বংশ আরো প্রাচীন। কংসের পিতা উগ্রসেন এঁদের পূর্বপুরুষ। কালক্রমে এঁরাও বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন।" স্বপনদার বক্তব্য।

"না. দাদা, আমরা বৈদ্য নই, কায়স্থ।" বাবলী সংশোধন করে।

"এখন কথা হচ্ছে," রাহা বলেন, "রুশিয়ানা চলতি হলে চ্যাটার্জি যদি হয় চ্যাটারস্কি, গুপ্ত যদি হয় গুপ্তোভ, সেন হবে কী ? সেনিন ?"

"তা হলে দাঁড়াবে অপরাজিতা শিবশঙ্করোভনা সেনিনা।" বর্মণের উক্তি।

বাবলী বিব্রত হয়ে বলে, "আমি বাঙালীই থাকব। কমিউনিজম আর রাশিয়ানিজম এক জিনিস নয়।"

"এই কথাটাই আপনার মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছি আমরা। কিছু মনে করবেন না, বোন।" তালুকদার বলেন, "এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে যাঁরা মুসলমান হলেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আরবী নাম নিয়ে হজরত মোহাম্মদের স্বজাতি বনে গেলেন। আরব দেশই হলো তাঁদের স্বদেশ আর ভারত তাঁদের বিদেশ। তাঁরা এখন নিজ বাসভূমে পরবাসী। তাঁদের জন্যে চাই পাকিস্তান। আরবরা তাঁদের স্থান দেবে না। তেমনি কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়ে আপনারাও যদি সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান কালচার গ্রহণ করেন তবে হয়তো একদিন আপনাদের জন্যেও একটা আলাদা হোমলাণ্ড দাবী করবেন। মক্কা আর মদিনার মতো আপনাদের পবিত্র তীর্থ তো মস্কো আর লেনিনগ্রাড। মস্কো আর লেনিনগ্রাড বিপন্ন বলে আপনারা তেমনি মর্মাহত হয়েছেন যেমন উতলা হয়েছিলেন মক্কা

আর মদিনা খলিফার শাসনে থাকবে না শুনে ভারতের মুসলমানরা। তাদের সেই যে খেলাফৎ আন্দোলন তাতে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আমরাও জড়িয়ে পড়েছিলুম। পড়াশুনা ছেড়ে জেলে গেছলুম। এবারেও আপনাদের বিপদে আমাদের সহানুভূতি আছে, তবে জেলে যেতে আপনারাও বলছেন না, আমরাও রাজি নই। এক জীবনে দু'বার একই ভুল হয় না। আমরা কেউ বা ন্যাশনালিস্ট, কেউ বা র‍্যাশনালিস্ট, কেউ বা সোশিয়ালিস্ট। কিন্তু কেউই বিদেশকে স্বদেশ আর স্বদেশকে বিদেশ বলে ভ্রম করিনে।"

বাবলী বেচারি কোণঠাসা হয়ে বৌদির দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। তিনি তার পক্ষ নিয়ে বলেন, "ওটা কিন্তু ঠিক হলো না, সুবিনয়দা। খেলাফৎ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে আপনাদের জেল হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বরাজ আন্দোলন। মুসলমানরা বিনা শর্তে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিত না। হিন্দুরা বিনা শর্তে খেলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিত না। দুই নৌকায় পা রেখে যাত্রা করলে যা হয়। পা ফসকে যে যেদিকে পারে ভেসে যায়। মুসলমানরা ভাসতে ভাসতে এখন পাকিস্তানে কুল খুঁজছে। হিন্দুরা স্বাধীন ভারতের জন্যে সত্যাগ্রহে নেমেছে। অবশ্য হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানও আছে। কমিউনিস্টরাও থাকত, যদি না রাশিয়ার বিপদে ইংরেজরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। কে যে আজকের দিনে ভুল করছে আর কে যে ঠিক করছে তা বলবার সময় আসেনি। রাশিয়া যদি জার্মানদের রুখতে না পারে তবে ওরা কি টার্কি ও ইরান ভেদ করে ভারতের ঘাড়ে এসে পড়বে না, সুবিনয়দা? মস্কো আর লেনিনগ্রাডের জন্যে সহানুভূতি অহেতুক নয়। ওতে আমাদের স্বার্থ আছে। তা বলে আমরা রাশিয়ান বনে যাব না। বাবলীও খাঁটি বাঙালীই আছে ও থাকবে। তবে সামোভার একটা আমিও কিনবই। আমাদের এটা একটা আন্তর্জাতিক গ্রুপ। কেটলী আর সামোভার উভয়ের স্থান আছে।"

"আমার বক্তব্য হলো, ইসলাম গ্রহণ করলে আরব্য কালচার গ্রহণ করতে হবে, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে ইউরোপীয় কালচার গ্রহণ করতে হবে, কমিউনিজম গ্রহণ করলে রুশ কালচার গ্রহণ করতে হবে এটা একটা ভ্রান্তি। মাইকেল মধুসূদন এর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। নইলে 'মেঘনাদবধ' হতো না। বাংলার কমিউনিস্টদের একথা মনে রাখতে হবে। রুশ সাহিত্য আমার কাছে ইংরেজীর মতোই প্রিয়। টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেকভ, গোর্কি এঁরা আমার

আপনজন। রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি আমার পক্ষে সহজাত। তা বলে রাশিয়াকে আমি পিতৃভূমি বলে ওর জন্যে লড়তে যাব না। যদি না রুশরাও আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে লড়ে।" তালুকদার সুস্পষ্ট করেন।

বাবলী যে অস্বস্তি বোধ করছে এটা আঁচতে পেরে স্বপনদা বলেন, "তুমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছ, সুবিনয়। আমার এই প্রিয় বোনটিকে আমি চকোলেট বলে ডাকি, তাই বলে বোনটি কি ইংরেজ বনে গেছে? এ কখনো রাশিয়ান বনে যাবে না, তুমি দেখো। তবে রাশিয়ার দুর্দিনে তার প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে পারে না। আমিও সহানুভবী। রাশিয়া তো জার্মানী আক্রমণ করেনি। জার্মানী কেন রাশিয়া আক্রমণ করতে যায়? তবে মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আছে এর তাৎপর্য। মহাযুদ্ধ হচ্ছে একপ্রকার মহামারী। ছড়িয়ে পড়াই তার স্বভাব। মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে রাশিয়াই যে আফগানিস্থান ভেদ করে ভারতে এসে হাজির হবে না তাই বা কে বলতে পারে? রিবেনট্রপের সঙ্গে মলোটভের কোলাকুলি দুটো বছরও টিকল না। চার্চিলের সঙ্গে স্টালিনের কোলাকুলি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। চকোলেটকে সাবধান থাকতে বলি। কালকের শত্রু আজকের মিত্র। আজকের মিত্র কালকের শত্রু। আবার কখন জেলে ধরে নিয়ে যায় কে জানে!"

এর থেকে ওঠে জুলির প্রসঙ্গ। জুলি এখনো জেলে। বিনা বিচারে আটক। ওর জন্যে কী করা যায় সে এক সমস্যা। বিচার দাবী করলে বিচারে দণ্ড হবেই। ক্ষমা ভিক্ষা করলে জুলি নিজেই মারতে আসবে। এক যদি কর্তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুক্তি দেন। কেনই বা দেবেন, যদি মুক্তি পেয়ে ও মেয়ে আবার যুদ্ধবিরোধিতা করে? ও কি মুচলেকা দিতে রাজী আছে আর অমন কর্ম করবে না? ওর হয়ে ওর মাও কি রাজী আছেন? মুশকিল হচ্ছে ওর মা ওর গার্জেন নন। ওর নিজস্ব আয় আছে। শ্বশুরবাড়ী থেকে মাসোহারা আসে। বিধবার জীবনস্বত্ব।

'চকোলেট আর ক্যারামেল দুই আমার কাছে সমান মিষ্টি। কে কমিউনিস্ট, কে ন্যাশনালিস্ট সেটা আমার গণনা নয়। আমি তো লঘুচেতা নই। আমার বসুধৈব কুটুম্বকম্। চকোলেটের জন্যে আমার দুর্ভাবনা গেছে, ক্যারামেলের জন্যে আছে। ও যদি ছাড়া পায় তবে আরো একদিন ওর খাতিরে বৌভাত হবে। কী বলো, বৌ?" স্বপনদা সুধান। তিনি সত্যিই চিন্তিত।

"বেশ তো। আমি খুশি হব।" বধূর উত্তর।

"আমি কিন্তু ওর সঙ্গে সম্মুখ সমরে নারাজ।" বাবলী সন্ত্রস্ত স্বরে বলে। "দেশদ্রোহী বলে ও আমাকে সকলের সামনে অপমান করবে। আমি যে গায়ে পেতে নেব তা নয়। দেশ কি শুধু বুর্জোয়াদের দেশ? শতকরা আশি-জন শ্রমিক কৃষকের দেশ নয়? ওদের স্বার্থেই আমি লড়েছি, এখনো লড়ছি। আজকের লড়াইটা রাশিয়ান ফ্রন্টে। আমার হয়ে আমার রুশ কমরেডরা লড়ছে।"

দুই রণরঙ্গিণীর দ্বন্দ্ব দেখতে কারো উৎসাহ ছিল না। এটা একটা কাল-চারাল গ্রুপ। রাজনীতির আখড়া নয়। স্বপনদা খেদ প্রকাশ করেন।

"কী দুর্ভাগ্য আমাদের।" তালুকদার বলেন, "একদিকে কংগ্রেস লীগ বিরোধ। তার মানে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ। আরেকদিকে কংগ্রেস কমিউনিস্ট বিরোধ। তার মানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ। ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে রাজত্ব সঁপে দিয়ে যায় তবে নতুন সরকারকে একহাতে মুসলমানদের দমন করতে হবে, আরেক হাতে কৃষক শ্রমিকদের। যদি না তারা দেশের স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের তথা শ্রেণীস্বার্থের উধ্বে স্থান দেয়।"

"দুরাশা। দুরাশা। দুটোই দুরাশা।" রাহা হাহাকার করেন।

"কংগ্রেস সরকার দু'দিন বাদে পদত্যাগ করবে। কংগ্রেস নেতারা তিন-দিন বাদে জেলে ফিরে যাবেন। দেশ শাসন করবে কে? যে শাসন করতে পারবে সে। আমি যতদূর দেখতে পারছি ওই ইংরেজ।" বর্মণ বলেন।

"ওরাও আমাদের ছাড়বে না, আমরাও ওদের ছাড়ব না। অথচ ঝগড়াও করব। এটাও এক প্রকার দাম্পত্য কলহ।" তালুকদার পরিহাস করেন।

"সেই সঙ্গে দুয়ো সুয়োর কোন্দল।" বর্মণ হাসি চাপেন।

"চিরন্তন ত্রিভুজ। ইংরেজ থাকতে এ কোন্দল মিটবে না। এ কোন্দল না মিটলে ইংরেজ যাবে না। নিয়তি! আমাদের নিয়তি! ভাবতেই পারা যায় না যে ইংরেজ নেই, হিন্দু মুসলমান শান্তিতে আছে।" স্বপনদার বদ্ধমূল ধারণা।

বাবলী তা শুনে সবাক হয়। "এর একমাত্র প্রতিকার ডিকটেটরশিপ অভ দ্য প্রোলিটারিয়াট। তখন কে হিন্দু কে মুসলমান! সবাই এককাট্টা। এখন যেটা দেখছি সেটা একদল বুর্জোয়ার সঙ্গে আরেকদল বুর্জোয়ার বিবাদ। দু'পক্ষই জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। জনগণকে কাঁঠালের একটি কোয়াও খেতে দিচ্ছে না।"

চমকে ওঠার মতো ব্যাপার নয়। কমিউনিস্টরা তো ওকথা হামেশাই বলে থাকে। তবু অপ্রত্যাশিত বলে সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন।

"কিন্তু, চকোলেট, তোমার যুক্তির সঙ্গে তোমার কর্মের সামঞ্জস্য কোথায়? চার্চিলের চেয়ে বড়ো কাঁঠালখোর কে? তাঁর মতো আরেক কাঁঠালখোরের সঙ্গে সংগ্রামে প্রোলিটারিয়ানদের ডিকটেটর নিচ্ছেন তাঁরই দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র। আর তোমরাও সেই একনম্বর কাঁঠালখোরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। প্রতিকারের জন্যে তোমাদের দিকে তাকাবে কোন্ হিন্দু, কোন্ মুসলমান?" স্বপনদা সংশয়ান্বিত।

"আর প্রতিকার যাকে বলছ তা ব্যাধির চেয়েও খারাপ।" দীপিকা বৌদি বলেন। "বুর্জোয়ারা নির্মূল হলে দেশের কালচার রক্ষা করবে কারা? সেই সম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে কারা? রুশদেশে কি সে সম্পদ বেড়েছে। অন্তত রক্ষা পেয়েছে? এই তো সেদিন পর্যন্ত চেকভ পড়তে পাওয়া যেত না। ডস্টয়েভস্কি তো এখনো অপ্রাপ্য। রাশিয়ার জনগণের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে ডস্টয়েভস্কিকে বাদ দিলে জনগণেরই ক্ষতি। বুর্জোয়া বলে তোমরাও কি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবে না? হিন্দু মুসলিম বিরোধের প্রতিকার কি এই যে ধর্ম জিনিসটাকেই আফিং বলে নিষিদ্ধ হবে? এ যেন মাথাব্যথা সারানোর জন্যে মাথাটাকেই কেটে বাদ দেওয়া।"

"না, বৌদি! সে রকম অভিসন্ধি আমাদের কারো নেই। আমরা সংস্কৃতিও রাখব, ধর্মও রাখব। কিন্তু বুর্জোয়া আধিপত্য রাখব না। তা হলেই দেখবেন হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে বাস করছে, কথায় কথায় মারামারি করছে না। আর সংস্কৃতিরও তখন রূপান্তর ঘটবে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ চাষী মজুরের ঘরে ঘরে জন্মাবে। ওরা উঠতে চায়, ওদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। উপর থেকে জগদ্দল পাথরের চাপ সরে গেলে ওরাও মাথা তুলে দাঁড়াবে। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির।' কাজী নজরুল ইসলাম তার নমুনা।" আশ্বাস দেয় বাবলী।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছে। সভ্যতার সঙ্কটে তাঁর শরীর মন ভেঙে পড়েছিল। নাৎসীদের রুশ আক্রমণ জুন মাসে। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ আগস্ট মাসে। একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ ছিল বলে স্বপনদার ধারণা।

"রবীন্দ্রনাথ থাকতেও, কাজী নজরুল থাকতেও বাংলার হিন্দু মুসলমানকে

মেলানো গেল না। আজ তো রবীন্দ্রনাথও নেই। নজরুলেরও শুনেছি মানসিক দুরবস্থা। একদিন দেখতে যেতে হবে।" স্বপনদা বলেন।

"দু'পক্ষের কাগজগুলো পড়ে দেখছ, স্বপন? দাঙ্গার পূর্বাবস্থা। যে-কোনোদিন বেধে যেতে পারে।" রাহার কণ্ঠে আতঙ্কের সুর।

"তখন আমরা ভালোমানুষ সেজে বলব ইংরেজের চালবাজি। একই নিঃশ্বাসে বলব, মুসলমানদের বজ্জাতি।" বর্মণ বলেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার, যারাই সব চেয়ে উগ্র ব্রিটিশবিদ্বেষী তারাই সব চেয়ে উগ্র মুসলমানবিদ্বেষী।"

তালুকদার মন্তব্য করেন, 'তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁদের প্রতিপক্ষ পলাশীর পরাজয়ের জন্যে হিন্দুদেরই দায়ী করেন, আর বিজেতাদের হাত থেকে নবাবী ফিরে পেতে চান। নবাবী বলতে অবশ্য মীর জাফরের নবাবী, সিরাজের নবাবী নয়। ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হয় লড়বে হিন্দুরা। মরতে হয় মরবে হিন্দুরা। মুসলমান ওর মধ্যে নেই।"

"বাঙালী যদি দুই ভাগ হয়ে যায় বাংলাও দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে।" স্বপনদা হুঁশিয়ারি দেন। "কাগজ যারা লেখে তাদের কি মতিভ্রংশ হয়েছে। এ হলাহল পান করার মতো নীলকণ্ঠ হতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। তাঁদের বদলে পান করবে কে? আমি তো অক্ষম।"

"ওকে স্বপন," তালুকদার বলেন, "তুমি তো ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী তিনটি দেশেই দীর্ঘকাল বাস করেছ। তুমি কি লক্ষ করনি যে ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্টদের একাধিপত্য, ফ্রান্সে ক্যাথলিকদের একাধিপত্য, জার্মানীতে এ সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই জার্মানী এক নয়, দুই? তার অপরভাগের নাম অস্ট্রিয়া। জার্মান একীকরণের জন্যে অস্ট্রিয়া থেকে এসেছেন হিটলার, তিনি জোর করে দুই রাষ্ট্রকে এক করেছেন, কিন্তু প্রটেস্টাণ্ট বা ক্যাথলিক কোনো এক সম্প্রদায়কে একাধিপত্যের সুযোগ দেননি। দুই সম্প্রদায়ই সমান সমান বলে দুইপক্ষের জোড়াতালিও দেননি। তাঁর সমাধান হচ্ছে কেউ ক্যাথলিকও নয় কেউ প্রটেস্টাণ্টও নয়, এমন কি খ্রীস্টানও নয়। সকলেই আর্য আর টিউটন। যাদের প্রাচীন উপকথা অবলম্বন করে ভাগনার তাঁর অপেরা পর্যায় রচনা করেছেন। ধর্মের নামে জার্মানরা কি কম লড়াই করেছে? তাতে কোনো সম্প্রদায়েরই জয় হয়নি। হয়েছে জার্মান জাতির বিভাজন ও বলক্ষয়। অত বড়ো গুণবান জাতি কি আর আছে? আত্মকলহের ফলে ওরাই ইংরেজ ফরাসীর তুলনায় বলহীন। জার্মানদের দিকে তাকাও। তা হলে বাঙালীদের

আত্মকলহের অর্থ খুঁজে পাবে। এর অর্থ হিন্দু মুসলমান ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট সমান সমান। কেউ কারো একাধিপত্য সহ্য করবে না। ফিফটি ফিফটি মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলে গভর্নর হবেন কাদের লোক ? প্রধানমন্ত্রী হবে কাদের লোক ? দ্বিমত হলে সালিশী করবেন কে ? সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কেমন করে ? এক পক্ষ সরকার চালাবেন, অপর পক্ষ অপোজিশনে থাকবেন, এটা কি পালা করে হওয়া সম্ভব ? চাই মিশ্র দল। তাও যথেষ্ট নয়। চাই হিন্দু মুসলিম বিভেদের উর্ধ্বে উঠে প্রাচীন বাঙালীত্বের উদ্বোধন। চাই একজন ভাগনার। যিনি পুরাতনকে নতুন রূপ দেবেন।"

"এর পরে তুমি বলবে, চাই একজন হিটলার" উপহাস করেন বর্মণ।

"হিটলার! হিটলার কি বাংলার হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে সেইখানেই থাকবেন! বৃহত্তর বঙ্গের দাবীতে আসাম আক্রমণ করবেন না, বিহার আক্রমণ করবেন না? আর ভাগনার? ভাগনার কি লাউসেনকে নিয়ে, ময়নামতীকে নিয়ে গীতিনাট্য রচনা করতে পারবেন?" বিশ্বাস হয় না রাহার।

"ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?" বাবলী বৌদির দিকে তাকায়।

"কেন, ভয় কিসের? আমরা কেউ পুলিশে রিপোর্ট করব না।" তিনি আর-সকলের হয়ে অভয় দেন ওকে।

"হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, শতকরা আশিজন বাঙালী হচ্ছে চাষী আর মজুর। একজন বাঙালী হিটলার এদের কতটুকু উপকার করতে পারে? উপকার যা করবার ওই বিশজন বাঙালীরই করবে। কয়েকটা ভেল্কি আর ভোজবাজি দেখিয়ে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার পর হঠাৎ একদিন জামশেদপুর চড়াও হবে। কারণ তার কয়লার ঘাটতি। তার পরে আরেকদিন আসাম আক্রমণ করবে। কারণ তার পেট্রল না হলে চলবে না। এসব জায়গায় বাঙালী আছে। সেটাই হবে তার অজুহাত। কিন্তু শতকরা আশিজনকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে কদ্দিন! শত্রুর হাতে যদি পরাজিত না হয় তো বিপ্লবীদের হাতেই নিপাত যাবে। জেলে বসেই আমি হিটলারের প্রশংসা শুনেছি। বেরিয়ে এসে যা শুনছি তা কেবল প্রশংসা নয়। তা জয়ধ্বনি। এখন আমি যদি বলি, বাঙালীর যাঁকে প্রয়োজন তিনি একজন হিটলার নন, তিনি একজন স্টালিন, তা হলে আমি একঘরে হব।" বাবলী ভয়ে ভয়ে বলে।

"আরে, না, না। একঘরে কেন? তোমাদের দলটিও কম ভারী নয়। দলের অধিকাংশই বুর্জোয়া। কিন্তু হিটলারের যেমন ভাগনার স্টালিনের তেমন কে? এ তো বড়ো রঙ্গ, বোন, এ তো বড়ো রঙ্গ। নাম যদি বলতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।" স্বপনদা বৌদির দিকে আড়চোখে তাকান। দু'জনেরই গাল লাল হয়ে ওঠে।

"আমার অত বিদ্যে নেই, স্বপনদা।" বাবলী কবুল করে। "স্টালিনের সঙ্গীত প্রীতির কথা কোথাও পড়িনি। জারের আমলের সঙ্গীতের উপরে বিপ্লবীদের স্বাভাবিক বিরাগ। ব্যালের খাতিরে যেটুকু সহ্য করতে হয় সেটুকুই করে। ব্যালে ওদের সবার প্রিয়। তোমার প্রশ্নের জবাব বোধহয় চাইকোভেস্কির 'সোয়ান লেক।' না, বৌদি?"

"কী জানি, বাপু। তোমরা ভাইবোনে কে কার সঙ্গে যাবে আমি কী করে জানব? আমি আর আমার এল্‌ফ। এই জেনেছি সার।" এল্‌ফ তাঁর পায়ের কাছে।

"চকোলেট, তুমি বলতে পারলে না। হিটলারের যেমন ভাগনার স্টালিনের তেমন কেউ থাকলে তো? ওটা একটা কালচারাল গ্যাপ। বিপ্লবও ওটা পূরণ করেনি।" স্বপনদা বৌদির মুখরক্ষা করেন।

"কালচারাল গ্যাপ!" বাবলী গ্রাহ্য না করে বলে "সেটা এমন কী জরুরি? বিপ্লব যে তার জন্যে আটকায় না এটা তো রাশিয়ার বেলা প্রত্যক্ষ। ভাগনারের মতো কেউ ছিলেন না, কিন্তু পুশকিন ছিলেন, টুর্গেনিভ ছিলেন গোর্কি ছিলেন। সেইজন্যেই তো আমরা তোমার কাছে এসেছিলুম। তুমি গ্যাপ পূরণ করতে স্বপনদা।"

"আমি!" স্বপনদা নিঃস্পৃহভাবে বলেন, "জন্ম রোমান্টিক। আমার কাছে তোমরা আশা করো বিপ্লবের রোমান্টিক চিত্র। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে রোমান্টিসিজম যদি বা কিছু ছিল রুশবিপ্লবের আগাগোড়া রোমান্টিকতাবর্জিত। বিপ্লববাদীদের মধ্যে রোমান্টিক যাঁরা ছিলেল তাঁরা হয় আত্মহত্যা করেছেন, নয় কোতল হয়েছেন, নয় মৌন ব্রত নিয়েছেন, নয় পালিয়ে বেঁচেছেন। মানুষের জীবনে কেবল রিয়ালিজম থাকবে, তাও শুধু সোশিয়াল রিয়ালিজম, এ যেন একপ্রকার ইসলামী ফতোয়া। যার ফলে আরবী সাহিত্য হয়েছে আরব মরুভূমির মতো আরেক মরুভূমি। এখানে ওখানে দুটো একটা ওয়েসিস যে নেই তা নয়, কিন্তু মরক্কো থেকে বাগদাদ

পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড রসের অভাবে খাঁ খাঁ করছে। অথচ ইসলামের মতো বৈপ্লবিক ধর্ম আর কোথায় !"

বাবলী একেবারে চুপ। তালুকদার বলেন, "অর্ধেক বাঙালী বৈপ্লবিক ধর্ম ইসলাম মেনে নিয়েছে। বাকী অর্ধেকও বৈপ্লবিক মতবাদ কমিউনিজম বরণ করবে, ইংরেজ যদি দেশছাড়া হয়। আর কংগ্রেস যদি গদী না পায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিও হবে আরেক মরুভূমি। আমাদের হাতে খুব বেশী সময়ও নেই, স্বপনমোহন। এই যুদ্ধে রাশিয়া যদি জেতে কমিউ-নিজমও দিকে দিকে ছড়াবে। অর্ধেক বাঙালী কমিউনিস্ট বনে গেলে আশ্চর্য হবার কী আছে। আগে যেমন মুসলমান বনে গেল। এটা তো একদা বৌদ্ধদের দেশ ছিল। বৌদ্ধরা আজ ক'জন !"

"তোমার ওটা বাড়াবাড়ি !" রাহা প্রতিবাদ করেন। "অর্ধেক মুসলমান হতে সাতশো বছর লেগেছে। অর্ধেক কমিউনিস্ট হতে তার চেয়ে কম সময় লাগবে না। যদি না বলপ্রয়োগ হয়। বলপ্রয়োগ হলে সেটা একতরফা থাকবে না, জেনে রেখো। আমরা গৃহযুদ্ধ এড়াতেই চাই। কিন্তু এঁরা যদি গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেন তবে আমরাও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়ব না। তার মানে আমাদের প্রাইভেট প্রপার্টি।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাদা, ব্যাপার ততদূর গড়াবে না। মালিকরা পা দিয়ে ভোট দেবেন। গ্রামকে গ্রাম খালি হয়ে যাবে।" বাবলীর মুখে হাসি।

"কিন্তু শহর ! শহর তো আমাদেরই শক্ত ঘাঁটি।" রাহা তর্ক করেন।

"সেকথা ঠিক। শহরের বেলা অন্য স্ট্রাটেজি।" বাবলী সেটা ফাঁস করে না।

"ওই শহরগুলোই হবে এদেশের ওয়েসিস। যদি টিকে থাকে।" স্বপনদা বলেন।

"কিন্তু কথা হচ্ছিল কালচারাল গ্যাপ সম্বন্ধে।" তালুকদার খেই ধরিয়ে দেন। "বিপ্লব মানেই তো একটা ক্লীন ব্রেক। একটা পরিষ্কার ছেদ। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। পূর্বতনের সঙ্গে অধুনাতনের। জীবনের অন্যান্য বিভাগে যদি ছেদ পড়ে তো সংস্কৃতিই কি হবে একমাত্র ব্যতিক্রম ? কালচারাল গ্যাপ অনিবার্য। নয়তো ওটা বিপ্লবই নয়। রেভোলিউশন নয়, রিফর্ম। স্বপন, তুমি একজন রিফর্মিস্টের মতো কথা বলছ। মিস্ সেন তোমার ফাঁদে পা দেবেন কেন ? তিনি যে একজন রেভোলিউশনিস্ট।"

স্বপনদা হেসে বলেন, "আমি হচ্ছি কচ্ছপ আর আমার এই বোনটি হচ্ছে খরগোস। ওর ধারণা ও আমার আগে লক্ষ্যস্থলে পৌছবে। ও তো জানে না যে পরিবর্তনেরও একটা অন্তর্নিহিত নিয়ম আছে। যে দেশ বা জাতি যত পুরাতন সে দেশ বা জাতি তত ধীরে ধীরে বদলায়। রাশিয়া কি পাঁচ হাজার বছরের পুরানো দেশ? রাশিয়ানরা কি পাঁচহাজার বছরের পুরানো জাতি? ওরা তো এগিয়ে যাবেই। কিন্তু আমরাও যে চিরকাল পেছনে পড়ে থাকব তা নয়। আমরাও ওদের ধরে ফেলব ও ছাড়িয়ে যাব। কী, বোন? তোমার বিশ্বাস হয় না? দেখবে কার কথা ফলে।"

"তোমরা বুর্জোয়ারা কচ্ছপের মতোই মন্থর। কিন্তু ওই রেটে এগোলে তোমরা কোনো কালেই লক্ষ্যস্থলে পৌছবে না, স্বপনদা। এ যুগটা তোমাদের যুগ নয়। তোমাদের যুগ ছিল মার্কসপূর্ব দুই তিন শতাব্দী। এখন এটা মার্কসোত্তর শতাব্দী। ইতিহাস তোমাদের মহাপ্রস্থানের দিন ধার্য করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য যেদিন অস্ত যাবে সেদিন তোমাদের উপরেও অন্ধকার নেমে আসবে। অ্যারিস্টোক্রাসী, ব্যারিস্টোক্রাসী প্লুটোক্রাসী সব একধার থেকে ফৌত হবে।" বাবলীর মুখে চোখে হাসি।

'দ্যাখ, চকোলেট।" স্বপনদা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, "আমরা এদেশের বুর্জোয়ারা এদেশে ন্যাশানালিজম আর ডেমোক্রাসী এই দুই মহাতত্ত্বের প্রবক্তা। আমরা না থাকলে এদেশে এসব তত্ত্ব কোনোদিন গজিয়ে উঠত না। আরো একটি মহাতত্ত্ব সোশিয়াল জাস্‌টিস। এতেও আমাদের অনীহা নেই। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ আমাদের কিছু কিছু প্রপার্টি আছে। তার মায়া কাটানো মুখের কথা নয়। আমরা যদি তোমাদের মতো সর্বহারা হতে না চাই তবে সেটা আমাদের অপরাধ নয়। প্রাইভেট প্রপার্টি মাত্রেই শোষণলব্ধ নয়। আমার বাবা প্রাণপণ পরিশ্রমে যা অর্জন করে গেছেন তা পারিশ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে। আর আমিও কি কম পরিশ্রম করি?"

বাবলী একটু ভেবে নিয়ে বলে, "তোমাদের পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে, স্বপনদা। তোমাদের আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব করব না। কেমন ব্যবহার তোমরা পাবে সেটা নির্ভর করবে কেমন ব্যবহার তোমরা করবে তারই উপরে। তোমরা যদি শত্রুতা করো তবে আমরাও শত্রুতা করব। তোমরা যদি মিত্রতা করো তবে আমরাও মিত্রতা করব। প্রাইভেট প্রপার্টির বৈধতা স্বীকার না করলেও আমরা আমাদের মিত্রদের প্রাইভেট প্রপার্টি বেদখল করব না, বাজেয়াপ্ত করব

না। তবে তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্মগত অধিকার অবাধ হবে না। জন্মস্বত্ব বলে কারো কিছু থাকবে না। যেটা থাকবে সেটা কর্মগত অধিকার সবাইকে কাজ দেওয়া হবে। সবাইকে খোরপোস দেওয়া হবে। উন্নতির সোপানও খোলা থাকবে। যারা কাজের লোক হবে তারা উচ্চতর সোপানে উঠবে।"

"আমি তো শুনেছিলুম যোগ্যতা অনুসারে নয়, প্রয়োজন অনুসারেই যে যা পাবে। যে দশ টাকা মজুরির যোগ্য নয় সে বিশ টাকার ভোগ্য উপকরণ দাবী করতে পারবে। যেহেতু তার কাচ্চাবাচ্চা বেশী।" তালুকদার হাসেন।

"কাচ্চাবাচ্চার ভার রাষ্ট্র নেবে। রাষ্ট্র যদি বলে তাদের সংখ্যা কমাও তবে সে নির্দেশ মান্য করতে হবে। প্রয়োজন যদি অপদার্থতার পোষক হয় তবে সেটা গ্রাহ্য হতে পারে না।" বাবলী ব্যাখ্যা করে।

তালুকদার গম্ভীরভাবে বলেন, "দেখুন, মিস সেন, আপনাদের সব চেয়ে প্রবল বাধা আসবে বুর্জোয়াদের দিক থেকে নয়। কৃষকদের দিক থেকেই। প্রাইভেট প্রপার্টি ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। আর কাচ্চাবাচ্চা তো ওদের অগুন্‌তি। কাচ্চাবাচ্চার ভার ওরা রাষ্ট্রের জিম্মায় সঁপে দেবে না। গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে এই দুটি ইস্যুতেই। সম্পত্তি আর সন্তান।"

বাবলী না থাকলে আলাপ আলোচনা সংস্কৃতিকে ঘিরেই চলত। তা নয়, বার বার কক্ষচ্যুত হচ্ছে। দীপিকা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন লক্ষ করে স্বপনদা মোড় ঘুরিয়ে দেন।

"নতুন রেকর্ড আর আসছে না কিছুদিন থেকে।" স্বপনদা বলেন, "তাই পুরানো রেকর্ড বাজিয়ে সঙ্গীতের তৃষ্ণা মেটাতে হচ্ছে। চকোলেট কী মনে করবে, জানিনে। আমার তো ইচ্ছে করছে ভাগনারের 'মাইস্টারসিঙ্গার' বাজিয়ে শুনতে ও শোনাতে। সেকালে আমাদের দেশের মতো জার্মানীতেও কবির দল ছিল। সেইরকম একটি দলের মূল গায়েন এক মুচি। নাম হান্‌স সাক্‌স। ভাগনার তাই নিয়ে একটি অপেরা লেখেন, অপেরাটি এখনো জনপ্রিয়। মিউনিকে মানস আর আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।"

মানসের উল্লেখ শুনে বাবলী জানতে চায়, "মানসদা এখন কোথায়? আর তাঁর বন্ধু সৌম্যদা?"

"মানস চাকরি ছাড়বে কি ছাড়বে না তাই নিয়ে হ্যামলেটের মতো

দোনোমনো করছিল। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে সব দিক বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে চাকরির বিকল্প বেকারি। অগত্যা চাকরিতেই ফিরে গেছে। কলকাতার পশ্চিমের এক জেলায়। কিন্তু যেখানেই যাক ওর সেই একই ভাবনা। সেবার ছিল পোলাণ্ডকে নিয়ে, তারপর ফ্রান্সকে নিয়ে, তারপর ব্রিটেনকে নিয়ে, অবশেষে রাশিয়াকে নিয়ে। ও কি নীরব সাক্ষী হবে, না যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্য হিটলারের বিপক্ষে। কিন্তু ওকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিচ্ছে কে? বড়লাট তো সিভিল অফিসারদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কাউকেই যুদ্ধে যেতে দেওয়া হবে না। ইংরেজদেরও না। মানস ন যযৌ ন তস্থৌ। আর তার বন্ধু সৌম্য? সেও তো ছটফট করছিল ব্যক্তি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে। কিন্তু গান্ধীজী ওকে মনোনয়ন দেননি। অযোগ্য বলে নয়, অন্য কারণে। গঠনকর্মে যারা নিযুক্ত তারা যেন সিভিল অফিসার। তাদের থাকতে হবে স্বস্থানে। সত্যাগ্রহ তো একপ্রকার যুদ্ধ। নৈতিক যুদ্ধ। তাতে যারা অংশ নেবে তাদের যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। অর্থাৎ কারাগারে। সৌম্য যদি জেলে যায় তবে গঠনকর্ম পরিচালনা করবে কে? সেটাও কি কম আবশ্যক? মাঝে মাঝে কলকাতা এলে দেখা করে যায়। কিন্তু ওর আশ্রম ওই পদ্মাপারে। ওর দাড়ি এখন আরো বর্ধিষ্ণু হয়েছে।" স্বপনদা মুচকি হাসেন।

"মুসলমান বলে ভুল হয়।" বাবলী মুখ টিপে হাসে।

"হ্যাঁ, হিন্দু মুসলিম একতার ওটাও পূর্বশর্ত।" স্বপনদা পরিহাস করেন।

"যতই যাই করো ভবী ভুলবে না।" তালুকদার মন্তব্য করেন। মুসলমান ভুলবে না যে সে একদিন এদেশের বাদশা ছিল। আবার হবে, যদি চাকা ঘুরে যায়। তখন কোথায় তোমার স্বরাজ আর কোথায় তোমার বিপ্লব।'

স্বপনদা উঠে গিয়ে গ্রামোফোনে ভাগনারের রেকর্ড চাপিয়ে দেন। আর সবাইকে বলেন, "এখন মন দিয়ে শোন।"

এল্‌ফ তা শুনে ঘেউ ঘেউ করে আপত্তি জানায়। দীপিকা তাকে কোলে করে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যান ও দরজা বন্ধ করে ফিরে আসেন। সেও আস্তে আস্তে চুপ করে।

কিন্তু বাবলীকে ধরে রাখা যায় না। হিটলারের প্রিয় ভাগনার। অতএব বাবলীর অপ্রিয়। স্বপনদা যতই বোঝান ও মেয়ে অবুঝ। তখন বলেন, "আরেকদিন এসো, শালিয়াপিনের ভল্‌গা বোটম্যান শোনাব।"

## ॥ চার ॥

মনীষীদের কারো কারো মতে রুশবিপ্লব কবে ফুরিয়ে গেছে, এখন যেটা চলছে সেটা বিপ্লবের পরবর্তী নেপোলিয়নীর পর্যায়। নেপোলিয়ন পরাস্ত হলে বুরবঁরা ফিরে আসবেন। তার মানে আবার রোমানোভ বংশের আমল। কেউ বিশ্বাস করেন না যে রোমানোভরা গণতন্ত্র প্রবর্তন করে প্রজাদের হাতেই শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবেন।

"এই মনীষীরা ধরে নিয়েছেন যে স্টালিনই একালের নেপোলিয়ন। এটা কিন্তু ঠিক নয়।" মানস বলে তার জেলার সিভিল সার্জন ডাক্তার ঘটককে।

"আমার মেয়ে ঝরনাও তো তাই মনে করে।" ডাক্তার ঘটক বলেন।

"আচ্ছা, তা হলে ঝরনাকে মনে করিয়ে দেবেন যে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের তারিখ ছিল ২৩শে জুন। আর হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের দিন ২২শে জুন। প্রায় কাঁটার কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। নেপোলিয়নের দুই দিকে ছিল দুই মহাকণ্টক। তাদের নির্মূল না করে তিনি নিষ্কণ্টক হতে পারছিলেন না। কিন্তু ব্রিটেনকে আক্রমণ করতে গিয়ে দেখেন নৌবল নেই। যতদিন না নৌবল গড়ে ওঠে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে স্থলসৈন্য দিয়ে রাশিয়াকে হারিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রাশিয়ার পরে ব্রিটেন। গত শতাব্দীতে নেপোলিয়নের সেই যে সিদ্ধান্ত এই শতাব্দীতে হিটলারের সিদ্ধান্তও তাই। হিটলার যদি নেপোলিয়নের মতো নিষ্কণ্টক হতে চান তবে তাঁকেও প্রথমে রাশিয়াকে ও পরে ব্রিটেনকে হারিয়ে দিতে হবে। ব্রিটেন সেটা বোঝে। সেইজন্যে রাশিয়াকে মদত দিয়ে জোরদার করছে। রাশিয়া যে কমিউনিস্ট আর ব্রিটেন যে ক্যাপিটালিস্ট এ গণনা আপাতত শিকেয় তোলা রয়েছে। ইউরোপের কন্টিনেন্ট যাঁর একচ্ছত্র শাসনাধীন তিনিই নেপোলিয়ন। যেমন সেকালে তেমনি একালে। তিনি কে? তিনি হিটলার? ভবিষ্যতে যদি ইউরোপের কন্টিনেন্ট স্টালিনের একচ্ছত্র শাসনাধীন হয় তবে স্টালিনই হবেন নেপোলিয়ন। কিন্তু তখন ব্রিটেন হবে তার প্রধান অন্তরায়। আমেরিকাও ব্রিটেনের পেছনে দাঁড়াবে। তখন ক্যাপিটালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট মতবাদের সংঘাত। সন্ধিও হতে পারে।" মানস অনুমান করে।

এর পর ডাক্তার সাহেব চলে যান তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গে। "ঝরনাকে নিয়ে আমরা কী মুশকিলেই না পড়েছি, মিস্টার মল্লিক! ওর বিয়ের বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু ম্যাচ করে যদি বিয়ে দিতে যাই তবে ওর বর হবে হাজার টাকা মাইনের চাকুরে। তার কম হলে ও বিয়ে করবে না। যদি করে প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে। কিবা হাড়ি কিবা ডোম।"

মানস হেসে বলে, "ঝরনার মতো গুণবতী কন্যার প্রার্থীর অভাব হবে না। আর তাঁর বয়স এমন কী হয়েছে যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"

"না, না, মিস্টার মল্লিক, ব্যাপার অত সহজ নয়। আমরা ওকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে দিইনি। আমরা কো-এডুকেশনকে ভয় করি। কিসে থেকে কী হয় কে বলতে পারে! প্রেমের নামে কত মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছে। আমরা চিরকাল ঘটকালি করেই বিয়ে দিয়ে এসেছি। সেটাই ছিল আমাদের পেশা। মেয়ে এখন বায়না ধরেছে যুদ্ধে যাবে। উইমেন্স অক্জি-লারি কোরে যোগ দিয়ে ওয়াকি হবে।" ডাক্তারের চোখে মুখে ত্রাস।

"ভালোই তো। মন্দ কী?" মানস উৎসাহের সঙ্গে বলে, "যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা কত বড়ো একটা সৌভাগ্য! একভাবে না একভাবে অংশ নেওয়া কত বড়ো একটা সুযোগ! আপনি ডাক্তার, আপনারই তো কর্তব্য অ্যাকটিভ সার্ভিসে নাম লেখানো। ফিরে এলে হতেন ক্যাপটেন ঘটক। ঝরনা যদি যান ওঁকেও হয়তো ক্যাপটেন র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে। বিয়েও হয়ে যেতে পারে কোনো এক অফিসারের সঙ্গে।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, "গতবারের যুদ্ধটা শেষ হয়ে না গেলে আমাকেও ফ্রন্টে যেতে হতো, মল্লিক সাহেব। ফ্রন্টে যাইনি, ক্যান্টনমেন্টে কাজ করেছি। তার আশে পাশে থাকে লালবাজার। লাল-বাজারে কী বিক্রী হয়, জানেন? নারীদেহ। যুদ্ধে যারা প্রাণ দিতে যায় তাদের সঙ্গদানের জন্যে নারীরও প্রয়োজন হয়। কোন্ ভদ্রঘরের মেয়ে যেতে রাজী হবে? যায় ওই লালবাজারের পণ্যরাই। প্রচুর অর্থ পায়। মিলিটারি বাজেটে ওটাকে দেখানো হয় এনটারটেনমেণ্ট কস্ট হিসাবে। এবারকার যুদ্ধের নূতনত্ব হচ্ছে অফিসারদের বিনোদনের জন্যে সমান ঘরের ওয়াকি প্রবর্তন। ক্লাবে গিয়ে তাস খেলা, টেনিস খেলা, গ্রামোফোন বাজানো, হাত ধরাধরি করে নাচা, একসঙ্গে বসে ডিনার খাওয়া। এইসব আর কী! তফাতের মধ্যে ক্লাবের বদলে মেস। কলকাতায় বেশ সাড়া পাওয়া গেছে।

ধনীকন্যারাও অগ্রণী হয়েছেন। গভর্নমেণ্ট সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছেন। কিন্তু আগুন আর ঘি একসঙ্গে রাখলে যা হবার তা হবেই। নজর রাখবে কে? বিয়ে যাদের হবে তারা কলঙ্ক এড়াবে, কিন্তু তাদেরও তো বৈধব্যের ভয় থাকবে।"

ভাবনার কথা বইকি। মানস শুধু বলে, "হুঁ।"

"ঝরনার মা এখন শয্যা নিয়েছেন। মিসেস মল্লিক যদি একবার দেখতে যান তো বড়ো উপকার হয়। সব চেয়ে ভালো হতো যদি মেয়েকে রাতারাতি পাত্রস্থ করতে পারতুম। চেষ্টা যে করছিনে তা নয়। কিন্তু ওই হাজার টাকা মাইনের লক্ষ্য ভেদ করবে কে? আমার নিজেরই মাইনে তার চেয়ে অনেক কম। এতদিন চাকরি করেও আই. এম এস. হতে পারলুম না। আই. এম. এসের বদলে আই. এম. ডি। যেন আমের বদলে আমড়া।" ডাক্তার সাহেব কাষ্ঠহাসি হাসেন।

"আই. এম. এস হতে চান তো এখনি তার মওকা। যুদ্ধে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা আই. এম. এস. হয়ে ফিরবেন।" মানস আশা দেয়।

"ক্ষেপেছেন। কোথায় পাঠাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো লিবিয়ায় কি সাইরেনাইকায়। এবাব টার্কদের খপ্পরে নয়, জার্মানদের খপ্পরে। বাপ রে বাপ, রমেল! রমেলের সঙ্গে লড়তে পারে তেমন ইংরেজ কে আছে! ঈজিপ্ট গেল বলে ধরে নিন। ইংরেজ জেতে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার ঘটক কানে কানে বলেন।

"দেখুন, ডাক্তার সাহেব, ইংরেজদের সী পাওয়ার আছে। সী পাওয়ার থাকতে কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারবে না। ওরা সাময়িকভাবে হটে আসবে। যেমন ডানকার্কে। কিন্তু অপসরণ তো পরাজয় বরণ নয়। আপনি হয়তো কিছুদিনের জন্যে বন্দী হবেন। কিন্তু পরে সেটাই হবে আপনার প্রমোশনের সোপান। এখনো সময় আছে।" মানস উৎসাহ দেয়।

"তাতে আমার পারিবারিক সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না, মল্লিক সাহেব। ঝরনা জেদ ধরেছে ওয়াকী হবেই। তাতে আর কিছু না হোক অফিসার র‍্যাঙ্ক ও র‍্যাঙ্কের উপযোগী মাইনেও তো হবে। আমার নিজের মাইনের চেয়ে কম নয়। একটা মফঃস্বল শহরে ভেরেণ্ডা ভাজার চেয়ে মিলি-টারি ক্যাম্পে দহরম মহরম করাও ভালো। চরিত্র যে সকলের নষ্ট হয় তা নয়। ও নিজের ইজ্জৎ নিজে রখেতে জানে। বরাবরই সাহসী মেয়ে।

ঘোড়ায় চড়ত কম বয়সে। আমাদের তো পুত্রসন্তান নেই! দুই মেয়ের পর ওই আমাদের ছেলে। কিন্তু তা বলে তো ওকে ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়তে দিতে পারিনে। ওর মা ওকে চোখে চোখে রেখেছেন।' ডাক্তার সাহেব বলেন।

"তা যদি বলেন, আজকাল ছেলেদের কলেজে মেয়েদের যাওয়া তো নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রতিবেশী রিটায়ার্ড জজ রায় বাহাদুর সুবোধকুমার ভদ্র তো তাঁর মেয়ে শীলাকে ছেলেদের কলেজে পাঠাচ্ছেন।" মানস দৃষ্টান্ত দেখায়।

"আপনি বোধহয় জানেন না যে শীলার বিয়ে ঠিক হয়েই রয়েছে। ছেলেটি পুলিশ ট্রেনিং কলেজ থেকে ফিরলেই শুভকর্ম সারা হবে। স্টার্টিং পে আড়াইশো। ঝরনা হলে পত্রপাঠ খারিজ করত।" ডাক্তার সাহেব একটু পরে জুড়ে দেন, "যদি না প্রেমে পড়ে বিয়ে সম্ভব হতো।"

' ঝরনার চোখে প্রেমের মূল্য বিত্তের চেয়ে চারগুণ বেশী। এখন এদেশের যুবকদের চোখে ঝরনার প্রেমের মূল্য কয়গুণ বেশী কী করে বোঝা যাবে? আপনাদের উচিত ওকে যুবকদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া। এই মফঃস্বল শহরে সেটার সুযোগ কোথায়? দিন না ওকে বাইরে যেতে।" মানস আবেদন করে।

"তা হলে ওর মা মনের দুঃখে মারা যাবে। আর বাবা চাকরি ছেড়ে বৈরাগী হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ বাঙালীর সমাজে অধঃপতন ডেকে আনছে। শুনছি ওয়াকির জন্যে ভদ্রঘরের কন্যাদের আগ্রহ ভেকেন্সীর চাইতেও বেশী। যাদের ধনসম্পদের অভাব নেই তাদেরও। যুদ্ধক্ষেত্র যেন একটা রোমান্সের কেলিকানন। সোসাইটি গার্লদের প্রত্যেকের ধারণা একজন কর্নেল বা মেজরের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। অবশ্য প্রাণে বেঁচে ঘরে ফিরে এলে। এদের চেয়ে কত ভালো সেইসব যুদ্ধবিরোধী মেয়েরা যাদের স্লোগান হলো 'না একো রুপেয়া, না একো জওয়ান।" কেন যে ওদের ধরে ধরে জেলে দেওয়া! জেলখানায় গিয়ে অমন কত মেয়ে দেখলুম।" ডাক্তার সাহেব আক্ষেপ করেন।

"কিন্তু ওদের মধ্যেও তো নাৎসীদের রুশ আক্রমণের পর দু' মত দেখা যাচ্ছে। কলকাতা থেকে আমার বন্ধু স্বপনদা লিখেছেন বাবলী সেন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখন যুদ্ধের পক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।" মানস জানায়।

"কিন্তু বাবলী সেন ঝরনা ঘটকের মতো এত বোকা মেয়ে নয় যে ওয়াকি

হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। অবশ্য সরকারও ওকে বিশ্বাস করে যুদ্ধে যেতে দেবে না। দেশীয় জওয়ানদেরকে ও হয়তো ইংরেজের বিরুদ্ধেই হাতিয়ার বাগাতে ভজাবে। আর-একজন জোন অফ আর্ক।" ঘটকের উপহাস।

"কিন্তু ও যে রাশিয়ার বন্ধু কমিউনিস্ট।" মানস বিস্মিত হয়।

"আমরা তো জানি ও বর্ণচোরা ন্যাশনালিস্ট।" ঘটক মুচকি হাসেন। "পুলিশের লোক ওকে চোখে চোখে রেখেছে।"

"সব কমিউনিস্ট কি তাই ?" মানস সুধায়।

"আরে, না, না। সবাই কেন হবে ? ওই যারা আগে টেররিস্ট ছিল ওরা ওদের দীক্ষা ভুলে যায়নি। দীক্ষা কি কেউ ভোলে ? টেররিজম ছেড়েছে, কিন্তু ন্যাশনালিজম ছাড়েনি। তবে এটাও ঠিক যে ওরা এখন রাশিয়ার জয় চায়। সুতরাং ইংরেজের পরাজয় নয়।" ডাক্তার খোলসা করেন।

মানস এর পরে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, আপনি তো নানান জেলায় জেলখানার ভিতরে গেছেন। সেটা আপনার ডিউটির সামিল। বাবলীর বন্ধু মঞ্জুলিকা সোম বলে একটি মেয়েকে কি দেখেছেন ?"

"শুধু জেলখানায় কেন, বৈঠকখানায়ও দেখেছি। ওর বাবা ক্যাপটেন সিন্‌হা ছিলেন আমার সীনিয়র। আহা, অমন ভালো মানুষ আমি দেখিনি। কিন্তু মানুষ ভালো হলেই ডাক্তার ভালো হওয়া যায় না। আবার ডাক্তার ভালো হলে মানুষ ভালো হওয়াও নিশ্চিত নয়। যাক, জুলির কথা হচ্ছিল।" ঘটক স্মরণ করে বলেন, "ও হলো বিলেতফের্তা পরিবারের বিলেতফের্তা মেয়ে। ইংরেজদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একই কালে প্রেম-ঘৃণার সম্পর্ক। লাভ-হেট রিলেশনশিপ। সাহেব মেমদের ও যত বেশী ভালোবাসে তত বেশী ঘৃণা করে। সাইকোলজিকাল কেস।"

"এরকম কেস আপনি আর ক'টা দেখেছেন ?" জানতে কৌতূহল হয় মানুষের।

"শত শত। তার জন্যে বিলেত যেতে হয় না। ইংরেজী লেখাপড়া যারাই শিখেছে তারাই ইংরেজকে ভালোবেসেছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্য যেই দেখেছে অমনি ইংরেজকে ঘৃণা করেছে। প্রত্যেকটি সার্ভিসেই বর্ণবৈষম্য। আপনিও ভুক্ত-ভোগী, আমিও তাই। আপনার কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, প্রেম বা ঘৃণা কোনোটাই আমার হৃদয়ে এখন আর তেমন প্রবল

নয়। যেমন ছিল ত্রিশ বছর আগে। ইংরেজের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতুম। বাঙালী পলটনে যোগ দেবার জন্যে বাড়ী থেকে পালিয়েছি, পরে ধরা পড়ে ফিরেছি। বাবার চেয়ে মায়ের বেশী অমত। একই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে আমার মেয়ে ঝরনার বেলা। সেও কি বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে, পরে ধরা পড়ে ফিরবে? কী জানি! আমার তো ভালো মালুম হচ্ছে না।' ডাক্তারের মুখ আঁধার হয়ে আসে।

মানস অভয় দেয়! "না, না, মেয়েরা একা পালিয়ে যায় না। গেলে আর কারো সঙ্গে যায়। ঝরনার সঙ্গে আর কেউ থাকলে তো!"

"আপনি আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেন, মল্লিক সাহেব। আমি ভাবছি আর কে হতে পারে!" ঘটক বিদায় নেন।

ক্লাবটা শুধুমাত্র টেনিস খেলার জন্যে। সঙ্গে একটা লাইব্রেরী আছে, সেটা খুব মূল্যবান। সেখানে পাওয়া যায় এমন সব পুরানো ইংরেজী বই যা অন্যত্র দুর্লভ। যেমন গ্যেটের আত্মচরিত। টলস্টয়পত্নীর দিনলিপি। মানস নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। টেনিসের পরে লাইব্রেরীতে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা। সেদিন আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

"আজ এত দেরি হলো যে?" যূথিকা কৈফিয়ৎ চায়।

"সিভিল সার্জনের মেয়ে ঝরনা ওয়াকি হতে চায়। মা শয্যাশায়ী। বাপ চিন্তিত। এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল।" মানস জবাবদিহি করে।

সমস্ত শুনে যূথিকা বলে, "ঝরনা হচ্ছে এদেশের নিউ উওম্যান। শীলা তা নয়। শীলাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু ঝরনাকে শ্রদ্ধা করি। হাজার টাকার নীলামদর ও যদি দিয়ে থাকে তবে এটা ভালো বিয়ের জন্যে নয়, বিয়ে আদৌ নয়ের জন্যে। সোজা কথা মনের মানুষ না পেলে ও বিয়ে করবে না। আর মনের মানুষ তো চাইলেই মেলে না। অকস্মাৎ মিলে যেতেও পারে, যেমন মিলির বেলা। নয়তো অনন্তকাল প্রতীক্ষা করতে হয় শবরীর মতো।"

মিলির প্রসঙ্গ ওঠে। "দত্তবিশ্বাস কি মিলির মনের মানুষ? হা হা হা!" মানস হেসে উড়িয়ে দেয়।" এসেছিল জুলিকে বিয়ে করতে। জুলি প্রত্যাখ্যান করে। তখন মিলিকে হাতের কাছে পেয়ে প্রস্তাব জানায়। মিলি সম্মতি দেয়।"

"কে জানে, ঝরনার জীবনেও ঘটনাচক্রের ঘটকালি ঘটতে পারে। আর

না ঘটলেই বা কী ? যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সুযোগ পায় ক'জন মেয়ে ! তেমন একটা সুযোগ যদি আমার জীবনে আসত আমিও কি যেতে চাইতুম না ? বিয়ে করেছি, মা হয়েছি, এখন আমার হাত পা বাঁধা।" আফসোস করে যূথিকা।

"সেই হোমারের যুগ থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সুযোগ পাচ্ছে মেয়েরা।" মানস গম্ভীরভাবে বলে, "কিন্তু ইলিয়াড মহাকাব্যের শুরুতেই দেখতে পাবে আকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের নারীঘটিত বিবাদ। মেয়েরা ছিল যুদ্ধের প্রাইজ। একালের ওয়াকিদের নিয়েও যে এক অফিসারের সঙ্গে আরেক অফিসারের বিবাদ বাধবে না তা নয়। ঝরনাকে নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়তে পারে। এতদিন তো জানতুম গণিকাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হতো। এখন ওয়াকিদের কেন ?'

যূথিকা ফিক করে হেসে বলে, "সোভিয়েট রাশিয়ায় শুনছি প্রমীলা বাহিনী আছে। প্রমীলারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নাৎসী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধের প্রাইজ বলে বিবাদ বাধাবেন না তো ?"

"বলা যায় না। ওরাও তো নিউ উওম্যান। তবে স্টালিন শুনলে রক্ষে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে কোতল। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন হলে অন্য কথা ছিল। তিনি নিজেই হয়তো প্রমীলাদের প্রাইজ কেড়ে নিয়ে নিজের শোবার ঘর সাজাতেন।" মানস রুশদেশের ইতিহাস থেকে সম্রাজ্ঞীর প্রকৃতি বর্ণনা করে।

"রাশিয়া দেখছি সব ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে। স্টালিনের পরে একদিন হয়তো ডিকটেটর হবেন তেমনি জাঁদরেল এক মহিলা। পৃথিবীতে স্বর্ণযুগ আসবে। কিন্তু তার আগে যুদ্ধে জেতা চাই। লঙ্কার ওই প্রমীলা বাহিনী কি কিষ্কিন্ধ্যার বানরবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারবে ? আচমকা নাৎসী আক্রমণের পর থেকে ভাবছি সোভিয়েট সেনা কি ধাক্কা সামলাতে সক্ষম হবে ?" যূথিকা গালে হাত দেয়।

"সেই আশঙ্কায়ই তো ইংরেজরা ছুটে গেছে রাশিয়ানদের মদত দিতে। এখনকার মতো ওরা শত্রু নয়, মিত্র।" মানস বোঝাতে চায়।

"ইংরেজের মতো লাকি জাত কি আর আছে ? সেই যে একটা প্রবাদ আছে, ইংরেজরা লড়ে শেষ ফরাসীটি পর্যন্ত। এবার লড়বে শেষ রাশিয়ানটি পর্যন্ত। এতদিন লড়া হয়েছে শেষ ভারতীয়টি পর্যন্ত।" যূথিকা পরিহাস করে।

"হাসির কথা নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের মিটমাট হলে ভারতীয় সৈন্যরাও ছুটে যেত রাশিয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে লড়তে। মওলানা আজাদ তো বলে রেখেছেন তিনি দরকার দেখলে কন্‌স্ক্রিপশন করবেন। মানবভাগ্য নির্ভর করছে রুশজার্মান যুদ্ধের ফলাফলের উপরে। নাৎসীরা যদি জেতে তবে সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবে।" মানস এ নিয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তিত।

"কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হলে এমন ঘটতে পারে যে ক্যাপটেন কৃষ্ণকলি ঘটক তাঁর উইমেন্স অক্‌জিলিয়ারি কোর নিয়ে কৃষ্ণসাগর পারে অবতীর্ণ হবেন। সব লাল হো জায়েগা নয়, সব কালা হো জায়েগা।" যূথিকা রঙ্গ করে।

"কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি মিটমাট কোনোদিন হবার নয়, জুঁই। সবাই এটা এতদিনে সমঝে গেছে। মাঝে রয়েছে মুসলিম লীগ। তাকে ডিঙিয়ে মিটমাট করতে গেলে সে খাস বিলেতের টোরি পার্টির সব চেয়ে রক্ষণশীল সদস্যদের কাছে দরবার করবে। ওঁরা সায় না দিলে এই অচল অবস্থার অবসান হবার নয়। ওঁরা সায় দেবেনও না, যদি না মুসলিম লীগ সায় দেয়। আর মুসলিম লীগের যা শর্ত তাতে কংগ্রেস কোনোদিন রাজী হবে না।" মানস খেদোক্তি করে।

"তা হলে ক্যাপটেন কৃষ্ণকলি ঘটকের ওয়াকিরা কৃষ্ণসাগরপারে যাচ্ছেন না। কোথায় যাচ্ছেন বলতে পারো? পদ্মার ওপারে দেখেছি চট্টগ্রাম বা আরাকান অভিমুখে সৈন্য চালনা। ক্যাপটেন লাহা তো সিঙ্গাপুরের কথাও বলেছিলেন। ওয়াকিরা কি তা হলে বঙ্গোপসাগর পার হবে? সেটা এমন কিছু দূর নয় সিঙ্গাপুরে বিস্তর বাঙালী আছে। ঝরনার খবর আমরা তাঁদের কাছ থেকে পাব। প্রাণের ভয় নেই। ভয় যেটা সেটা ওই আকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের কাড়াকাড়ির। শুম্ভ নিশুম্ভতে মিলে তিলোত্তমাকে ওরা দু'টুকরো না করে। তবে সান্ত্বনা এই যে তিলোত্তমা এক্ষেত্রে একজন নয়, একদল।" যূথিকা হাসি চাপে।

"একবার মিসেস ঘটকের সঙ্গে দেখা করলে হতো না?" মানস বলে।

"নিশ্চয়। কিন্তু ঝরনার পক্ষ নেব।" যূথিকা উত্তর দেয়।

ঝরনা আর ওর মা দু'জনেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ। ঝরনা ওয়াকি হবে, নয়তো গৃহত্যাগ করবে। ওর মা ওকে ওয়াকি হতে দেবেন না। হলে দেহত্যাগ করবেন। ওয়াকিদের সম্বন্ধে যূথিকার ধারণা স্পষ্ট নয়। ওরা কি অফিসার-

দের মন জোগাতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবেই, ভালো থাকতে পারবে না ? তাই যদি হয়ে থাকে তবে তো মিসেস ঘটকের আপত্তির কারণ আছে। কী করে সে আপত্তি খণ্ডন করা যায় ? অথচ ঝরনাকেও আগে থেকে সন্দেহ করা অনুচিত। সে গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বেশী কথা বলে না। লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নিয়ে পড়ে। সীরিয়াস বিষয়ের বই। মাঝে মাঝে টেনিস খেলতে আসে। কব্‌জির জোর আছে। ওর রাজনৈতিক মতামত কাউকেই জানতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চায়, এর থেকে ধরে নেওয়া যায় না যে সে সাম্রাজ্যবাদী। বাঙালীদের একটা পুরানো নালিশ তাদের সৈন্যদলে নেওয়া হয় না, অসামরিক জাতি বলে অবজ্ঞা করা হয়। সেই অপবাদ ক্ষালনের জন্যেও বহু যুবক সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছে। তাই বলে কি তারা সাম্রাজ্যবাদী ? মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করছে তখন ওয়াকি দলে ভর্তি হওয়াও তো সমান অধিকারের পর্যায়েই পড়ে।

"মাসিমা," যুথিকা ডাক্তার গৃহিণীকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধে, "আপনি শয্যাশায়ী শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে এসেছি।"

"তোমরা সবাই ভালো আছো তো, মা ?" তিনি উঠে বসেন।

"আপনার আশীর্বাদে ও ডাক্তার সাহেবের সৌজন্যে।" যুথিকা ভদ্রতার খাতিরেই বলে। কল দেবার সময় দেয় দাশরথিবাবুকে। এই স্টেশনে আগে যেবার এসেছিল তখন থেকেই চেনাশোনা।

"আমি এখন মহাবিপদে পড়েছি। সবই আমার নিজের কর্মফল। আমার ছোট মেয়েকে আমি ষোল বছর বয়সেই পরের ঘরে দিতে পারতুম। পাত্র-পক্ষই ঝোলাঝুলি করছিল। আমি তখন অন্ধ। ঝরনা আমার কোলের মেয়ে। ও যদি পরের ঘরে যায় আমার কোল খালি হবে। তখন কি জানতুম যে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষছি ! যে আমাকেই দংশন করবে। আমার সর্বাঙ্গ এখন বিষের জ্বালায় জ্বলছে। কে আমাকে বাঁচাবে ! কেউ পারবে না। তুমিও না। এই শয্যাই আমার শেষ শয্যা। ডাক্তারের ডাক্তারি বাইরে। ঘরে কি ওঁর ক্ষমতা আছে ? ক্ষমতা থাকলে ওই সোমত্ত মেয়ের বিয়ে দিতেন না ? ধারকর্জ করে প্রোভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলে ও মেয়েকে যেমন করে হোক পাত্রস্থ করা চাই। মেয়েমানুষের প্রকৃত স্থান বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, ছেলের বাড়ী। তা তো নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। বলি, যুদ্ধক্ষেত্রে কি কেউ চিরকাল থাকে ? বছর দু'তিন বাদে ফিরে আসতে হবে না ? তখন কে ওকে

বিয়ে করবে ? চাকরিই বা জোগাবে কে ? সরকার কি তেমন কোনো ভরসা দিচ্ছে ? আর এরা যদি যুদ্ধে হেরে যায় তা হলে এদের দেওয়া ভরসার কি মূল্য আছে !" শেষের কথাগুলি তিনি ফিস ফিস করে বলেন।

ভদ্রমহিলা সত্যিই বিপন্ন। তবে শয্যাশায়ী বলে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ নন। দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ। শুয়ে শুয়েই তিনি ঘরসংসার চালান। তাঁর হাঁক ডাক শুনে ঝি চাকর ছুটে আসে। ফরমাস খাটে। যূথিকার জন্যে সন্দেশ ও সরবৎ এসে হাজির।

"নিজের সন্তানকে আপনি কালসাপ বলছেন, শুনে দুঃখ পেলুম, মাসিমা। এ সন্দেশ কি আমার গলা দিয়ে নামবে ? আপনি এত অসহিষ্ণু কেন ? আরো কত মেয়ে ওয়াকি হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মানে প্রাণ দিতে যাওয়া নয়। মেয়েদের যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে রাখা হবে। যেমন ডাক্তার ও নার্সদের। আর একালের মেয়েদের প্রকৃত স্থান কি কেবল রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর আর ঠাকুরঘর ? দিনকাল বদলে গেছে। মেয়েরা এখন জেলে যাচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে, আপিস করছে, মোটর চালাচ্ছে।" যূথিকা তর্ক করে।

মিসেস ঘটক চুপ করে থেকে বলেন, "আমারই নিজের কর্মফল। দুটি মেয়ে হওয়ার পর আমি আশা করেছিলুম তার পরেরটি হবে ছেলে। হলো আবার মেয়ে। তখন সেই মেয়েকেই ছেলের মতো করে মানুষ করি। হাফ প্যাণ্ট পরে ইস্কুলে যায়, দৌড়ঝাঁপ করে। খেলাধূলায় চ্যাম্পিয়ন। যেখানেই বদলী হন ওর বাবা ওকে টেনিস খেলার জন্য ক্লাবে নিয়ে যান। টেনিসে ওকে হারিয়ে দেয় কার সাধ্যি ? তোমাদের এখানে আসার আগে একজন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে একবছর ছিল। রোজ টেনিস খেলতে খেলতে ওদের দু'জনের মধ্যে এমন ভাব হয় যে আমরা তো ধরে নিই এইবার আসছে বিবাহের প্রস্তাব। ওমা, কোথায় প্রস্তাব ! ও ছেলে ধরাছোঁয়া দেবার নাম করে না। বিলেতে বহুকাল কাটিয়েছে। কত মেয়ের সঙ্গে টেনিস খেলেছে। ঝরনা নাকি ওর সেইরকম এক গার্ল ফ্রেণ্ড। শুনে আমার সর্বাঙ্গ শরীর রাগে রি রি করে। গার্ল ফ্রেণ্ড কী ! ছেলেতে মেয়েতে ফ্রেণ্ডশিপ হতে পারে কখনো ! তোমার বিলেতে কী হয় তা কি আমরা জানিনে ? খবরদার ! আমি বলি, খবরদার, ঝুনু, খবরদার, তুই ওই বাঁদরের সঙ্গে মিশিসনে। বাঁদরের গলায় মুক্তার হার ! সেই থেকে মেয়ের আমার মুখ ভার। ভালো করে কথা বলে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। টেনিসও যে নিয়মিত খেলতে

যায় তা নয়। কালেকটর সাহেবের মেম ওকে বার বার ডেকে পাঠান। উনিও টেনিসের ভক্ত। কিন্তু যাবে না। উনি তো ওর বয় ফ্রেণ্ড মনোজ বাগচী নন।"

"টেনিসে আমারও অনুরাগ ছিল, মাসিমা। কিন্তু কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গ দেওয়া তার চেয়েও জরুরি। আমরা নিজেদের কুঠিতেই ব্যাডমিণ্টন খেলি। আমরা মানে আমি আর আমার প্রতিবেশিনীরা। ঝরনাকেও নিমন্ত্রণ করেছি। ও একদিন কি দু'দিন গিয়ে আর ওমুখো হয়নি। ওর সমকক্ষ থাকলে তো যাবে। এখন বুঝতে পারছি ও চায় পুরুষ প্রতিপক্ষ। কিংবা পুরুষ পার্টনার। আমরা তো পুরুষদের খেলতে ডাকিনে। আমার স্বামীকেও না। এখন বোঝা যাচ্ছে ঝরনা কেন ধরাছোঁয়া দেয়নি। সত্যি, আপনাদের ভাবনার কারণ আছে। তা বলে অমন করে মেয়েটাকে পর করে দেবেন না। বিয়ের পরে তো এমনিতেই পর হয়ে যাবেই। যে দু'দিন বাপের বাড়ীতে আছে মা বাপের সঙ্গে মনের সুখে থাকুক। আপনি ওর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন, মাসিমা। ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে। ওয়াকি সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই, হ্যাঁ কি না কোনোটাই বলব না। কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে কতরকম চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে। একটা না একটা জুটে যেতে পারে। তবেতার জন্যে কলকাতায় কি দিল্লীতে যেতে হবে। মেয়েকে আপনারা চোখে চোখে রাখতে পারবেন না। সে কার সঙ্গে মিশবে? মিশলে তা আপনাদের এলাকার বাইরে। শাস্ত্রেই তো লিখেছে বিবাহের বয়স হলে পিতা যদি কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন তবে কন্যা নিজেই নিজের পতি বরণ করবে।" যূথিকা পথনির্দেশ করে। মুখ ফুটে বলে না যে সে আপনি তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

"ওসব বিলিতী প্রথা এদেশে চলবে না, মা যূথিকা। আমরা জাতকুল গণগোত্র মানি। মনোজ বাগচীর বেলা সামান্য ব্যতিক্রম হতো। ওরা বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী। ঝরনা যদি আমাদের মুখ হাসায় আমরা ওকে ত্যাজ্য কন্যা করবো।" ডাক্তার গৃহিণী কঠোর কণ্ঠে বলেন।

যূথিকা মর্মে ব্যথা পায়। ত্যাজ্য কন্যা সে নিজেও তো হয়েছে। কিন্তু সেকথা জানায় না। বেচারি ঝরনার ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হয়।

পরের দিন ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট হাতে ঝরনাকে আসতে দেখা গেল যূথিকাদের কুঠির লন্-এ। অনেকদিন বাদে দেখা।

"কী ভাই? কেমন আছো?" যূথিকার প্রশ্ন।

"শারীরিক ভালো। মানসিক ভালো নয়। শখ্ করে যদি কেউ ইনভ্যালিড হয় তবে তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে আটকা থাকা কি খুব-সুখের ?" ঝরনার উত্তর।

"তা হলে তুমি আজ ছাড়া পেলে কী করে ?" যূথিকা আশ্চর্য হয়।

"আপনার সুবাদে। আপনি কাল মাকে কী বলেছেন জানিনে। ফলে তাঁর সুর অনেকটা নরম হয়েছে। আমাকে উনি ওয়াকি হতে দেবেন না, কিন্তু কলকাতা গিয়ে অন্য কোনো চাকরির জন্যে চেষ্টা করতে দেবেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেতে দেবেন না, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যেতে দেবেন। শুনেছি যুদ্ধের প্রয়োজনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে রকমারি অসামরিক বিভাগ খোলা হচ্ছে। ফ্রণ্টে যেতে হবে না। ফ্রণ্টের সঙ্গে যোগাযাগ রাখতে হবে। মিসেস গোস্বামী আমাকে সুপারিশ করে কয়েকজনের নামে চিঠি দিচ্ছেন। আপনিও কি—"ঝরনা ইতস্তত করে।

"আলবৎ। তোমাকে সুপারিশ করব না তো কাকে করব ? এ শহরে তোমার মতো যোগ্য আর কে আছে ? তোমার অক্ষমতা তো এই যে তুমি পুরুষ নও, নারী। কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে। নারীও পুরুষের সঙ্গে সমান। তোমাকে আমি মিলিটারি ইউনিফর্মে দেখলেও অবাক হতুম না। তা সিভিল ইউনিফর্মই ভালো। মা বাপের মনে কষ্ট যদি দিতেই হয় তবে এখন এই ইস্যুতে নয়। পরে আর কোনো ইস্যুতে।" যূথিকা দুষ্টু মিষ্টি হাসি হাসে।

"তেমন কোনো ইস্যুর সম্ভাবনা নেই, যূথিকাদি।" ঝরনা রঙিন হয়ে বলে, "বাঙালীর ছেলেরা দারুণ সেয়ানা। অবশ্য মানসদা বাদে।"

যূথিকা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "মানসদার মতো বোকাসোকা ছেলে আরো অনেক আছে। তোমাকে ছাড়তে হবে শুধু জাতের অহঙ্কার, কুলের গরব। কেন, বাঙালী ছাড়া কি আর বর হয় না ? যে তোমাকে ভালো-বাসবে, যাকে তুমি ভালোবাসবে সেই তোমার বর। সীতার মতো তোমার চারদিকে গণ্ডী আঁকার অধিকার কোন্ লক্ষ্মণের আছে ? সেই গণ্ডীর ভিতরেই জীবনসঙ্গী বরণ করতে হবে, তাও করে দেবেন গুরুজন, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও একপ্রকার যুদ্ধ। এই ইস্যুতে আপস করতে নেই। বাপ মা ত্যাজ্য কন্যা করলেও না।" যূথিকার হাসি মিলিয়ে যায়।

ওয়াকির প্রস্তাবটা এসেছিল মিস্টার গোস্বামীর কাছ থেকে। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর। সরকারী কাগজপত্র তাঁর দফতরে

পৌঁছেছিল। দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে। ভারত সরকার ভারতে যুবক-যুবতীদের জন্যে এক এক করে সব ক'টা দরজা খুলে দিচ্ছেন। সাড়াও পাচ্ছেন সব ক'টা প্রদেশ থেকে। ওয়াকিতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদেরই সাড়া বেশী। ফ্রণ্টে যেতে ওদের ভয়ডর নেই। না প্রাণের ভয়, না চরিত্রের ভয়। শত শত ইণ্ডিয়ান অফিসার ফ্রণ্টে যাচ্ছে, তারা যদি ইণ্ডিয়ান মহিলাদের সাহচর্য না পায় তবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাদের সাহচর্য পাবে। কেউ কেউ বিয়েও করবে।

শহরের গণ্যমান্যরা প্রাচীনপন্থী। সিভিল সার্জনের মেয়ে যে পুরুষদের সঙ্গে টেনিস খেলতে যায় এটাও তাঁরা সুনজরে দেখেন না। কিন্তু আগে থেকে এর নজির আছে। মিসেস গোস্বামীও তো মাঝে মাঝে খেলতে আসেন। স্বাস্থ্যের জন্যেই টেনিস খেলা। আমোদের জন্যে নয়। পাষাণ প্রতিমার মতো মুখ। কথা বলেন খুব কম। হাসি পেলে হাসি চেপে রাখেন। ঝরনারও সেই ধরণধারণ। প্রাচীনপন্থীদের এটা গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়াকি! সর্বনাশ!

## ॥ পাঁচ ॥

কথা ছিল মিলি লণ্ডনে গিয়ে বেডফোর্ড কলেজে জুলির জায়গায় ভর্তি হবে। কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী নন। বলেন নতুন করে দরখাস্ত করতে ও একবছর অপেক্ষা করতে। একবছর পরে ব্রিটেনের উপর আকাশ-যুদ্ধ। প্রাণ বাঁচাবে না পড়াশুনায় মন দেবে? প্রাণ বাঁচানো বলতে কেবল নিজেরটি বোঝায় না। মিলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ত্রাণকার্যে যোগ দেয়। দেশে থাকতে ওর সেবাকর্মের অভিজ্ঞতা ছিল। সহজেই নাম করে। এমনিতেই ও মেয়ে অসমসাহসী। সাইরেন শুনে ও শেলটারে ঢোকে না। যেখান থেকে ডাক আসে সেখানে ছুটে যায়। জখমীদের নিয়ে যায় হাসপাতালে।

সুকুমার গা বাঁচিয়ে চলে। ওর সুটের ক্রীজ নষ্ট হবে এটাই ওর কাছে উদ্বেগের বিষয়। তবে ও নীরব দর্শক নয়। বি. বি. সি'র ইণ্ডিয়ান সার্ভিসে

ওর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য এই যুদ্ধে মিত্র-পক্ষের জয় কামনা করা। ভুল, ভুল, অত্যন্ত ভুল এই ধারণা যে ইংলণ্ডের দুর্যোগ হচ্ছে ভারতের সুযোগ। কে বাঁচবে, যদি ইংলণ্ড মরে? কে মরবে, যদি ইংলণ্ড বাঁচে?

ওর আফসোস মিলি ওর ব্রডকাস্ট শোনে না। বলে, "ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডা আমি শুনতে চাইনে। জিতবে ওরা ঠিকই, কিন্তু জয়ের ভাগ ভারতকে দেবে না। তা বলে আমরা ওদের দুর্যোগের সুযোগ নিতে চাইনে। সেটা অধর্ম হবে। ওরা প্রাণের দায়ে লড়ছে। তা তো আমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। হিটলারের পায়ে আত্মসমর্পণ করলে বেঁচে যেত। কিন্তু তেমন বাঁচা কি মরার চেয়েও খারাপ নয়? চার্চিল তাঁর দেশবাসীর অপরাজেয় আত্মা। ধন্য তাঁর নেতৃত্ব! কিন্তু এটাও আমি জানি যে আমরা যদি তাঁর মামার দেশের মতো স্বাধীনতার জন্যে লড়তে না পারি তো অন্য কোনো উপায়ে স্বাধীন হতে পারব না। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধই অন্যান্য উপনিবেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের আদর্শ। দেশ এর জন্যে তৈরি নয়।"

সুকুমার লেবার পার্টির সর্দারদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের ভজায় যে ভারত তার সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে মুখিয়ে রয়েছে, যদি কংগ্রেস নেতাদের অগৌণে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর বড়লাটের শাসন-পরিষদ্‌কে ব্রিটেনের মতো ওয়ার ক্যাবিনেটে পরিণত করা হয়। স্বাধীনতা এই মুহূর্তে কেউ চাইছেন না। সেটা সবুর করতে পারে। সুকুমারের বিশ্বাস লেবার পার্টির চাপে চার্চিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে দূত পাঠাবেন।

মিলি ওর কথায় কান দেয় না। বলে, "অমন একটা পাপেট গভর্নমেণ্ট যদি কংগ্রেসের নেতারা গঠন করেন তো দেশের লোক ছি ছি করবে।"

আকাশযুদ্ধে নাৎসীরা জয়ী হয় না। হিটলার উপলব্ধি করেন যে আকাশ পথে ব্রিটেন আক্রমণ করা নিষ্ফল। করতে হবে সমুদ্রপথে আক্রমণ। কিন্তু নৌযুদ্ধে কি ব্রিটেনকে পরাস্ত করা সম্ভব, যতদিন না জার্মানীর জাহাজের সংখ্যা ও শক্তি বাড়ে? তার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে যুদ্ধের মোমেণ্টাম নষ্ট হবে। মোমেণ্টাম বজায় রাখতে হলে অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে রাশিয়ার উপরে। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। একটার নাম তো সোভিয়েট ইউনিয়ন। অন্যটার নাম বোলশেভিক বিপ্লব। দশ বছরের

অনাক্রমণ চুক্তি মান্য করতে জার্মানী ন্যায়ত বাধ্য। কিন্তু দশ বছর সময় পেলে যে বিপ্লব চিরস্থায়ী হবে, সে এক দারুণ ঝুঁকি।

জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মিলির বিশেষ কিছু করবার থাকে না। সকলেই বলাবলি করে যে এ যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেছে। যা শত্রু পরে পরে! হিটলার আর এ মুখো হবে না। হলে নেপোলিয়নের মতো ওয়াটারলু। আপাতত রাশিয়াকে মদত দেওয়াই সুবুদ্ধি। ইংরেজের হয়ে ওই লড়বে।

যুথিকাকে লেখা মধুমালতীর চিঠিতে এসব কথা তো ছিলই, ছিল আরো অনেক কথা। ওয়াটারলুর আগে ইংরেজরা তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ঢিলে দেবে না। উৎপাদন জোর কদমে চলেছে। কেউ বেকার নয়। ধর্মঘট স্বপ্নের অতীত। কেউ কারো চেয়ে বেশী খেতে পায় না, এমনি কঠোর রেশন প্রথা। যা রেশনে দেয় তাতে পেট না ভরলে তুমি যে শিকার করে পেট ভরাবে তারও জো নেই। এক মন্ত্রীর চাকরি গেল একটা না দুটো খরগোস শিকার করতে গিয়ে। পোশাক সম্বন্ধেও কড়াকড়ি। পোশাকেই তো উচ্চনীচ ভেদ বোঝা যেত। সেটা যাতে না বোঝা যায় সে ব্যবস্থাও হচ্ছে। লিখিতভাবে না হলেও অলিখিভাবে এটাও একপ্রকার সাম্যবাদ। বোলশেভিকদের মদত দিতে যাওয়াও তো একহিসাবে সাম্যবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া। শ্রেণীবৈষম্য ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাচ্ছে। ধনীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে বলা চলে না, কিন্তু গরিবদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে। ঘরবাড়ীর অভাব, এটাই ওদের সব চেয়ে জোরালো অভিযোগ।

চিঠির বয়ান শুনে মানস চমৎকৃত হয়। কিন্তু ওর যা স্বভাব। সমালোচনা করবেই। 'মিলিকে চিঠি লিখলে জিজ্ঞাসা করবে, "মদটা কি কেউ কম খাচ্ছে ?"

"যুদ্ধের অনুরোধে মানুষ সব পারে। ওটাই বা না পারবে কেন ?" যুথিকার প্রশ্ন।

"ইতরভদ্র সকলের মধ্যেই ওর ব্যাপক প্রচলন। অমন লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রি আর নেই। যদি না অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণকে তার মধ্যে ধরো।" মানস ক্ষীণ হাসে। "তবে আছেন ওদের মণ্টগোমরির মতো সেনাপতি। যিনি সুরা স্পর্শ করেন না।"

"হিটলারও সুরা স্পর্শ করেন না, শুনেছি।" যুথিকা বলে।

"লোকটার গুণ আছে। শুনেছি একান্ত ভদ্র। সম্পূর্ণ সৎ। কতকগুলো নৈতিক গুণ না থাকলে মানুষ শ্রদ্ধা করবে কেন? তা বলে গোঁয়ারতুমিটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুই ফ্রণ্টে লড়াই করতে বিসমার্কপর্যন্ত বারণ করে গেছেন। দুই ফ্রণ্টে লড়াই করতে গিয়ে কাইজারের হার হলো। হিটলার কি বিসমার্কের চেয়েও বুদ্ধিমান? বলতে পারো পশ্চিমমুখে আর এগোনোর উপায় ছিল না।" মানস স্বীকার করে।

যুদ্ধটা নতুন এক মোড় নেওয়ায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জল্পনাকল্পনার সীমা ছিল না। কে জিতবে? জার্মানী না রাশিয়া? জার্মানীর পক্ষেও বেশ কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা একটু চাপা গলায় বলেন, "মস্কো দূর অস্ত নয়। ইংরেজের সাধ্য নেই যে মস্কোতে গিয়ে যুদ্ধ করে।" তার সঙ্গে জুড়ে দেয় "আর মস্কোই তো রাশিয়ার মাথা। মাথা কাটা গেলে কি ধড়টা বাঁচতে পারে?

ভাবনার কথা বইকি। মানস রোজ রাত্রে তার কুঠির চারদিকের প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারি করতে করতে পাক খায়। তার পরে প্রশস্ত লনের এক প্রান্তে ডেকচেয়ার পেতে আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তা করে। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' মনে পড়ে। রুশরা আবার মস্কোর ঘরবাড়ী দোকানপাট পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে শহর খালি করে দিয়ে যাবে। নাৎসীরা একফোঁটা জলও খেতে পাবে না। একটি মানুষও সহযোগিতা করবে না। রুশদের এই 'পোড়া মাটি' নীতি অপূর্ব ও অনন্য। জার্মানরা দখল করতে পারে, কিন্তু ভোগ করতে পারবে না। নিজেরাই নাকাল হবে।

কিন্তু মজার কথা, রুশ কমিউনিস্টরা এই বিপদে মার্কস এঙ্গেলসের শরণ নিচ্ছেন না, স্মরণ করছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতি কাউণ্ট সুভোরোভকে। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রিয়পাত্র। বিপ্লবী ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানো হয়েছিল যাঁকে ইটালীতে তিনিই কিনা হবেন বিপ্লবী রুশ সৈন্যের পূর্বসূরী। করতে হবে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ। সাম্যবাদ নয়, জাতীয়তাবাদই এখন যুদ্ধের প্রেরণা।

কখন কোন্ তাসখানা খেলতে হয় স্টালিন সেটা জানেন। তাই জাতীয়তাবাদের তাসখানা খেলছেন। ফলে স্বদেশের বুর্জোয়াদের সহযোগিতা পাচ্ছেন। আর বিদেশী জাতীয়তাবাদীদেরও। রুশ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের মিতালি গতবারের মহাযুদ্ধেও বিদ্যমান ছিল।

জাতীয়তাবাদী হিসাবেই রুশরা কম বিপজ্জনক, সাম্যবাদী হিসাবে বেশী। নইলে চার্চিল কেন সাহায্য পাঠাবেন? ক্রিপ্‌স তো মস্কোতেই বসে আছেন। স্টালিনকে তিনিই সতর্ক করে দেন যে হিটলারের ফৌজ আক্রমণ করতে উদ্যত। স্টালিন তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চাননি। পরে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওরা নাই বা হলো কমিউনিস্ট। ফাউস্ট তো শয়তানের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিলেন।

স্বপনদা গেটের 'ফাউস্টে'র মতো একখানা ক্লাসিক লিখতে ইচ্ছা করেছেন। তাঁর হাতে সেটা হয়তো নেবে উপন্যাসের রূপ। হবে শুধু যুগোপযোগী নয়, দেশোপযোগী। এর জন্যে তাঁকে খুব ভাবতে হচ্ছে। ছোটখাটো একটা গ্রুপের পত্তন করেছেন। মানস যদি মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে গ্রুপের আড্ডায় যোগ দেয় তো খুশি হবেন। ওঁর ওখানেই উঠবে।

স্বপনদা লিখেছেন, "যুদ্ধ তো ক্রমেই বিশ্বযুদ্ধের আকার ধারণ করছে হে! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই যুদ্ধক্ষেত্র। তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শনের জন্যে দূর দেশে যেতে হবে না। জানো তো, আমি ফেটালিস্ট। কপালে যদি মরণ লেখা থাকে তো ঘরে বসেই মরব। পালিয়ে বাঁচব না। আর পালাবই বা কোথায়? ওদিক থেকে তেড়ে আসছে নাৎসীরা। রাশিয়ানরা যদি রুখে না দাঁড়ায়, শহরকে শহর ছেড়ে দেয় তবে জার্মানরা ককেশাস পেরিয়ে ইরানে ঢুকবে। তার পর ভারতে। এদিকে যদি জাপানীরা এসে হানা দেয় তবে ইংরেজরা কেমন করে দুই দিক সামলাবে? ইতিমধ্যে বিস্তর ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী হয়েছে, কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে তারা? বিদ্রোহী ভারতীয়দের সঙ্গে নয় তো? যাক, আমি বাপু, এর মধ্যে নেই। কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধে যোগ দিলেও আমি রণছোড়। ল্যাণ্ডর যা বলেছেন আমিও তাই বলি, একটুখানি বদলে দিয়ে—

**'I strove with none ; for none was worth my strife.**

**Woman I loved and, next to Woman, Art.'**

আজকের দিনে কিছুই নিশ্চিত নয়। জীবনও নয়, সম্পত্তিও নয়, সভ্যতাও নয়, সংস্কৃতিও নয়। নিশ্চিত বলতে সত্যি যদি কিছু থাকে তবে সেটা হলো ধর্ম। গীতা উপনিষদ্, বাইবেল কোরান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, পার্শীদের আবেস্তা। কিন্তু আমরা যারা আর্টিস্ট বা ইনটেলেকচুয়াল তাদের মন মেজাজ সংশয়বাদীর। তাই আমাদেরই এত মাথাব্যথা। চাষী বা মজুর হলে বলতুম,

গোল্লায় যাক সভ্যতা, ধ্বংস হোক সংস্কৃতি, মা কালী তো থাকবেন, আর শিবলিঙ্গ। এঁদের কি বিনাশ আছে ? না, এঁরা আদিম যুগ থেকে রয়েছেন, অন্তিম যুগ পর্যন্ত থাকবেন। তবে যুদ্ধ করতে করতে মানুষ জাতিটাই যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে এঁদেরও বিলোপ ঘটবে। ধর্ম এক্ষেত্রে অসহায়। মানুষ জাতির অন্তর্ধানে ধর্মেরও অন্তর্ধান।"

স্বপনদা ও দীপিকা বৌদি স্থির করেছেন যে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি নিরীহ মানবশিশুকে এ জগতে আনবেন না। যুদ্ধ শেষ হলে পরে ওকথা ভাবা যাবে। এই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু আরো কষ্ট হতো যদি যুদ্ধের বিভীষিকার মাঝখানে এত বড়ো একটা দায়িত্ব নিয়ে হিমশিম খেতেন।

স্বপনদার চিঠির শেষের দিকে ছিল আসল কথা। "তার পর, শোন, শুনে হেসো না। আমরা যদিও টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি তবু আমাদেরও একটা ম্যানিফেস্টো চাই। মার্কস এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন তখন তাঁরা ক'জন ছিলেন ? সেদিনকার সেই ক্ষুদ্রতম বীজ আজ এক বিশাল বটবৃক্ষ। মাঝখানে এক শতাব্দী ব্যবধান। আমাদেরও দিন আসবে। এ শতাব্দীতে নয়, একবিংশ শতাব্দীতে। অবশ্য মানবজাতি যদি আত্মঘাতী না হয়। আমরা যা ঘোষণা করতে চাই তা সংক্ষেপে এই যে, একজন মানুষ কেবল বাঙালী নয়, সে ভারতীয়। সে কেবল ভারতীয় নয়, সে মানুষ। মানুষহিসাবে সে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারী। সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞান, বিশ্ব দর্শন, বিশ্ব সাহিত্য, বিশ্বসংস্কৃতিই তার উত্তরাধিকার। তাকে তার এই উত্তরাধিকার সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। তার সঙ্গে নিজেরও কিছু যোগ করতে হবে। যোগফল দিয়ে যেতে হবে উত্তরপুরুষের হাতে। এটা প্রাচ্য ওটা পাশ্চাত্য এ গণনার দিন গেছে। এটা ভারতীয় ওটা অভারতীয় এ গণনাও অবাস্তব। এখনকার গণনা হচ্ছে কোন্‌টা মানবিক, কোন্‌টা অতি-মানবিক, কোন্‌টা অমানবিক। আমরা মানবিকবাদী। বন্ধুরা তার পূর্বে একটা বিশেষণ জুড়ে দিতে চান। উদার মানবিকবাদী। লিবারল হিউ-ম্যানিস্ট। পার্থক্য সূচনা করতে আর একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে। তাঁরা র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট।"

যূথিকা জিজ্ঞাসা করে, "টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি মানে কী ?"

মানস হেসে বলে, "কোনো এক অখ্যাত শহরের অখ্যাত রাস্তার তিনজন

অখ্যাত দর্জি এক ইশতাহার জারি করেছিল। তাতে ছিল উই দ্য পীপল অভ্ ইংল্যাণ্ড।"

"কিন্তু স্বপনদা তো অখ্যাত শহরের অখ্যাত রাস্তার অখ্যাত দর্জি নন। ওঁর নাম একালের বাঙালী পাঠকরা সবাই জানে।" যুথিকা তাঁর পক্ষ নেয়।

রাত অনেক হয়েছে। মানস তার অভ্যাসমতো তার কুঠির চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারি করার পর বাইরের প্রশস্ত লনে মুক্ত আকাশের তলে ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। দৈনন্দিন কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে এই সময়টায় সে উর্ধ্বতর ভাবনাচিন্তায় বিভোর হয়। খুব দেরি দেখলে যুথিকা তাকে ডাকতে আসে।

"ছাখ জুঁই, স্বপনদা আর আমি এক পথের পথিক হলেও পুরোপুরি একমত নই। ঈশ্বর যদি না থাকেন, অমরত্ব যদি না থাকে তবে বাকী থাকে প্রকৃতি আর মানবজাতির পার্থিব ভবিষ্যৎ। কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষ কতটুকু নির্ভর করতে পারে? ভূমিকম্প বা মহাপ্লাবন বা তুষারপ্রবাহ বা সৌরজগতের দূরবর্তী ঘটনা যে-কোনোদিন মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তা ছাড়া এটাও তো সম্ভব যে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উষ্ণতা হারাবে। তখন প্রাণধারণ করাই কষ্টকর হবে। হিউমানিস্টরা ধরে নিয়েছেন যে প্রকৃতি চিরকাল প্রাণের অনুকূল থাকবে ও মানবজাতির বিকাশ সর্বতোমুখী হবে। এই দুটি ধারণার উপর স্বপনদারা আর একটি ধারণা স্থাপন করতে যান। সেটা 'লিবারল' জীবনদর্শন। কারো সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকবে না। না ধনিকদের সঙ্গে, না শ্রমিকদের সঙ্গে। না জমিদারদের সঙ্গে, না চাষীদের সঙ্গে। হিংসা দূরের কথা, অহিংসাও সংগ্রামের উপায় হবে না। আইনসঙ্গত উপায়ে যতদূর হবার ততদূর হবে। কী করে ওঁর সঙ্গে একমত হই, বলো?" মানস চিন্তান্বিত।

"ঈশ্বর আর অমরত্ব, এ দুটি কি আরো গোড়ার জিনিস?" যুথিকা সুধায়।

"হ্যা, জুঁই। সেই উপনিষদের যুগ থেকেই মানুষ এ দুটিকে মূলগত প্রশ্ন বলে উত্তরের অন্বেষণ করে এসেছে। এই অনিশ্চিত বিশ্বে এই দুটি নিশ্চিতি যদি না থাকে তবে জীবন অর্থহীন।" মানস কাতরকণ্ঠে বলে।

যুথিকা তার স্বামীর হাতে হাত রেখে মিষ্টি সুরে বলে, "তা তুমি রোজ রাত্রে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে কিসের উত্তর খুঁজে পাবে, মানস? একটি কবিতা মনে পড়ছে। শোন। ফ্রান্সিস টমসনের লেখা।"

এই বলে সে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে—

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee,
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there ?"

মানস নীরবে শুনে যায়। এটি তার নিজেরও একটি প্রিয় কবিতা। জানত না যুথিকার কণ্ঠস্থ।

"এইরকম একটি ভাব কবিরের দোঁহাতেও মেলে। 'পানীমে মীন পিয়াসী।' চারদিকে জল, মাছ তবু জলের জন্যে তৃষিত। আমরা ঈশ্বরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বেঁচে আছি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি আছেন ও তিনি আছেন বলেই আমরা আছি।" যুথিকা বলে যায়, "তোমার যা হয়েছে তার নাম বিশ্বাসের সঙ্কট। তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ।"

"আর অমরত্ব ?" মানস তার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর শুনতে চায়।

"আত্মা অমর, দেহ অমর নয়। দেহও যদি অমর হতো দেহীদের ভার পৃথিবী বহন করতে পারত না। মৃত্যু বন্ধ হলে জন্মও বন্ধ হতো। জন্ম বন্ধ হলে নরনারীর মিলনও নিষ্প্রয়োজন হতো। নরনারী বলে দুটি ভাগও থাকত না। আত্মার তো স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। দেহেরই আছে। দেহের অস্তিত্ব মেনে নিলে জন্ম মৃত্যুর ভারসাম্যও মেনে নিতে হয়। যতগুলি জন্ম ততগুলি মৃত্যু। মৃত্যু আছে বলে দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এই যে মায়ের কোল খালি করে নিরীহ নিষ্পাপ শিশু অকালে চলে যায়। জানি সে অমৃতের সন্তান, তার আত্মা অমর। তবু তার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল। সেও কি মাকে ছেড়ে থাকতে পারে ?" যুথিকার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

"প্রকৃতির কোল থেকে যে গেছে ঈশ্বরের কোলে সে আছে। এখানেও যে প্রেম সেখানেও সেই প্রেম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিশ্বাসের জোর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেশী রকম ইনটেলেকচুয়াল হওয়ার এই পরিণাম।" আক্ষেপ করে মানস।

"সারাজীবন আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাটালেও তুমি বিশ্বাসের জোর পাবে না। ওপার থেকে কেউ কোনোদিন ফিরে আসেনি, আসবেও না, যাকে দেখে তোমার বিশ্বাস হবে যে সে অমর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব? অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। আমার অন্তরের উপলব্ধি আমাকে অভয় দিচ্ছে যে আমার দেহ চলে গেলেও আমার অস্তিত্ব চলে যাবে না, আমার অস্তিত্বই আমার অমরত্ব। দেহের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ও যাবে, আমাকেও কেউ চিনতে পারবে না, আমিও কাউকে চিনতে পারব না, তা সত্ত্বেও আমি থাকব। তোমার ভালোবাসা আমার কাছে পৌঁছবে। আমার ভালোবাসা তোমার কাছে। ভালোবাসাই মৃত্যুকে জয় করতে পারে। তাই ভালোবাসার জন্যে মানুষ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে। দেশপ্রেমও এর মধ্যে পড়ে।" যূথিকা নিঃসংশয়।

রাতের বেলা মুক্ত আকাশের তলে যে শান্তি তেমন শান্তি মানস আর কোথাও পায় না। তাই রোজ একবার শান্তির সন্ধানে আসে।

"বাইবেলে পড়েছি ভগবান মানুষকে নিজের আদলে বানিয়েছেন।" মানস বলে, "কিন্তু বাস্তবে দেখছি মানুষই ভগবানকে আপনার আদলে বানিয়েছে। আর মানবসৃষ্ট ভগবানের কাছে ইচ্ছাপূরণ প্রত্যাশা করেছে। হতাশ হলে ভাবছে ভগবানই নেই। ভগবান যদি থাকেন তবে এত অন্যায় কেন, এত অত্যাচার কেন? এত দুঃখ, এত ব্যর্থতা কেন? কিন্তু ভগবান না থাকলেও এসব থাকত। প্রতিকারের জন্যে মানুষ কার কাছে যেত? যার কাছে যেত তার চেহারা তো সর্বশক্তিমানের মতো নয়। তার হৃদয় তো সর্ব জনের প্রতি প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ নয়। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা যদি শক্তিমান হয়ে থাকেন তো প্রেমময় বা করুণাময় নন। যদি প্রেমময় বা করুণাময় হয়ে থাকেন তো শক্তিমান নন। ব্যক্তিকে ছেড়ে যারা সমাজের দিকে তাকাচ্ছে তারা কি দেখতে পাচ্ছে এমন এক সমাজ যে একাধারে শক্তিমান ও প্রেমময় বা করুণাময়? কই, সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালে তেমন লক্ষণ তো দেখতে পাইনে। শক্তির সঙ্গে জ্ঞান মিশ খেতে পারে, কিন্তু প্রেম বা করুণা কি মিশ খায়? ইতিহাসে এর একটি কি দুটি দৃষ্টান্ত আছে। একটি তো আমাদের সম্রাট অশোক। হাজার বছরে হয়তো তেমন একজন ব্যক্তি জন্মাবেন। কিন্তু সমাজ বা সমষ্টি কি তাঁর অনুরূপ হবে?"

"না বোধহয়। তবু সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হবে।" যূথিকা

মানসকে ভরসা দেয়। "ভাবীকালের মানবসমাজ কেবল শক্তিমান ও জ্ঞানবান হবে না, প্রেমময় ও করুণাময়ও হবে। কিন্তু তা বলে ভগবানের স্থান নিতে পারবে না। ভগবান ভগবান। মানুষ মানুষ। পরমাত্মা পরমাত্মা। জীবাত্মা জীবাত্মা। পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জীবাত্মা নয়। আর সৃষ্টিকে বাদ দিলে স্রষ্টাই বা কাকে নিয়ে থাকবেন? তাই জীবাত্মাও অমর। কিন্তু জীবদেহ অমর নয়।"

"সেইখানেই তো দুঃখ। যাকে ভালোবাসি তাকে হারাতে কে চায়? তবু হারাতেই হয়। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরে একদিন। নিজেকেও তো একদিন এই মর্তভূমি থেকে বিদায় নিতে হবে। এর পরে কোথায় আবার গতি হবে কেউ জানে না, জানতে পায় না, যে যা খুশি কল্পনা করে। কেউ পরজন্ম, কেউ পরলোক। কেউ নির্বাণ, কেউ মোক্ষ, কেউ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যুগল মিলন।" মানস উদাস কণ্ঠে বলে যায়।

"আজ বাদে কাল কী হবে তাও মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। ইহকালের পর কী গতি হবে বা ইহলোকের পর কোথায় গতি হবে সে তো আরো দূরের কথা। এসব ভাবনা বৃথা ভাবনা। এসব নিজে না ভেবে তাঁকেই ভাবতে দাও যিনি তোমাকে ইহলোকে পাঠিয়েছেন। তুমি তো নিজের ইচ্ছায় জন্মাওনি।" যূথিকা মানসকে শুতে নিয়ে যায়।

ঘরে পা দিয়ে মানস বলে, "গৃহ থাকলে গৃহী থাকে, গৃহী থাকলে গৃহ থাকে। জগৎ থাকলে ব্রহ্ম থাকে, ব্রহ্ম থাকলে জগৎ থাকে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মায়া যেমন অসঙ্গত তেমনি অসঙ্গত জগৎ সত্য ব্রহ্ম মায়া। আমরা ইনটেলেকচুয়োলরা জগৎ সত্য মানি, ব্রহ্মের বেলা সন্দিহান। কেউ কেউ তো সোজাসুজি নাস্তিক। অপর পক্ষে মানবসৃষ্ট ভগবান আর মানতে পারা যাচ্ছে না। মানুষের আদলে ভগবান নয়, মানুষ যত বড়োই হোক। মানুষের মাপে তাঁকে মাপা যায় না, সেটা বৃথা।"

রায় বাহাদুর মাঝে মাঝে আলাপ করতে আসেন। তিনিও তো একদা জজ ছিলেন, অবসর নিলেও আইন আদালত সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন। হাইকোর্টের রিপোর্ট তাঁর নিত্য পাঠ্য। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় কেটে যায় শাস্ত্রচর্চায়। শাস্ত্র বলতে কেবল হিন্দুদের নয়, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, মুসলমান, পার্শীদের শাস্ত্রও। সমান শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। মানস তাঁর

সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর বাড়ীতেও যায়। ধর্মের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শোনে। নিজের সমস্যা শোনায়।

"দেখুন, মল্লিক সাহেব," রায় বাহাদুর বলেন, "মানুষ সাধনা করলে দেবতার স্তরে পৌঁছতে পারে, বুদ্ধ হতে পারে, খ্রীস্ট হতে পারে, কিন্তু ওই দুটি রহস্য ভেদ করা তার সাধ্যাতীত। মৃত্যুর পর কী হয় তা সে মৃত্যুর ওপারে না গেলে জানতে পাবে না, এপার থেকে জানা অসম্ভব। মৃত্যু থেকে অমৃতে যাবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এইটুকু পৃথিবীর এইটুকু জীবনই যে একমাত্র জীবন তা মেনে নিতে মন বিমুখ। একপ্রকার না একপ্রকার পরকাল এক-ভাবে না আরেকভাবে ধর্মপ্রাণদের সকলেরই স্বীকৃত। ওপারে যে কিছুই নেই এটা এপার থেকে কেউ দেখবেই বা কী করে? আছে, এই প্রত্যয় মানুষকে ধর্মে মতি দেয়। এটা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান কেউ কারো চেয়ে কম ধর্মপ্রাণ নয়। যে যার পথে চলে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করছে। সে পাথেয় তার চাইই।"

"কিন্তু যেখানে যাবার জন্যে পাথেয় সংগ্রহ সে যদি শূন্য হয়ে থাকে তবে তো পাথেয় সংগ্রহ বৃথা। যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? মৈত্রেয়ীর মতো এই প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন।" মানসকে এ ভাবনা জর্জর করে।

"এখানে অমৃত হচ্ছে এমন এক উপলব্ধি যার পরে আর কোনো উপলব্ধির প্রয়োজন থাকে না। বলা যেতে পারে পূর্ণত্বের উপলব্ধি। এই জীবনেই সেটা সম্ভব। সন্তদের জীবনে সে রকম ঘটে বলে শুনেছি। কিন্তু সবাই তো আর সন্ত নয়, হতেও পারে না। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের কর্তব্য দিব্য জীবনের দিকে এক পা এগিয়ে থাকা। কালক্রমে মানুষ জাতটাই দেবতার স্তরে উন্নীত হবে, যেমন হয়েছে পশুপাখীর থেকে মানুষের স্তরে। তার জন্যে হয়তো হাজার হাজার বছর লাগবে। লাখ লাখ বছরও লাগতে পারে। বিবর্তনের ইতিহাসে লাখ লাখ বছরও তো খুব বেশী সময় নয়। আসল কথাটা হলো মানবজাতির লক্ষ্য কী। সব মানুষই যদি একই সঙ্গে নির্বাণ লাভ করে তা হলে মানবজাতি বলে কারো অস্তিত্ব থাকবে না। আর সবাই যদি শেষ-বিচারের দিন স্বর্গে বা নরকে যায় তা হলেও মানবজাতির অস্তিত্বলোপ। সমগ্র মানবজাতির দিক থেকে যদি ভাবি তবে ক্রমবিকাশের পথে এগোতে এগোতে দেবজাতিতে পরিণত হওয়াই লক্ষ্য। পশু থেকে মানুষ যদি সম্ভব হয়ে থাকে

তবে মানুষ থেকে দেবতাও সম্ভব নয় কেন ? ততদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারব না, এই যা দুঃখ !" রায় বাহাদুর হাসেন।

"কিন্তু আপনার সেই দেবজাতিও মরণশীল।" মানস ভোলে না। "আর বিবর্তন সেইখানেও থামবে না। তার পরেও থাকবে উচ্চতর স্তর। দেবতার চেয়েও উচ্চ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুর অধীন। পরমায়ু দীর্ঘায়িত করেও একদিন বিদায় নিতে হবে। দেবতা বলে যম ছাড় দেবে না। স্বর্গের দেবতা তো নয়। মর্ত্যের দেবতা।"

"শ্রী অরবিন্দ যে অতিমানবের স্বপ্ন দেখেছেন সেই অতিমানবকেও তার সাধের ভূলোক ত্যাগ করতে হবে। ভূলোক চিরদিনই মর্ত্যলোক। তা সত্ত্বেও সে সাধনার মূল্য আছে। তাতে মানুষের উচ্চতা বেড়ে যায়। ব্যক্তির বেলা তো নিশ্চয়ই। জাতির বেলাও কি না যথাকালে দ্রষ্টব্য।" রায় বাহাদুর দ্বিধান্বিত।

"ব্যক্তি নিয়েই তো জাতি। জাতির উচ্চতাও বাড়বে ক্রমে ক্রমে। হয়তো কয়েক শতাব্দী লাগবে। কিন্তু দেহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই অতি-মানবত্ব শেষ। তার পরে আর বিকাশ নেই, বৃদ্ধি নেই। তখনো সেই প্রশ্নই উঠবে, যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব ?" মানস ভোলে না। নিশ্চিতি চায়।

"ওই যে বলেছি। অমৃতত্ব মানে পূর্ণতার উপলব্ধি। কতক মানুষের বেলা এটা সত্য হয়েছে, অনেক মানুষের বেলাও সত্য হবে, এই লাইনে যদি প্রগতি হয় তো অধিকাংশ মানুষের বেলাও সত্য হবে। সব মানুষের বেলাই বা নয় কেন ? যদিও সাধারণ লোকের তাতে আগ্রহ আছে মনে হয় না। ওরা চায় এপারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ওপারে টেনে নিয়ে যেতে। ওদের কামনা স্বর্গ। ওদের ভীতি নরক। ধর্মও ওদের সেই শিক্ষা দিচ্ছে। উচ্চকোটির সাধকরা অবশ্য স্বর্গনরকের চেয়ে আরো উচ্চ লোক আকাঙ্ক্ষা করেন। এপারে না হোক ওপারে তাঁরাই উচ্চতায় উপনীত হন। তাঁদের লক্ষ্য পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্য। পরমাত্মা সম্বন্ধে যাঁরা নীরব তাঁরা সর্ববিধ বাসনা কামনার নির্বাণকেই পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্যের সমান মূল্য দেন। ইতি ইতি করে সাধক যেখানে পেঁছন নেতি নেতি করেও সেইখানে পেঁছতে পারেন। উপনিষদের 'পূর্ণ' আর বৌদ্ধশাস্ত্রের 'শূন্য' একই সত্য বলে মনে হয়। তা নইলে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরবাদী না হয়েও এত মহান হতো না। ধর্মমাত্রই ঈশ্বরবাদী

নয়। আবার সোজাসুজি নিরীশ্বরবাদীও নয়। ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া মানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা নয়। অস্বীকার যারা করেছে তারা কোনোরকম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেনি। একালের মার্কসবাদীরাও পারবে না।" রায় বাহাদুর রায় দেন।

হঠাৎ মার্কসের নাম শুনে চমকে ওঠে মানস। বলে, "মার্কসও তো একজন প্রোফেট। ইতিমধ্যেই তাঁর প্রোফেসী ফলে গেছে দুনিয়ার সুবৃহৎ একটি ভূখণ্ডে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও যদি ধর্ম হয় তবে মার্কসবাদও একপ্রকার ধর্ম। বৌদ্ধদের যেমন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি মার্কসবাদীদেরও তেমনি মার্কসং শরণং গচ্ছামি মার্কসবাদং শরণং গচ্ছামি পার্টিং শরণং গচ্ছামি। সর্বহারার প্রতি ন্যায়ধর্মই ওদের ধর্ম। ঈশ্বরকে যদি একজন ব্যক্তি বলে না ভাবি, একটি স্পিরিট বলে ভাবি, তবে সে স্পিরিট মার্কস, লেনিন প্রমুখ প্রোফেটদের মাধ্যমেও কাজ করছে। তাঁদের পশ্চাতে যে প্রেরণা সে প্রেরণাও স্পিরিচুয়াল। তা না হলে কোটি কোটি লোক প্রাণ দিতে ছুটে যায় কেন? তা কি শুধু খেতে পরতে পাবার জন্যে? ঈশ্বরকে যদি একটি নৈর্ব্যক্তিক বিধান বলে ভাবি তবে সে বিধান সামাজিক ন্যায়ের পশ্চাতেও সক্রিয়। সামাজিক ন্যায়ের স্বপ্ন বুদ্ধ যীশু মহম্মদেরও ছিল। তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রসারের মূলেও সেই নৈতিক বিধান। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেও সামাজিক অন্যায় এসে পড়েছে। তাই পরম খ্রীস্টভক্ত রুশ দেশের জনগণও খ্রীস্টকে ছেড়ে মার্কসকে ধরেছে।"

"Man does not live by bread alone. সমাজব্যবস্থা নিখুঁত হলেও মানুষ তাই নিয়ে পরিতৃপ্ত হবে না। এই দেখছেন না আমার কিসের অভাব? কেন তবে আমি ক্ষুধিত ও তৃষিতের মতো ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে সার সত্য গ্রাস করি? কারণ আমি অনুভব করি যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। এর আড়ালে আছেন একজন যাঁর নাম নিয়ে রূপ নিয়ে হাজারও মতভেদ, কিন্তু যাঁর অস্তিত্ব আমার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই অস্তিত্বই একই অস্তিত্বের ভিতর বাহির। জীবনের সার্থকতা ধনসম্পদে বা পরাক্রমে বা জ্ঞানবুদ্ধিতে নয়, ভগবানকে ও তার সৃষ্টিকে আপনার করে। কবির কথায়, দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা। আমার ব্যক্তিগত সাধনাও এই যুগল প্রেমের সাধনা। এই সাধনায় এ জন্মে যদি এগিয়ে থাকি তবে পরজন্মের কথা পরজন্মে হবে।" রায় বাহাদুর শেষ করেন।

## ॥ ছয় ॥

আরেক দিন কথাপ্রসঙ্গে রায় বাহাদুর মানসকে একটা চমক দেন।

বলেন, "এই যে যুদ্ধ এটাও লীলাময়ের লীলা। যুদ্ধক্ষেত্র তাঁর লীলাভূমি। বৃন্দাবনেও যিনি কুরুক্ষেত্রেও তিনি। শ্যামের বাঁশি শুনে যারা রাসলীলায় মেতেছিল তারাই মেতেছে রক্তরাঙা হোলিখেলায়। তাদের কাছে 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান ' মল্লিক সাহেব, মরণেরও একটা আনন্দ আছে। প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আনন্দ। তা নইলে পতঙ্গেরা কেন স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়? সেই আগুনই তাদের কাছে শ্যাম সমান। পারেন কি আপনি পতঙ্গদের নিবৃত্ত করতে? গোপীদের নিবৃত্ত করতে? তা হলে পারবেন কেন সৈনিকদের নিবৃত্ত করতে?"

মানস বলে, "এমন আজব কথা কখনো আমি শুনিনি। যিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ তিনি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত আছে। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র কেমন করে বৃন্দাবনের মতো লীলাভূমি হতে পারে? সৈনিকরা কেমন করে গোপী হতে পারে? মরণমারণ কেমন করে হোলিখেলা হতে পারে? শ্মশান কেমন করে কুঞ্জবন হতে পারে?"

"যেখানেই তিনি সেখানেই তাঁর লীলা, সেখানেই তাঁর লীলাসহচর সহচরী। যুদ্ধক্ষেত্রই বা ব্যতিক্রম হবে কেন? আপনাকে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে, মিস্টার মল্লিক। আমি যুদ্ধবিগ্রহের পক্ষপাতী নই, সাত্ত্বিক মানুষ। কিন্তু কিসের আকর্ষণে পতঙ্গের মতো শত সহস্র লোক লড়াই করতে ছুটে যাচ্ছে প্রাণের মায়া না রেখে? তা জার্মানরাই হোক আর রাশিয়ানরাই হোক আর ইংরেজরাই হোক আর ভারতীয়রাই হোক। আপনাদের ওই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই সব কথা নয়। মতবাদভিত্তিক ব্যাখ্যাতেও মন মানে না। খুঁজতে হবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। গীতা পড়ে আমি এর একটা মানে পাই। কিন্তু গীতার সঙ্গে ভাগবতকেও মিলিয়ে পড়ি। কুরুক্ষেত্র আর বৃন্দাবন একই লীলাময়ের দুই লীলাভূমি।" রায় বাহাদুর তাঁর এই ধারণায় অটল।

"কিন্তু, রায় বাহাদুর," মানস নিবেদন করে, "সেকালে সৈনিকরাই কেবল যুদ্ধে যেত। যুদ্ধক্ষেত্র বলে একটা স্থানও নির্দিষ্ট থাকত। এখন তো যে-কোনো মানুষের উপর যে কোনো জায়গায় বোমা বর্ষণ হতে পারে। মরবার আগে সে বলতেও সময় পাবে না যে, 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যামসমান'। সেকালে উভয়পক্ষের হাতে অস্ত্র থাকত। একালে আপনার বা আমার হাতে অস্ত্র নেই, তবু অতর্কিতে আমরাও আক্রান্ত হতে পারি। লীলাময়ের এ কেমনতরো লীলা। গীতায় বা ভাগবতে বা অন্য কোনো শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্জুনের হাতে অস্ত্র ছিল, কাজেই তাঁকে বলতে পারা যেত, হে অর্জুন, যুদ্ধ করো। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী। কিন্তু যাদের হাতে অস্ত্র নেই, যারা যোদ্ধা নয়, সাধারণ নাগরিক, তাদের প্রতি সে রকম অনুজ্ঞা কি পরিহাস নয়? যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আমিও একপ্রকার ব্যাকুলতা অনুভব করি। মরণের সঙ্গে মিলনের জন্যে নয়, অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে। অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির বিরোধ আদিকাল থেকে চলে আসছে। প্রাচীনেরা তাকে বলতেন দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। ফাসিস্টরাই আজকের দিনে অশুভ শক্তির প্রতিরূপ। ভারতের উপরেও যে ওদের নজর নেই তা নয়। রাশিয়া যদি হেরে যায় ওরা স্থলপথে ভারতে এসে হাজির হবে। তখন তো লড়তেই হবে। না আবার আমরা পরাধীনতা বরণ করব? লীলাময়ের লীলা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, রায় বাহাদুর। আমি গভীরভাবে চিন্তিত।"

"আপনি অকারণে চিন্তা করছেন, মিস্টার মল্লিক।" রায় বাহাদুর আশ্বাস দেন। "ইংরেজ এখনো শক্তিমান। তাকে হারাতে পারে এমন শক্তি কার আছে?"

প্রসঙ্গটা রাজনীতির দিকে মোড় নেয়। মানস বলে, "যুদ্ধকালে সবকিছুই তো অনিশ্চিত। ইংরেজ যে হারবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কী করে? সেদিন ডানকার্কে ইংরেজের কী দশা দেখা গেল?"

"ওটা পরাজয় নয়, পশ্চাদ্ অপসরণ। যুদ্ধকালে অমন কতবার হয়, কতবার হবে। পুলিশ সাহেব রবিন্‌স সেদিন আমাকে বলছিলেন, "আমরা প্রতিটি যুদ্ধে হারব, কিন্তু শেষ যুদ্ধে জিতব। অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌স ওয়েল।" এই হলো ওদের জাতীয় দর্শন। রবার্ট ব্রুসও তো বার বার লড়েছিলেন, বার বার হেরেছিলেন, আখেরে জিতেছিলেন। ওটা স্কচদেরও জাতীয় দর্শন। ব্রিটিশ

বলতে স্কচও বোঝায়। আপনি নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পারেন যে ওরা অবশেষে জয়ী হবে।" রায় বাহাদুর নিঃসংশয়।

"স্কটল্যাণ্ডের লোকদের স্কচ বললে ওরা অপমান বোধ করে, রায় বাহাদুর।" মানস শুধরে দিয়ে বলে, "স্কচ নয়, স্কট্স।" যেমন আসামী নয়, অসমীয়া। উড়ে নয়, ওড়িয়া।"

'ওঃ তাই নাকি?" রায় বাহাদুর জিব কেটে বলেন, "তা হলে তো ম্যাক্‌ফারসনকে আমি না জেনে অপমান করেজিলুম। ঢাকায় যখন উনি জেলা জজ তখন আমি সাব-জজ। অমন অমায়িক ভদ্রলোক আমি দেখিনি। হিন্দু আইন নিয়ে খটকা বাধলে আমার চেম্বারে ছুটে আসতেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি হয়েই আমাকে ডেকে পাঠান। বলেন, আমার অধীনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হতে আপনার আপত্তি আছে? শুনুন কথা। ন্যাড়াকে বলছেন, ন্যাড়া, পরমান্ন খাবি? ন্যাড়া বলছে, আঁচাব কোথায়? সাহেবের আগ্রহ দেখে আমি দর হাঁকি, আমার নিচে যাঁদের স্থান তাঁরা প্রমোশন পেয়ে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্‌ট জজ হবেন, আর আমিই কিনা সময়ে সুযোগ পাব না। একেই কি বলে ব্রিটিশ জাস্টিস? সাহেব মুচকি হেসে বলেন, আমি থাকতে আপনাকে সুপারসীড করে কার সাধ্যি! এর মানে তখন বুঝতে পারিনি, মিস্টার মল্লিক। ম্যাক্‌ফারসন কিছুদিন বাদে হাইকোর্টের জজ হয়ে যান। তখন আমি গিয়ে অভিনন্দন জানাই। তখন কী বলেন, শুনবেন? বলেন, আপনার জন্যে আমি যা করার করেছি। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। সত্যি, অমন ভালো মানুষ আর দেখা যায় না। অ্যাডিশনাল না হয়ে সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট জজ। বছর না ঘুরতেই রায় বাহাদুর। সাহেবই প্রথম অভিনন্দন জানান। লেখেন, হিন্দু আইন তো আমি আপনার সৌজন্যেই শিখেছি। শুনুন কথা। আমি নিজে কতটুকু বা জানি! হিন্দু আইন যে অনন্ত পারাবার।" রায় বাহাদুর থামেন।

"আমাকেও দেখছি আপনার কাছে পাঠ নিতে হবে, রায় বাহাদুর। যদি আপনার অবসর থাকে।" মানস সবিনয়ে বলে।

"ঢালা নিমন্ত্রণ রইল। যখন খুশি শুভাগমন করবেন। তবে আইনচর্চায় আজকাল আমার মন নেই। এখন আমার ইহলোকের পাট গুটিয়ে নেবার সময়। যেদিন ডাক আসবে সেদিন যেন বকেয়া পাট কিছু না থাকে। দারাসুত কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে এই

সংসার। মনে হবে এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলুম। মা বলতেন এটা মায়ার সংসার। কেউ কারো নয়। সেই কথাই মনে পড়ছে আজকাল। মা অনেকদিন আগে চলে গেছেন। কোথায় আছেন জানিনে। কে জানে হয়তো পরলোকে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কিংবা পরজন্মে আবার তাঁর কোলে জন্মাব। বুঝতে পারছি এটাও একপ্রকার মায়ার বন্ধন। কে কার মা, কে কার ছেলে! শঙ্করাচার্য বলে গেছেন কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। আগে তাঁকে মায়াবাদী বলে আমল দিইনি। এখন মনে হচ্ছে তিনি সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। আমিও একটু একটু করে উপলব্ধি করছি।" রায় বাহাদুর বিমনা হন।

মানস নীরব হয়ে ভাবে। তার পরে বলে, "আপনি আমি থাকি না থাকি মানব জাতি থাকবেই। মানবজাতি থাক না থাক প্রাণীলোক থাকবেই। প্রাণীলোক থাক না থাক নক্ষত্রলোক থাকবেই। নক্ষত্রলোক থাক না থাক স্পেস টাইম থাকবেই। স্পেস টাইম যদি থাকে বিবর্তন বন্ধ থাকবে না। জড় থেকে আবার বিবর্তিত হবে জীব, জীব থেকে মানুষ বা মানুষের মতো বা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সত্তা। এইপর্যন্ত আমি বুঝি। এইপর্যন্ত আমি নিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি স্পেস টাইমের বাইরে চলে যাই তা হলে আমি আদৌ থাকব কি না, থাকলে আবার স্পেস টাইমের ভিতরে ফিরে আসব কি না এর উত্তর আমি জানিনে। এক্ষেত্রে যুক্তির নয়, বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। আর সে বিশ্বাসও ভিত্তিহীন নয়। ইনটুইশনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ইনটুইশন আমাকে বলছে যে আমি স্পেস টাইমের ভিতরেও যেমন আছি বাইরেও তেমনি আছি। আছি এই মুহূর্তেই। থাকব পরের মুহূর্তেও। মাঝখানে ছেদ পড়বে না, পড়তে পারে না। মৃত্যুও ছেদ ঘটাবে না, ঘটাতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর পরে কী, কোথায়, কোন্ রূপে, কোন্ নামে, কোন্ লোকে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি, যাঁরা পেয়েছেন ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের কথার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাঁরাই যে শেষ কথা বলে গেছেন তা নয়। সামনে রয়েছে আরো শত শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর। মানুষ জাতটাই যদি আত্মঘাতী না হয় তবে আরো কত মুনি ঋষি সাধু সন্ত বুদ্ধ জিন প্রোফেট জন্মাবেন। তাঁদের বাণীও লিপিবদ্ধ হয়ে মানুষের এইসব প্রশ্নের উত্তর জোগাবে।"

"কিন্তু আমার সামনে তো শত শত বৎসর নেই, সহস্র সহস্র বৎসর তো

দূরের কথা। বড়ো জোর দশ বছর। মানুষের পরমায়ুর বাইবেল নির্দিষ্ট সীমা। অনাগতদের অজানা উত্তর শোনার বা পড়ার সৌভাগ্য আমার হবে না। সামনের পাঁচ দশ বছরে নতুন আর কী শুনব বা পড়ব ! আপনারা মানবিকবাদী, মানুষের কাছে আপনাদের অফুরন্ত প্রত্যাশা। বিজ্ঞানের দিক থেকে, রাজনীতির দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে, সমাজনীতির দিক থেকে সে প্রত্যাশা সত্যিই অপরিসীম। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে মানুষ আর একটি পা-ও এগোতে পারবে বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে যেসব মহাপুরুষ জন্মাবেন তাঁরা পূর্ববর্তীদের উত্তরবর্তী। পূর্বতনের যে অংশটা পুরাতন সেটাকে তাঁরা নতুন রূপ দেবেন, কিন্তু যে অংশটা চিরন্তন বা সনাতন সেটার হেরফের কী করে সম্ভব ? ইটারনাল ভেরিটি তিন হাজার বছর আগে যেমন ইটারনাল ছিল আজও তেমনি ইটারনাল, তিন হাজার বছর পরেও তেমনি ইটারনাল থাকবে। সত্য আর অহিংসা, প্রেম আর সৌন্দর্য, ক্ষমা আর করুণা, মোহ আর নির্বাণ, শৈলশিখরে যীশুকথিত beatitude, এসব হলো চিরন্তন বা চিরনূতন। পরে যাঁরাই আসবেন তাঁরাই এইসব কথা বলবেন। নতুন করে বলবেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সত্যিকার নূতনত্ব আমি প্রত্যাশা করিনে, মিস্টার মল্লিক, তবে চিরন্তনত্ব নব নব উন্মেষ লাভ করতে পারে।' রায় বাহাদুর বিশ্বাস করেন।

পুরাতন আর নূতন ছাড়া আরো একটি 'তন' আছে। চিরন্তন। মানসও এটা জানত ও মানত। তাই তর্ক করে না। শুধু যোগ করে, নৈতিকতার দিক থেকে প্রগতির প্রয়োজন আছে, রায় বাহাদুর। সামাজিক ন্যায় রুশদেশে বিপ্লব ডেকে এনেছে। বিপ্লবের ভয়ে জার্মানরা যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে। গত শতাব্দীতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ক্রীতদাসদের প্রতি সামাজিক ন্যায়ের প্রয়োজনেই হয়েছিল। ভারতের ঘরেও সামাজিক অন্যায় প্রতিকারের জন্যে কাঁদছে। একদিন গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে অধ্যাত্মচর্চা করতে পারি ? সুখের বিষয় মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে সজাগ ও সক্রিয়। নিছক রাজনৈতিক মুক্তি তাঁর অভিষ্ট নয়।"

"একথা মানতেই হবে যে আমরা হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতাকে যত উচ্চে স্থান দিয়েছি নৈতিকতাকে তত উচ্চে নয়। মহাত্মা গান্ধীকে সেইজন্যেই আমি বুদ্ধ ও যীশুর সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু সমাজের বাইরে সঙ্ঘ বা চার্চ গঠন করা এক জিনিস আর সমাজব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত রূপ দেওয়া আরেক জিনিস।

যাদের হাতে শস্ত্র, যাদের হাতে শাস্ত্র আর যাদের হাতে উৎপাদনের উপায় তারাই দেশে দেশে যুগে যুগে সমাজের ব্যবস্থাপনা করেছে। নীতিবিদ্‌দের কথায় কান দেয়নি। তাঁরা তাঁদের মঠবাড়ীতে বসে জপতপ করেছেন ও তাঁদের গৃহীশিষ্যদের দৃষ্টি ইহলোকের থেকে পরলোকের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর ইহকালের থেকে পরকালের দিকে। কার্ল মার্কস এসে ভরসা দেন যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এই জগতেই ও এই জন্মেই সম্ভব। কিন্তু তাঁর শিষ্যরাও দেখছি শস্ত্রব্রত ও শাস্ত্রব্রত, ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ। তফাতের মধ্যে এই যে তাঁদের সমাজে বৈশ্য নেই, উৎপাদনের উপায় বৈশ্যদের হাতে নেই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি অন্য নামে থেকে যান তবে শূদ্রদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবেন।" রায় বাহাদুর সন্দেহ করেন।

"কিন্তু গান্ধীজী তো শস্ত্র বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করছেন না। সঙ্ঘ গঠনেও তাঁর অনিচ্ছা। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ নিজের হাতেই একরকম ভেঙে দিয়েছেন। কংগ্রেসকেও তিনি স্বাধীনতা অর্জনের বাহন হিসাবে দেখেছেন, সামাজিক ন্যায় সংস্থাপনের বাহন হিসাবে নয়। তা হলে তাঁর শক্ত ঘাঁটি কোথায়? ওই সেবাগ্রামের আশ্রম?" মানস ভেবে পায় না।

রায় বাহাদুর এর উত্তরে বলেন, "কেন? বিড়লা আর বাজাজ? ভারতের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়? এঁরা স্বোপার্জিত ধনের ট্রাস্টী হবেন। তা হলে রাশিয়ার মতো এঁদের নিকেশ করতে হবে না। দেখুন, মিস্টার মল্লিক, গান্ধীজীর মতবাদ যত মহৎ হোক না কেন তিনি ডাইনীর হাতে তাঁর শিশুকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছেন। ধনিকরা কখনো ট্রাস্টী হতে পারে না। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, ওয়াকফ সব কিছুই আমি দেখেছি। সেসবও তো ট্রাস্টীদের হাতে সঁপে দেওয়া সম্পত্তি। যে যার নিজের বংশের কোলে ঝোল টানে। আদালত না থাকলে কারো কাছে জবাবদিহির দায় থাকত না। গান্ধীজী তো আবার আদালত পছন্দ করেন না, পুলিশ পছন্দ করেন না, জেল পছন্দ করেন না। শুধুমাত্র ব্যক্তির মহত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া ও মাঝে মাঝে তার শোষণের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা এভাবে কি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে? রাশিয়ায় দেখছি নিউ সোশিয়াল অর্ডার হয়েছে, কিন্তু সেটা নিউ মরাল অর্ডার নয়। নিউ মরাল অর্ডার না হলে ওর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। স্বাধীনতার পরে আমাদের নেতারাও যেটা গড়বেন সেটা যদি ধনিকদের মহত্বনির্ভর হয় তো সেটাকেও আমি মরাল অর্ডার বলতে পারব না। ব্রিটিশ সরকারও তো দাবী করেন

যে তাঁরা ভারতীয় প্রজাদের ট্রাস্টী। তাঁদের সেই হাতীর খোরাক জোগাতে গিয়ে ভারতের জনগণ নিঃস্ব। আর সেটার প্রতিকার করতেই তো গান্ধীজীর অভিযান। বিদেশী ট্রাস্টীরা থাকবে না, কিন্তু স্বদেশী ট্রাস্টীরাতো থাকবেন। তাঁরা থাকতে সেটা নিউ সোশিয়াল অর্ডার হতে পারে কি? মহাত্মার কাছে এই হবে আমার প্রশ্ন। না, এই মুহূর্তে নয়। স্বরাজের পরে। যদি স্বরাজের পর তিনি ও আমি বেঁচে থাকি।" রায় বাহাদুর অতটা নিশ্চিত নন।

"থাকবেন, থাকবেন, বেঁচে থাকবেন।" মানস আশ্বাস দেয়। সে বিলেত থেকে দত্তবিশ্বাসের চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছে চার্চিলের মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য এখন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে তাঁর উপর চাপ দিচ্ছেন। রাশিয়ার জন্যে লড়তে হলে ভারতের সঙ্গে মিটমাট শ্রেয়। নইলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও লড়তে হবে। তার মানে আরো একটা ফ্রণ্টে।

বিলেত থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায়নি, বিলম্বিত হয়েছে। দত্তবিশ্বাস কালে ভদ্রে লেখে। লেখে মানসকে। আর মিলিও যে সম্পূর্ণ নীরব তা নয়। যুথিকাকে নিজের ঘরসংসারের খবর জানায় ও তার ছেলে-মেয়ের কুশল জানতে চায়।

দত্তবিশ্বাস আজকাল ভারত থেকে বইয়ের অর্ডার পায় না বলে দোকানটা বিক্রী করে দিয়েছে। যুদ্ধের মরসুমে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে একটা গণ্যমান্য পদ তদ্বিরের জোরে জোগাড় করে নিয়েছে। পোশাক তো তার বরাবরই নিখুঁত ছিল, চোদ্দ বছর বিলেতে বাস করে সে তার ইংরেজী উচ্চারণটাকেও সাহেবদের মতো করেছে। বি. বি সি. ওটার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। কর্মসূত্রে বহু পদস্থ ইংরেজের সঙ্গে তার মেলামেশা। সাধারণত মদের গেলাসের উপরে। এ ছাড়া লেবার পার্টির পার্লামেণ্ট সদস্যদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গেও তার দীর্ঘ-কালের বন্ধুতা।

"মাই ডিয়ার মালিক," ইংরেজীতে লিখেছে দত্তবিশ্বাস, "বেশীর ভাগ ইংরেজই এখন ভারতীয়দের সঙ্গে মিটমাট করতে ব্যগ্র। কিন্তু স্বাধীনতা মানে কি দায়িত্বহীনতা? যে দেশ স্বাধীনতা পাবে সে কি তার সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে? যুদ্ধ যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন যুদ্ধের দায়িত্বও স্বীকার করতে হবে। যেমন ব্রিটেনকে তেমনি ভারতকে। ফ্রান্সের মতো বেইমানী

করলে চলবে না। ফরাসীরা তাদের আধখানা দেশ জার্মানদের ছেড়ে দিয়েছে। বাকী আধখানায় তাঁবেদার সরকার গঠন করেছে। ভারতীয়রা যদি তেমন কিছু করে তো সর্বনাশ। ইণ্ডিয়া অফিস সন্দেহ করছে যে কংগ্রেস নেতাদের একভাগ শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবার স্বাধীনতা হাতে রাখতে চান। গান্ধীজীর ঝোঁকটাও শান্তির জন্যে সন্ধির দিকে। যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত বলে তিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে নারাজ। তাঁর যেমন অসামান্য প্রভাব তিনি সরে দাঁড়ালে নেহরুও সরে দাঁড়াবেন। ভিতরে ভিতরে অনেকেই যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে রাজী। কিন্তু গান্ধী যদি বলেন, 'না', তা হলে সকলেই বলবেন, 'না'। একজন কি তু'জন বাদে। কংগ্রেসের সঙ্গে যদি মিটমাট না হয় তো লীগের সঙ্গেই বা মিটমাট হবে কী করে? মেজরিটিকে বাদ দিয়ে মাইনরিটির সঙ্গে মিটমাট হয় না। কিন্তু মেজরিটির সঙ্গে মিটমাট যেদিন হবে সেদিন মাইনরিটির সঙ্গেও মিটমাট হওয়া চাই। মাইনরিটিকে বাদ দিয়ে মেজরিটির সঙ্গেও মিটমাট হয় না। বিশেষ করে সে মাইনরিটি যখন ইণ্ডিয়ান আর্মির শতকরা চল্লিশ জন। আমি মুসলমানদের কথাই বলছি। শিখদের জড়ালে শতকরা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যায়। ওরা সবাই লড়তে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ওদের স্বার্থ বলি দিলে ওরা লড়বে কেন? আর ওরা যদি না লড়ে তবে আফ্রিকায় আর পশ্চিম এশিয়ায় শত্রুপক্ষই জিতবে। এর পরে জাপান যদি যুদ্ধে নামে তা হলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও শত্রুপক্ষের জিৎ। অন্ধ গান্ধীভক্তদের এসব বোঝায় কে?"

এর উত্তরে মানস লেখে সুকুমারকে, "বোঝাবেন তিনিই যিনি রাশিয়ায় গিয়ে স্টালিনকে বুঝিয়েছেন। তার মানে সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স। ক্রিপ্‌স যদি ভারতকেও রাশিয়ার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দেন তা হলে তাঁকে একবার এদেশে পদার্পণ করতে হয়। তার আগে গান্ধীজীর সহকর্মীদের জেল থেকে খালাস হওয়া চাই। নইলে তিনি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কী করে? হাজার হোক, গান্ধীজী একজন গণতান্ত্রিক নেতা। যুদ্ধকালে চার্চিল যেদিকে যান সকলেই সেদিকে যান। তেমনি সত্যাগ্রহকালে গান্ধীজী যেদিকে যান সকলেই সেদিকে যান। সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। কংগ্রেস নেতারা সত্যাগ্রহ করতে চাননি। গান্ধীজীও তাঁদের যতদিন সম্ভব নিরস্ত করেছেন। যুদ্ধকালে মিটমাট হবে না শুনেই ওঁরা সিভিল লিবার্টির দাবীতে সত্যাগ্রহে নেমেছেন। মিটমাট যদি যুদ্ধকালে না হয় তো কোনো কালেই হবে না।

যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি আরো নিরঙ্কুশ হবে। এটাই কংগ্রেস মহলের ধারণা। যুদ্ধবিগ্রহ কি কেবল সৈনিকদের নিয়েই হয়? সারা ভারতে অসামরিক জনগণকে অনাহারে রেখে, অর্ধনগ্ন রেখে, যুদ্ধ জয় করতে গেলে যা হয় তা গত মহাযুদ্ধের সময় জার-শাসিত রাশিয়ায় দেখা গেছে। তার নাম বিপ্লব। ভারতের অসামরিক জনগণকে বিপ্লবের মুখে ঠেলে দেওয়াটা অন্ধ চার্চিল ভক্তদের অদূরদর্শিতা। বিপ্লব একবার আরম্ভ হয়ে গেলে গান্ধীজীরও আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। কংগ্রেসেরও না। সুতরাং সময় থাকতে তাঁদের ভূমিকা তাঁরা সেরে রাখছেন। মাইনরিটির ধুয়ো তুলে ব্রিটেনের রক্ষণশীলরা যত বেশী কালহরণ করবেন তত বেশী অনুতাপ করবেন। তখন তাঁদের সরাসরি মুখোমুখি হতে হবে সহিংস বিপ্লবীদের। মাঝখানে গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীরা থাকবেন না। জিন্না ও মুসলিম লীগ থাকতে পারে. কিন্তু বিপ্লবের তোড়ে তাদেরও ভেসে যেতে কতক্ষণ!"

মানস জানত যে চার্চিলকে কেউ এসব কথা বোঝাতে পারবে না। তিনি ভারতীয় জনমতকে গ্রাহ্যই করেন না। সৈন্য সামন্ত পেতে অসুবিধে না হলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তবু ইংলণ্ডের জনমতের উপরে তার ভরসা ছিল। সেদেশের জনমত অনড় অচল নয়। তার প্রমাণ গান্ধী-আরউইন প্যাকৃট। সেই নজীরে একদিন গান্ধী-লিনলিথগো প্যাকৃটও সম্ভবপর। মানস আশাবাদী।

ওদিকে যূথিকাকে লিখেছিল মধুমালতী, "গত শরৎকালের ব্যাটল অভ ব্রিটেনে ইংরেজ জাতির সাহস, শৃঙ্খলা ও মনোবল প্রত্যক্ষ করে আমি উপলব্ধি করেছি যে ওরা অপরাজেয়! এ যুদ্ধের ফলাফল আর যাই হোক ব্রিটেনের পতন নয়। ফ্রান্সের সঙ্গে এইখানেই এদের তফাৎ। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স। এ কা তার পরিণাম। তা হলে আমাদের দেশের বিপ্লবীদের কী আশা! যাক, যুদ্ধটা তো আগে শেষ হোক, তার পর দেশে ফিরে গিয়ে ভাবা যাবে। ইতিমধ্যে আমি পড়ে গেছি একটু মুশকিলে। আমার ধারণা ছিল এদেশে কেউ আমাকে চেনে না। আমি অপরিচিতা। কিন্তু আমাদের সেই সার জন অ্যাণ্ডারসন এখন এখানকার হোম সেক্রেটারি। সবাই জেনে গেছে তাঁর আমলে আমি ছিলুম বেঙ্গল টেররিস্ট। ভারতফের্তা ইংরেজ সাহেব মেমরা আমাকে ও আমার কর্তাকে নিমন্ত্রণ করে দেশী বিলিতী খানা খাওয়ান। আর একান্তে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস?' আমি তো প্রথমটা ধরতেই পারিনি যে চন্দ্র বোস হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বোস। আমার কর্তা

আমাকে বুঝিয়ে দেন যে ইংরেজদের কাছে দ্বিতীয় নামটাই প্রথমটার চেয়ে প্রধান। ওদের নিজেদের বেলা ওরা তাই করে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিই কী করে? আমি কি সবজান্তা? 'জানিনে' বললে ওরা বিশ্বাস করবে না। ওদের ধারণা বোস এখন জার্মানীতে। আমি বলি, সেটা কেমন করে সম্ভব? যুদ্ধকালে কি কেউ ভারত থেকে বাইরে কোথাও যেতে পারে? চারদিকে কড়া পাহারা। জলপথে অসম্ভব, আকাশপথে অসম্ভব। স্থলপথ বলতে তো খাইবার পাস। পাঠান ছাড়া সে পথে কেউ যাওয়া আসা করতে পারে না। চন্দ্র বোস কি পাঠানের মতো দেখতে? তাঁর কোথায় দাড়ি, কোথায় গোঁফ? কোথায় পাঠানের মতো পোশাক? গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে খাইবার পাস ভেদ করা শিবের অসাধ্য। তা সত্ত্বেও আমাকে বাড়ী বয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস? আমি বলি, জানিনে। জানলেও আমি বলতুম না। তোমরা যেমন তোমাদের দেশকে ভালোবাস আমরাও তেমনি আমাদের দেশকে ভালোবাসি। চন্দ্র বোস যদি জার্মানীতে গিয়েই থাকেন তবে জার্মানদের স্বার্থে নয়, পরাধীন স্বদেশবাসীদের স্বার্থে। আমিও পালটা সুধাই, জেনারল দ্য গল কী করতে এদেশে এসেছেন? পরাধীন ফ্রান্সকে মুক্ত করতে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কী করতে ফ্রান্সে গেছলেন? পরাধীন উপনিবেশকে স্বাধীন করতে। অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। ওদের মুখ চূণ। তবে আমি সত্যি জানিনে সুভাষদা এখন কোথায়? শুনছি নিরুদ্দেশ।"

যুথিকাও জানে না। জানলেও লিখত না। কে জানে কার হাতে পড়ত! মানসকে জিজ্ঞাসা করে, "হোয়্যার ইজ চন্দ্র বোস?"

মানস বলে, "হিমালয়ের কোনো এক দুর্গম গুহায় অজ্ঞাতবাস করছেন। পুলিশ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে হদ্দ হয়ে গেছে। কড়া সেনসরশিপ। যারা জানে তারাও প্রকাশ করে না। ওটা এখন একটা মিলিটারি সীক্রেট।"

ও চিঠি ছিল হিটলারের রুশ অভিযানের আগেকার। এর পর মিলি লেখে, "বৌদি, অলৌকিক ঘটনার যুগ যায়নি। অঘটন আজো ঘটে। নাৎসীরা যে কমিউনিস্টদের নিজের রাজ্যে হানা দেবে এটা তেমন চমক লাগাবার মতো ঘটনা নয়, অসময়ে ঘটেছে এই যা আশ্চর্য। কিন্তু কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে রুশ বিপ্লবকে যিনি আঁতুড়ে গলা টিপে মারতে অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবীদের পাঠিয়েছিলেন তিনিই এখন তাকে রক্ষা করার জন্যে

মিতালি পাতিয়েছেন তাঁর পরম বৈরী স্টালিনের সঙ্গে ? হ্যাঁ, বৌদি, সেই চার্চিলই আজ এই চার্চিল। আমরা সবাই হকচকিয়ে গেছি। আমার কর্তা তো কতরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু একবারও বলেননি যে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলরা রাশিয়ার বিপ্লবীদের জিতিয়ে দেবে। নাটের গুরু হবেন কিনা চার্চিল স্বয়ং। কোথায় শ্রেণীসংগ্রাম ! শ্রেণীশত্রুই এখন শ্রেণীমিত্র ! মার্কসবাদীদের মুখ চূণ। কনসারভেটিভরাও এখন সোভিয়েটদরদী। রাজনীতি চিরদিনই রাজনীতি। ওর মধ্যে নীতির সন্ধান যেন অন্ধকার ঘরে কালো বেড়ালের সন্ধান, যে বেড়াল সেখানে নেই। আমি তাজ্জব বনে গেছি। অহিংসাবাদী না হলেও আমি ছিলুম নীতিনিষ্ঠ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় মার্কসবাদ হয়তো জয়ী হবে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনও তো আসবে। তখন দেখবে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী সেজে বসে আছে।”

মিলি আরো লিখেছে “সাধারণ ইংরেজ এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। হিটলার যদি স্টালিনকে হারিয়ে দেনও তবু এত বেশী বলক্ষয় করবেন যে তার পরে আর ইংরেজের সঙ্গে বলপরীক্ষায় নামবেন না। ততদিনে ইংরেজের বিমানশক্তি তার নৌশক্তির মতো দুর্বার হয়ে থাকবে। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে জার্মানীর সব ক'টা শহরকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ছাড়বে। ওদের এয়ারফোর্সে এখন বাঙালী যুবকদেরও নিচ্ছে। যারা এদেশে পড়াশুনা করেছে তাদের কয়েকজন এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়ে সমান ব্যবহার পাচ্ছে। ওদের যোগ্যতার জোরে ওদের যদি পদোন্নতি হয় তা হলে ওরা হবে ওদের অধীনস্থ ইংরেজ ক্যাডেটদের উপরওয়ালা। আর কেউ বলতে পারবে না যে বাঙালীরা অসামরিক জাতি। সেই অপমানের প্রতিবাদেই না সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। তবে কাজটা ভীষণ বিপজ্জনক। এর মধ্যেই একটি সোনার চাঁদ ছেলে প্রাণ হারিয়েছে। ওর মা ওকে বারো বছর বয়স থেকে বিলেতে এনে মানুষ করেছিলেন। একমাত্র সন্তান। ওঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। দিনরাত ঠাকুরঘরে বসে প্রার্থনা করছেন। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। সরকার থেকে একটা মেডেল পাঠিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধের ডেস্‌পাচে সুপর্ণ হাজরার বীরত্বের সম্মানসূচক উল্লেখ আছে। বেঁচে থাকলে সুপর্ণ একদিন এয়ার মার্শল হয়ে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করত। বাঙালীর কেন বলছি, ভারতীয়ের। এদেশে আমরা সবই ইণ্ডিয়ান।”

এ চিঠি পড়ে যূথিকা কেঁদে আকুল। বিদেশে বিভুঁইয়ে অপঘাতে মারা

গেল ছেলেটি। আহা রে! ওর মা বাবা কেমন করে প্রাণ ধরে সহ্য করবেন!

"ছেলেটিকে আমি দেখেছি।" মানস বলে, "আমার বোর্ডিং হাউসেই ওঁরা তিনজনে এসে ওঠেন। বাবা আই. এম. এস. অফিসার। ছুটির শেষে দেশে ফেরেন। ছেলে ভর্তি হয় এক নামকরা প্রাইভেট স্কুলে। মা কাছাকাছি বাসা নেন। আমিও বাসাবদল করি। দিব্যি সপ্রতিভ ছেলে। ওই বয়সেই বন্দুক চালাতে শিখেছে। কী করা যায়, বলো! যুদ্ধ মানেই প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলা। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন দেখবে তোমার ছেলেকেও দরকার হলে কনস্ক্রিপ্ট করবে। স্বাধীনতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটা স্বাধীন জাতিকে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হয় তা তো ইউরোপে গিয়ে দেখেছি। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের প্রত্যেকটি কলেজে উৎকীর্ণ রয়েছে সেইসব সোনার চাঁদ ছেলের নাম যারা যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। তাদের জন্যে যারা অপেক্ষা করছিল সেইসব মেয়েদের আর বর জোটেনি। জুটবেও না। তারা চিরকুমারী হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে। আলাপও হলো তেমন কয়েকজনের সঙ্গে। একদিক থেকে যেমন ওদের ক্ষতি হলো তেমনি আরেকদিক থেকে লাভ। মেয়েদের জন্যে অনেকগুলি বন্ধ দরজা খুলে গেছে। আফিসে আদালতে কলকারখানায় স্কুল কলেজে সর্বত্র ওদের দেখতে পাওয়া যায়। পার্লামেন্টেও। ক্যাবিনেটেও। তবে আর্মি নেভী এয়ার ফোর্সে ওদের প্রবেশ নিষেধ। সিভিল সার্ভিসের উচ্চতম পর্যায়েও তাই। অক্সফোর্ড কেমব্রিজে মেয়েদের জন্যে আলাদা কলেজ। সাধারণ কলেজে ঢুকতে দেয় না। কারণ কলেজমাত্রই রেসিডেনশিয়াল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানেও মেয়েরা চড়াও হবে।" মানস মুচকি হাসে।

যূথিকা শিউরে ওঠে। "না, না, অত বেশী অবাধ স্বাধীনতা ভালো নয়। ছেলেদের হস্টেলে মেয়ে! মেয়েদেব হস্টেলে ছেলে! ভাবতে পারা যায় এর জের কতদূর গড়াবে? এর ফল কী হবে?"

মানস কৌতুক করে বলে, "ফল কিছুই হবে না। বার্থ কন্ট্রোল আজকাল কারো অজানা নয়। আর ফল হলেই বা কী? ওদেশের সমাজ আগের চেয়ে উদার হয়েছে। এর পর আরো উদার হবে। তুমি কি জানতে যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন কুন্তীপুত্র? তাতে তাঁর রাজ্যলাভ আটকায়নি। তাঁর স্ত্রীভাগ্যও ছিল ঈর্ষার বিষয়। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন গ্ল্যাডস্টোন বংশের কন্যা।"

যুথিকা উদার হলেও অত বেশী উদার হতে অনিচ্ছুক। তার মধ্যে মাতৃ-মাতামহীর সংস্কার যথেষ্ট সক্রিয়। বলে, "ছেলেদের সাত খুন মাফ বলে মেয়েদেরও সাত খুন মাফ, এটা ওদেশের সমাজ মেনে নিলেও এদেশের সমাজ মেনে নেবে না। ছেলেদের কী? মেয়েরাই পশতাবে। সব দরজা খুলে যাচ্ছে, যাক। খুলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তুমিই তো বলেছ, স্বাধীনতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যারা স্বাধীনা হবে তারা দায়িত্বশীলাও হবে। সন্তানের দায়িত্ব নেবে না, এমন কথা যদি কোনো মেয়ে ভাবে তবে সে কোনোদিন মা হবার আনন্দ পাবে না। সে হয়তো এবেলা আফিস করবে, ওবেলা পার্টিতে যাবে, যখন খুশি দেশে বিদেশে ঘুরবে। কিন্তু তার কোল শূন্য। তার দোলনা শূন্য। তার নার্সারি শূন্য। তার জীবন অপূর্ণ।"

মানসের মনে পড়ে স্বপনদা একবার চার্লস ল্যাম্বের 'ড্রিম চিলড্রেন' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। "The children of Alice call Rertram their father."

"স্বপনদার জীবনটাও চার্লস ল্যাম্বের মতো অপূর্ণ থেকে যেতে পারে।" মানস আক্ষেপ করে।

"কেন? কেন?" যুথিকা জানতে উৎসুক হয়।

"কারণ ওকে বাবা বলবার মতো কেউ নেই।" মানস উত্তর দেয়।

## ॥ সাত ॥

পুজোর ছুটিতে মানস কলকাতায় যায় ও স্বপনদার অতিথি হয়। এবার আলাপ হয় দীপিকা বৌদির সঙ্গে। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আরো একজন আলাপ করতে আগুয়ান হয়। "এল্‌ফ" নাম শুনে মানসের মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার ইংরেজী প্রাইমারের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছবি। একটি কুকুর। তার মুখে একটা ছাতা।

"এ নাম আপনি কোথায় পেলেন, বৌদি?" মানস জানতে চায়।

"আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ নামটা আপনার চেনা। আগে তো শুনি আপনি কোথায় চিনলেন।" বৌদি ধরাছোঁয়া দেন না।

"আমার চেনা এল্‌ফের মুখে ছিল একটা ছাতা। নামে মিলছে। জাতে মিলছে না। না, জ্যান্ত কুকুর নয়, ছবির কুকুর,। বইখানার নাম বোধহয় রয়াল রীডার। স্পষ্ট মনে আছে ওকে। কিন্তু এ কুকুর সে কুকুর নয়।" মানস ঘাড় নাড়ে।

বৌদি হাসি চেপে বলেন, "সে কুকুর কি এতকাল বেঁচে থাকতে পারে! তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন। ও বই আমিও পড়েছি। ও নাম আমার মনে ছিল। তাই ওই নামই এই বাচ্চারও রাখি। ওটা ছিল বোধহয় টেরিয়ার। ফক্‌স টেরিয়ার। এটা হলো পোমেরানিয়ান। কিন্তু একে আমি ছাতা ধরাতে পারিনি। বিষম অবাধ্য।"

তা শুনে এল্‌ফ ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ ঘোষণা করে।

"ছাখ, মান্থ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল। এখন কুকুরকে ছেড়ে একটু মানুষের দিকে নজর দাও দেখি। তোমার স্মৃতিশক্তি কত প্রখর তার পরীক্ষা তুমি দিয়েছ। বোঝা যাচ্ছে তোমার বৌদি আর তুমি সমবয়সী।"

"তাই তো মনে হচ্ছে। তবে আমি এক বছর অসুখে ভুগে পেছিয়ে পড়েছিলুম। হয়তো সেই কারণে আমিই বয়সে বড়ো। যদিও সম্পর্কে তিনিই বড়ো। তা ছাড়া আমার স্কুলে ভর্তি হতেও বছরখানেক দেরি হয়েছিল।" মানস বিবৃত করে।

"এখন আমার কথাটা মন দিয়ে শোন দেখি।" স্বপনদা বিষয়ান্তরে যান।

"বলো, কী বলতে চাও।" মানস উৎকর্ণ!

"ক্যারামেলকে জেলখানায় দেখে এসেছি। ও মেয়ে কিছুতেই বাড়ী আসবে না। বলে, জেল থেকে মুক্তি অর্থহীন উক্তি। গোটা দেশটাই তো ইংরেজের জেল। ওরা একটা মশা কি মাছিকেও ভারতের বাইরে যেতে দেয় না। এমন কড়া পাহারা! শুনছি একমাত্র সুভাষদাই ওদের ছোট বড়ো ছু'রকম জেল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। তা আমি তো ওঁর মতো সন্ন্যাসিনী সেজে মহাপ্রস্থানের পথে নিখোঁজ হতে পারব না! ওঁকে নাকি শেষ দেখা গেছে বদরীনাথে। যত সব কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরি। সুভাষ আমার সহপাঠী। ওকে আমি ভালো করেই চিনি। যদিও ইদানীং যোগাযোগ ছিল না। ও এখন পুরোপুরি রাজনীতির লোক। ছাত্রবয়সে একবার সন্ন্যাসী হবার জন্যে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল শুনেছি। তা বলে ও সন্ন্যাসী নয়। দেশ যতদিন

না স্বাধীন হয়েছে ততদিন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। তার মানে আরো পনেরো বছর। যখন পলাশীর দ্বিশতবার্ষিকী ও সিপাইবিদ্রোহের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ইংরেজকে নড়ানো যাবে না। যদি না ইউরোপে ওরা ঘোরতর-ভাবে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্রোত যদি না ঘোরালো হয়।" স্বপনদা যতদূর বোঝেন।

মানস দুঃখিত হয় জুলির জন্যে। স্বামী নেই, সংসার নেই, দায়দায়িত্ব নেই। কিসের আকর্ষণে জেলের বাইরে আসতে চাইবে? আজকাল জেলটাও তো একটা ক্লাব। ভদ্রঘরের মহিলারাও সে ক্লাবের মেম্বর। তবু ওটা জেল, ওর চারদিকে বেষ্টনী।

"তুমি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও তো ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ও মেয়ে এই এল্‌ফের মতোই অবাধ্য।" স্বপনদা আফসোস করেন।

এল্‌ফ ততক্ষণে মানসের পায়ের কাছে গা এলিয়ে দিয়েছে। এবার শুধু ল্যাজ নেড়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। মানস তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। কী নরম লোম!

"আমার জেলা হলে আমি পদাধিকার বলে যেতুম। এখানে আমি পদাধিকারী নই। কোন্ সুবাদে যাব? তুমি যেতে পারো আসামীপক্ষের কৌঁসুলী পরিচয়ে। তা ছাড়া আরো কয়েকটা মাস সবুর করলে তো ওরা সবাই ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে।" মানস দত্তবিশ্বাসের উপর বিশ্বাস রেখে আভাস দেয়।

"কই, এমন কথা তো খবরের কাগজে লিখছে না?" স্বপনদা বিস্মিত হন।

"লিখছে আমার নিজস্ব সংবাদদাতা। লণ্ডন থেকে। ওখানকার নেতারা এখানকার নেতাদের সঙ্গে একটা আঁতাত করদিয়াল কামনা করেন। কথা-বার্তা চালাতে হলে তাঁদের জেল থেকে খালাস দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুচরদের। সেইসূত্রে আমাদের জুলিকেও। যার নাম রেখেছ ক্যারামেল।" মানস খোলসা করে।

"তা হলে তো আনন্দের বিষয়। কিন্তু আজকাল আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে সীনিক বনে গেছি। যেই শুনব ওদেশের নেতাদের সঙ্গে এদেশের নেতাদের আঁতাত করদিয়াল হয়েছে অমনি শুনব আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আত্ম-

প্রকাশ করেছেন বামপন্থী মহানায়ক সুভাষচন্দ্র। আবার তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দাঁড়াবেন। বাধা দিলে আর কাউকে দাঁড় করাবেন। আপসবিরোধী সংগ্রাম চালাবেন। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের খেদিয়ে কংগ্রেস ক্যাপচার করবে। তখন কোথায় থাকবে তোমার আঁতাত করদিয়াল? তা নয় তো কংগ্রেস ভেঙে দু'ভাগ হবে। একভাগ সরকারের পক্ষে, আরেকভাগ সরকারের বিপক্ষে। গান্ধীজী কি কংগ্রেসকে ভেঙে দু'ভাগ হতে দেবেন। দক্ষিণপন্থীদের বলবেন পদত্যাগ করে জেলে ফিরে যেতে। তখন বামপন্থীরাও ফিরে যাবেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

"তা হলে জুলি বেচারির কী আশা।" দীপিকাদি মুখ খোলেন।

"কিছুমাত্র না। ওর কপালে জেল কিংবা আণ্ডারগ্রাউণ্ড। ও তারজন্য প্রস্তুত। ওর চেয়ে ঢের বেশী প্র্যাকটিকাল বাবলী। যার নাম দিয়েছি চকোলেট। ও ভালো করেই বোঝে যে যুদ্ধ শেষ না হলে স্বাধীনতা হবে না। হতে পারে কেন্দ্রে রদবদল। সেটা স্বাধীনতা নয়। সেটার জন্যে জেলে যাওয়া নিরর্থক। আণ্ডারগ্রাউণ্ড তো আরো বিপজ্জনক। চকোলেট এখন ওর কমরেডদের নিয়ে কমিউন গঠনের কাজ হাতে নিয়েছে। ওরা কেউ বাড়ীতে থাকে না। থাকে ভাড়াটে বাসায়। বাইরে তার নাম সঙ্ঘ। ভিতরে তার নাম কমিউন। পুলিশ জানে। কিন্তু হস্তক্ষেপ করে না। ওরা তো শত্রুপক্ষের চর নয়, মিত্রপক্ষের লোক। চকোলেট মাঝে মাঝে আসে। তোমার বৌদির সঙ্গে ওঁর খুব ভাব। এল্‌ফকে আদর করে। চুমু খায়। বৌদি ওর হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন। চকোলেট কিনে খেতে। কথাবার্তা চোখে চোখে হয়।" স্বপনদা হাসেন।

"এসব গোপন কথা তুমি ফাঁস করছ কোন্ আক্কেলে? তোমার বন্ধু ঠাওরাবেন আমিও একজন কমিউনিস্ট। আমার কুকুরকে যে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি। তোমাকে বলেছি, লাভ্ মী, লাভ্ মাই ডগ। বাবলীকে বলেছি লাভ্ মাই ডগ, লাভ মী। ওটা ভালোবাসার পুরস্কার।" দীপিকাদিও হাসেন।

মানস তা শুনে এল্‌ফের কপালে একবার মুখ ছুঁইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তিনজনেই হেসে ওঠে। আর এল্‌ফ ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে।

স্বপনদা বলেন, "জানো তো, চকোলেটের সঙ্গে ক্যারামেলের ছাড়াছাড়ি

হয়ে গেছে। ক্যারামেল চকোলেটকে বলে স্টালিনের স্পাই। চকোলেট ক্যারামেলকে বলে হিটলারের স্পাই।"

মানস গভীর বেদনা বোধ করে। বলে, "এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে! কোথায় হিটলার আর স্টালিন! কোথায় বাবলী আর জুলি! ওরা লড়াই করে মরছে বলে এরাও লড়াই করে মরবে!"

"না, না, মরবে না।" স্বপনদা অভয় দেন। "আমার কাছে আসবে। চকোলেট আর ক্যারামেল খাবে। ক্যারামেল কখনো হিটলারের চর হতে পারে না। সে তার স্বদেশকে ভালোবাসে। চকোলেটও কখনো স্টালিনের চর হতে পারে না। সে তো দেশের জন্যে সাহেব মেরে ফাঁসী যেতে তৈরি হয়েছিল। মুশকিল হয়েছে এই যে বামপন্থীদের দুই গোষ্ঠীর দুই বিপরীত পলিসি। এক গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অসহযোগ করবে। আরেক গোষ্ঠী রুশের স্বাধীনতার জন্যে ফাসিস্টবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। দেশের স্বাধীনতা আগে না রুশের স্বাধীনতা আগে? এই নিয়ে আড়াআড়ি।"

"আড়াআড়ি থেকে ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ি থেকে মারামারি।" মানস ভয় দেখায়। "ক্ষমতা হাতে পেলে একপক্ষ অপরপক্ষকে অংশ দেবে না। বিরোধিতা করলে জেলে পুরবে। সশস্ত্র বিরোধিতা করলে প্রাণে মারবে।"

স্বপনদার মনে পড়ে যায় বাবলী ওঁকে জানিয়েছিল জুলি নাকি ওকে শাসিয়েছে যে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীতে মারা হবে।

"ওটা নিছক তামাশা করে বলা। সীরিয়াস ভাবে নিতে নেই। চকোলেটকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। ক্যারামেলকেও ঠাণ্ডা করব।" স্বপনদা কথা দেন।

"কিন্তু ওদের গোষ্ঠীদের তুমি কী করে বোঝাবে? এ তো আরো একটা কুরুক্ষেত্রের সূচীমুখ। ইংরেজদের বিদায়ের পরে ফাল হয়ে বেরোবে। তখন তুমি জুলিকে বাঁচাতে পারবে না, বাবলীকেও না।" মানস শিউরে ওঠে।

"আরো একটা কুরুক্ষেত্র?" স্বপনদা জেরা করেন। "কোন্‌টার কথা ভেবে একথা বলছ, মানু?"

"কেন? হিন্দু মুসলমানের শরিকী দ্বন্দ্ব? কে না জানে সেটা চরমে উঠবে, যেদিন ইংরেজ বিদায় নেবে? যদি না ইতিমধ্যে একটা মিটমাট হয়। কিংবা সঙ্গে সঙ্গে।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"সেইজন্যেই তো আমি সহসা ইংরেজবিদায়ের পক্ষপাতী নই। আগে সব দিক সামলাও। তারপর ওদের বিদায় দাও। ওরা তো এতদিন সব দিক সামলেছে। কুরুক্ষেত্র বাধতে দেয়নি। যতদিন থাকবে, দেবেও না।" স্বপনদার দৃঢ় বিশ্বাস।

"সহসা ইংরেজবিদায় আমিও কি চাই?" মানস বলে, "কিন্তু সব দিক সামলানো পনেরো বছর পরেও সুগম হবে না, স্বপনদা। পলাশীর দ্বিশত-বার্ষিকীর দিন যদি ওরা বিদায় হয় তো সেইদিনই বাধবে শরিকী দ্বন্দ্ব থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যদি না ইতিমধ্যে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।"

"তা হলে সেটাই আমাদের নিয়তি। বছর পনেরোর মধ্যে যদি সমাধান না মেলে তবে কোনোদিনই মিলবে না। পনেরো বছরের পর একটা দিনও আমি অপেক্ষা করব না। কুরুক্ষেত্রের ঝুঁকি নেব।' স্বপনদার ধৈর্যেরও সীমা আছে।

"তোমার মতো কূর্ম অবতার আমি নই।" দীপিকাদি উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন। "যুদ্ধের সুযোগ নিতে যদি না চাও তো যুদ্ধের পরেই বিদায়ের নোটিশ দিয়ো। যুদ্ধ সারা হতে কি পনেরো বছর লাগবে?"

"ঐতিহাসিক নিয়তি বলে যদি কিছু থাকে তবে শতাব্দীর ছাপান্ন সাতান্ন সালই ভারতবর্ষের নিয়তিনির্ধারক। পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর আগে শাহজাহানের পুত্রদের শরিকী যুদ্ধ। তার একশো বছর আগে দ্বিতীয় পাণি-পথের যুদ্ধ।" স্বপনদা বিবরণ দেন। তার পরে যোগ করেন, "তেমনি পলাশীর একশো বছর পরে সিপাইবিদ্রোহ। তার একশো বছর বাদে ব্রিটেন থেকে রোমান অপসরণের মতো ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ অপসরণ।"

"তোমার ও থীসিসটি চমৎকার। তার জন্যে তোমাকে ডক্টোরেট দেওয়া উচিত।" উপহাস করেন দীপিকাদি। "কিন্তু তোমার ওই হিস্টারিক্যাল ডিটারমিনিজম যুক্তিনির্ভর নয়। এমনও হতে পারে যে এই যুদ্ধে রাশিয়ানদের হারিয়ে দিয়ে জার্মানরা ইরানের পথে ভারতে ঢুকবে। কিংবা জার্মানদের হারিয়ে দিয়ে রাশিয়ানরা ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করে আফগানিস্থান দিয়ে ভারতে ঢুকবে। সেটাও হবে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক আক্রমণগুলোর মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণ। তখন ইংরেজরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে ভারতরক্ষার দায় এড়াতে পারে। নয়তো তখন

ভারতীয়রাই ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভারতরক্ষার দায় বহন করতে পারে। এর জন্যে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হবে কেন? যা হবার তা সাত আট বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

স্বপনদা কোণঠাসা হয়ে মানসের দিকে তাকান। মানস বলে, "রাশিয়া ভারত আক্রমণ করবে না। তার দৃষ্টি পশ্চিমমুখী। পশ্চিমে রয়েছে আমেরিকা। আর জার্মানী? সে যখন ভারতের পথে তুরস্কে বা ইরানে পদার্পণ করবে তখন দেখবে ইংরেজরা ও ভারতীয়রা সেখানে গিয়ে বসে আছে। যেমন জাপানের পথরোধ করতে সিঙ্গাপুরে ও মালয়ে গিয়ে বসে আছে। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়। এদের সামনে খোলা রয়েছে কেবল ভারতের মানচিত্র নয় গোটা পৃথিবীর মানচিত্র। দাবাখেলার ছকের উপরে যে যার ঘুঁটি সাজিয়ে বসেছে। একপক্ষ চাল দিলে অপরপক্ষ পালটা চাল দিচ্ছে। আমরা সবটা দেখতে পাচ্ছিনে। কারণ আমরা কেবল স্বদেশের মানচিত্রই দেখছি। আর আমাদের দাবা খেলার ছক যুদ্ধের নয়, সত্যাগ্রহের।"

"বাঁচা গেল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ সুদূরপরাহত। তা হলে দীপিকার থীসিসটা কেঁচে যায়। ওকে কেউ ডক্টরেট দেবে না।" স্বপনদা পরিহাস করেন।

"তা বলে ইংরেজ রাজত্ব আরো পনেরো বছর! গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ততদিন বেঁচে থাকবেন!" দীপিকাদি অধীরতা প্রকাশ করেন।

"একটা নেশনের জীবনে পনেরো বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই বেঁচে না থাকতে পারেন, নেহরু, বোস, আজাদ বেঁচে থাকবেন। দেখতে হবে শাহ্ জাহানের পুত্রদের মতো শরিকী যুদ্ধ যাতে না বাধে। তা ছাড়া দু'শো বছরের একটা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতে যদি পনেরো বছর সময় লেগে যায় সেটা কি খুব বেশী সময়? তার কমে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা স্বাভাবিক। দক্ষিণ বামের অন্তর্দ্বন্দ্বটাও উপর থেকে তল পর্যন্ত ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে। কংগ্রেসের কি আর সেই সংহতি আছে? যাঁরা একজোট হয়ে একটা পার্টি চালাতে পারেন না তাঁরা একজোট হয়ে একটা মহাদেশ চালাবেন! রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ যত বড়ো একা ভারতবর্ষ তত বড়ো আর তত বিচিত্র। পনেরো বছরের মধ্যে যদি এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর না হয় তো হিন্দু মুসলিম গৃহযুদ্ধের মতো বাম দক্ষিণ গৃহযুদ্ধও অরাজকতা ডেকে

আনবে। পরাধীনতার পরিবর্তে অরাজকতা, স্বরাজ বলতে কি এই বোঝায়? বুঝলে, রাতু, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। ইংরেজ থাকতে সোয়াস্তি আছে। এখনো ওরা একটা বড়ো মাপের দুর্ভিক্ষ হতে দেয়নি। একটা বড়ো গোছের দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে দেয়নি। মাথা তুলতে দেয়নি দেশীয় রাজাদের। নাক গলাতে দেয়নি বাইরের শত্রুদের। ওদের ত্যক্ত সিংহাসনে যাঁরা বসবেন তাঁরা কি এসব কর্তব্য পালন করতে পারবেন? বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ভোজ-রাজের জন্যে নয়।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

পরের দিন স্বপনদা মানসকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, তুমিও কি কথায় কথায় বল না, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো? তোমার বৌ কি সেটা গায়ে পেতে নেয়, রাগ করে, খোঁটা দেয়, রাতে জাগিয়ে রাখে, সকাল না হতেই কুকুরকে বেড়াতে নিয়ে যায়? তা হলে শোন, বলি। তোমার বৌদির ধারণা তিনি আমাকে সুখী করেননি, শুধু সোয়াস্তি দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ তিনি তো বাঁশরি নন। আমি ওঁকে কী করে বোঝাই যে ওঁর ধারণাটা ভুল। বাঁশরির সঙ্গে বিয়ে হলেও আমি সুখী হতুম না, যদি আমাকে বিলেত যেতে না দেওয়া হতো, জার্মানীতে ও ফ্রান্সে থাকতে না দেওয়া হতো, ব্যারিস্টার হতে না দিয়ে ফিরিয়ে আনা হতো। আমি কি তেমনি মানুষ যে বৌ আর বাচ্চা নিয়েই সুখী হতে পারি? আমি সব চেয়ে সুখী হই যখন সৃষ্টিকর্তার মতো সৃষ্টি করি। অথচ সে সুখ যেন দশমাস গর্ভধারণের পর প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির সুখ। আমার সুখদুঃখের নিরিখই আলাদা। তুমি তো তখন এখানে ছিলে না, থাকলে দেখতে আমি দরজা জানলা বন্ধ করে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল কেঁদেছি। জল ছাড়া আর কিছু খাইনি।"

মানস চমকে ওঠে। "কেন? কী ব্যাপার? দাম্পত্য কলহ?'

"আরে, না, না। তোমার বৌদি তখন কোথায়? বিয়ের আগের ঘটনা। প্যারিসের পতন। মনে আছে ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান ওয়ারের সময় ফরাসীরা চারমাস কাল প্রাশিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখে। শহরে ঢুকতে দেয় না। গত মহাযুদ্ধে তো জার্মানদের প্যারিসের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। শহর থেকে বহুদূরে জবর লড়েছে। এবার কোথায় লড়াই? কোথায় কী? রাজধানীটা বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দিল। ছাড়ল যদি তো রাশিয়ানদের মতো পুড়িয়ে দিয়ে গেল না কেন? মনে আছে রাশিয়ানরা নেপোলিয়নের সৈন্যদের বেলা কী করেছিল? ওদের মস্কো দখল করতে দিল তা ঠিক, কিন্তু ওদের

সঙ্গে একজনও সহযোগিতা করল না। সে এক গৌরবময় দিন। এবারেও রাশিয়ার লোক হিটলারের সৈন্যদের মস্কো ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তার আগে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। একজনও সহযোগিতা করবে না। ফরাসীরা প্যারিস ছেড়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দেয়নি, নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এ দুঃখ আমার যাবে না। আমি যে মনে প্রাণে ওদের একজন হতে চেয়েছি।" বলতে বলতে স্বপনদার গলা ধরে আসে। তিনি রুমাল বার করে চোখের উপর রাখেন।

মানস তাঁকে সমবেদনা জানায়। "ফরাসীরা এবার তৈরি ছিল না। হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর স্রোত সৈন্য চলাচলে বাধা দেয়। তবে এটাও ঠিক যে ওরা প্রাণ ধরে প্যারিসকে পুড়তে দিত না। আগুন নেভাতে প্রাণ দিত। প্যারিস যে ওদের প্রাণকেন্দ্র। মস্কো সেই অর্থে রাশিয়ানদের প্রাণকেন্দ্র নয়। তবে এটাও ঠিক যে রাশিয়ানরা তখনো সহ-যোগিতা করেনি, এখনো করবে না। ওরা হাজার মাইল হটে যেতে পারে, কিন্তু সহযোগিতা কিছুতেই না।"

'আর শুনেছ? রম্যা রলাঁ এতকাল নাৎসীদের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ করে অবশেষে ফিরে গেছেন নাৎসী অধিকৃত এলাকায় স্বগ্রামে? বেঠোভেনই তাঁর শেষ অবলম্বন। যেমন ছিল আদি অবলম্বন। নাৎসীরা কেন বাদ সাধবে? বেঠোভেন তো জার্মানদেরই। বড়ো দুঃখ হয় ওঁর কথা ভেবে। প্রথম মহাযুদ্ধে 'above the battle'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও যুদ্ধের ঊর্ধ্বে নন, ফাসিস্টবিরোধী। কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের পর নির্বিরোধী।"

"তুমিও তো তাই।" মানস রলাঁর পক্ষ নেয়।

"এই যুদ্ধে আমিও above the battle, যুদ্ধের ঊর্ধ্বে। তা বলে কি ফাসিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ ফরাসীদের উচিত হয়েছে?"

"তবে প্রতিরোধের সংবাদও আসছে ফ্রান্সের সারস্বত মহল থেকে।' মানস বলে।

"তুমি কি বুঝতে পারছ না, মানু, যে গোটা প্যারিস শহরটাই এখন নাৎসীদের হাতে হস্টেজ? ওদের গায়ে আঁচড়টি লাগলে সারা শহরটাকেই ওরা পুড়িয়ে দেবে। ফরাসীরা যমকেও তত ভয় করে না, যত ভয় করে সংস্কৃতির স্মৃতিলোপকে। প্যারিসের প্রত্যেকটি পাথরের একটা ইতিহাস আছে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে প্রতিশোধটা ডেকে আনা হবে তার ভয়ে

সংস্কৃতিসচেতন মানুষমাত্রেই কাতর। নাৎসীদের বর্বরতা সেকালের সেই গথদের পথ ধরেছে। সেবার ঘটে রোমের পতন। এবার ঘটেছে প্যারিসের পতন। আমার কাছে এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। একালের রোম তো লণ্ডন বা ওয়াশিংটন নয়, প্যারিস। সামরিক অর্থে নয়, সাংস্কৃতিক অর্থে। প্যারিস আজ যা ভাবে, আজ যা আঁকে, আজ যে ফ্যাশন ডিজাইন করে অবশিষ্ট পৃথিবী কাল তা ভাবে, কাল তা আঁকে, কাল তা অনুকরণ করে। কমিউনিস্ট রাশিয়াও বাদ যায় না। তা যদি হয় তবে প্যারিসের পতন হচ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পতন। আর সেটাই তো একমাত্র আধুনিক সভ্যতা। প্রাচ্য সভ্যতামাত্রেই প্রাচীন। আমরা একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক হতে চাইলে আমাদের মুখ ফেরাতে হয় পশ্চিম দিকেই। রামমোহন বলো কেশবচন্দ্র বলো, বিবেকানন্দ বলো, অরবিন্দ বলো, গান্ধী বলো, রবীন্দ্রনাথ বলো, প্রাচ্য সভ্যতার কোন্ প্রতিনিধি পাশ্চাত্য অভিমুখে যাত্রা করেননি ও আধুনিকতার আলোকে প্রাচীনের পুনর্বিচার করেননি? কিন্তু প্যারিসের পতনের পর প্রতিক্রিয়ার সূচনা হতে পারে। রিভাইভালিজম মাথা চাড়া দিতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে সতীদাহ ফিরিয়ে আনতে পারে।" বলতে বলতে আঁতকে ওঠেন স্বপনদা।

"না, না, স্বপনদা, গান্ধী থাকতে, নেহেরু থাকতে সেটা সম্ভব হবে না। নারীশক্তিও কুণ্ডলিনীশক্তির মতো জাগ্রত।" মানস রসিকতা করে।

"সেটা শুধু স্বামীদের জাগিয়ে রাখার জন্যে।" স্বপনদাও রসিকতা করেন। গম্ভীর হয়ে বলেন, "গান্ধী, নেহেরু কি আরো পনেরো বছর বেঁচে থাকবেন।"

"তুমি দেখছি ধরে নিয়েছ যে ছাপান্ন কি সাতান্ন সালের আগে ভারতের মুক্তি নেই। এটা কিন্তু আধুনিক মনের যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস নয়, এটাও এক-প্রকার দৈববাদ। গণশক্তি জাগ্রত হলে আরো আগে ভারত স্বাধীন হতে পারে। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা, বিনা ত্যাগসে স্বরাজ। গণসত্যাগ্রহ হচ্ছে ত্যাগশক্তির পরীক্ষা। দেশের লোক ত্যাগশক্তির পরীক্ষা একটার পর একটা দিয়ে এসেছে, এখনো একটা কি দুটো বাকী। ইংরেজরা কি চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা না দেখে যাবে?" মানস বিষণ্ণ বোধ করে।

দীপিকাদি বাড়ী ফেরেন। এলফ পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে।

"তোমরা দু'জনে মিলে নতুন কী ম্যানিফেস্টো রচনা করতে যাচ্ছ, মার্কস আর এঙ্গেলস?" দীপিকাদি সন্দেহ করেন।

"ভালো কথা, মানু, তুমি কি লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ? খুব মনে করিয়ে দিয়েছ রানু।" স্বপনদার মনে ছিল না এতক্ষণ।

"ভাবা কঠিন, লেখা তার চেয়ে কঠিন, কাজে পরিণত করা তার চেয়েও কঠিন। আমাদের আস্তে আস্তে এগোতে হবে।" মানস উত্তর দেয়। "বৌদি, আমরা এখন যা নিয়ে আলোচনা করছি তা ম্যানিফেস্টো নয়, তা দেশের স্বাধীনতা আর কতকাল পরে বা আগে।"

"ওঃ সেই হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম।" দীপিকাদি বিদ্রূপ করেন।

স্বপনদা উত্তপ্ত হয়ে বলেন, "ইংরেজের পরেই প্লাবন। চতুর্দ্দশ লুই যেমন বলেছিলেন নিজের সম্বন্ধে।"

"অর্থাৎ প্লাবনকে তুমি আরো পনেরো বছর ঠেকিয়ে রাখতে চাও। তুমি সুধীন দত্তের 'উটপাখী'। তোমাকে লক্ষ করেই কবি বলেছেন 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!' তোমার ধারণা ঘটনার স্রোত আরো পনেরো বছর অপেক্ষা করবে।" দীপিকাদি যেন চ্যালেঞ্জ করেন। আর মানসের দিকে তাকান।

'না, প্রলয় বন্ধ থাকবে কেন? প্রলয়ই যদি আমাদের নিয়তি হয়ে থাকে প্রলয় ঘটবে। আমার ভূমিকা দর্শকের ভূমিকা। আমি বালিতে মাথা গুঁজে থাকব না, একটু নিরাপদ দূরত্ব খুঁজে নিয়ে নাটকটা দেখব। ট্র্যাজেডী ছাড়া ওটা আর কী হতে পারে! স্বাধীন হলেই যদি ট্র্যাজেডী এড়ানো যেত তা হলে প্যারিসের পতন হতো না, ফ্রান্স দ্বিখণ্ড হতো না, একখণ্ড জার্মান অধিকৃত হতো না। দেখে শুনে আমি সীনিক বনে গেছি। কত বড়ো আদর্শবাদ নিয়ে ইউরোপে গেছলুম! ফিরে যখন আসি তখন অর্ধেক আদর্শ বাদ। বাকীটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছি। সেটা কিন্তু ইংরেজদের মুখ চেয়ে। স্বদেশকে ওরা রক্ষা করতে পেরেছে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে, ওরাও যদি হেরে যায় তো সভ্যতার সঙ্কট আরো গভীর হবে। আমেরিকার উপরেই বর্তাবে উদ্ধারের দায়। ভারতের উপর নয়। ভারত বলতে ভারতের মুসলমানও বোঝায়। আমার প্রতিবেশী ওরা। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সদুত্তর পাইনে, পাওয়ার ভ্যাকুয়াম হলে সেটা পূরণ করবে কে? কংগ্রেসকে ওদের মজ্জাগত অবিশ্বাস। কংগ্রেস নাকি বর্ণচোরা হিন্দু। হিন্দু রাজত্বে ওরা বাস করবে না, ওদের জন্যে চাই মুসলিম

রাজত্ব। যার এলাকা পাকিস্তান। আমিও তার মধ্যে পড়ি।" স্বপনদা করুণ স্বরে বলেন।

মানস তাঁকে অভয় দেয়। "ক্ষমতা যখন আসবে তখন দায়িত্ববোধও আসবে। কোনো দায়িত্বশীল মুসলমান কখনো পাকিস্তানের দাবী তুলে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চাইবে না। তবে মাইনরিটির একটা স্বাভাবিক শঙ্কা আছে। ভোটের জোরে মেজরিটি একাই শাসন করবে এইখানেই শঙ্কার বীজ। হিন্দুরা যেখানে মাইনরিটি সেখানে তারাও শঙ্কিত। আন্তরিক প্রয়াস পেতে হবে স্বাভাবিক শঙ্কা দূর করতে। এটা তোমাব আমার মতো লিবারল হিউমানিস্টদেবই কাজ। তাই দর্শকের ভূমিকা আমাদের নয়। প্রলয় নিবারণে আমাদেরও অংশ আছে।"

স্বপনদা স্বীকার করেন না। "না, ভাই, আমার কোনো অংশ নেই। আমার টাকা আমি বিলিতী ব্যাঙ্কে রাখি। সময় থাকতে আমার অ্যাকাউণ্ট আমি বিলেতে ট্যান্সফার করে দেব। তার পরে বিলেতে গিয়ে প্র্যাকটিস করব। তোমার বৌদিকে নিয়েই দোটানা। উনি বরং দেহত্যাগ করবেন তবু দেশত্যাগ করবেন না। আমি কিন্তু অন্ধকার দেখছি। আলো যা এসেছিল ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। ওরা যেদিন চলে যাবে সেদিন ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে। হাইকোর্টের তখন এ মহিমা থাকবে না, ব্যারিস্টারেরও এ মর্যাদা থাকবে না। হিন্দী বা উর্দুতে সওয়াল করা আমার কর্ম নয়। বাংলাকে কি কেউ আমল দেবে ভেবেছ? সব ক'টা পার্টিই তো অল ইণ্ডিয়া পার্টি। পার্টির উর্ধ্বতম স্তরে কোনো মেম্বর কি বাংলায় কথা বলেন? তুমি তো জানো আমি ছেলেবেলায় ছিলুম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। আমার সেন্টিমেণ্ট বাংলাদেশকে ঘিরে, ভারতকে ঘিরে নয়। ভারত একটা মহাদেশ। যেমন ইউরোপ। ইংরেজ ফরাসীরা যেমন ইউরোপীয় আমিও সেইরকম ভারতীয়। আর ওরা যেমন ইংরেজ ফরাসী আমিও তেমনি বাঙালী। আজকাল স্বাধীন বাংলার কথা কেউ বলেন না। আমিও মনে করি সেটা ধোপে টিকবে না। কারণ আমরা বাংলাদেশের চারদিকের সীমান্ত রক্ষা করতে পারব না। ফরাসীরাও কি পারল? তাদের তবু সৈন্যবল ছিল। আমাদের সৈন্যবল কই? এবারকার যুদ্ধে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট নেই, লক্ষ করেছ? বাঙালীদের দিক থেকে দাবীও নেই।"

মানস ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বলে, "কথাটা ঠিক। এবার বেঙ্গলী

রেজিমেণ্ট অদৃশ্য। তা বলে বাঙালী রিক্রুটমেণ্ট বন্ধ থাকছে না। বিস্তর লোক যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। মোল্লারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মসজিদে মসজিদে মীটিং করে মুসলমানদের দলে দলে আর্মিতে ভর্তি করে পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় পাঠাতে সাহায্য করছে। ফিরে এসে ওরা পাকিস্তানের জন্যে লড়বে।"

"কই, এসব কথা তো কাগজে লেখে না?" বৌদি অবাক হন।

"যাহা নাহি কাগজে তাহা নাহি বাস্তবে।" মানস মশ্‌করা করে। "কিন্তু, বৌদি, বাঙালী আর রণবিমুখ নয়। যদি মুসলমানদের বাঙালী বলে গণ্য করেন। আর নয়তো ওরা একদিন পাকিস্তানী বলে গণ্য হতে বাধ্য হবে। ওদেরও তো একটা সেন্টিমেণ্ট আছে। তার খবর রাখে ক'জন হিন্দু?"

"পরিতাপের বিষয়, মানছি।" বৌদি বলেন, "ওরা যদি ভারতবিমুখ হয় আমি ওদের দোষ দেব না, কারণ ভারত সত্যিই হিন্দুপ্রধান দেশ, হিন্দু-প্রধানই থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তো সেকথা বলা চলে না। এ প্রদেশ মুসলিমপ্রধান। মুসলিমপ্রধানই থাকবে। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদই স্বাভাবিক। এতদিন ছিলও তাই। ইদানীং কেমন যেন মনে হচ্ছে যে ওরা আর বাঙালী বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নয়। বৃহত্তর মুসলিম সমাজে আসন পেতে হলে বাঙালী বলে পরিচয় দেওয়া যেন হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া। যেন বাংলাভাষাটাও হিন্দুর ভাষা। উর্দু টাই মুসলমানের নিজস্ব। আমাদের প্রতিবেশীরাও বাংলায় কথা বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেন। তবে মীর সাহেবের কথা আলাদা। উনি প্রথমেই বাঙালী। ওঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওঁর বনিবনা হয় না। ওঁরা প্রথমেই মুসলমান।"

মীর সাহেবের মতো বাংলাপ্রেমিক মুসলমান কোনোদিনই পাকিস্তানী হবেন না। মানস সুনিশ্চিত। "কিন্তু তাঁর আপন সম্প্রদায়ে তিনি মাইন-রিটিতে। এককালে যারা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায় এখন যদি তারা দলে দলে পাকিস্তানী বনে যায় তো আমরা নিরুপায়। এ সমস্যা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"আমার কথা যদি বল আমি বাঙালী মুসলিম রাজত্বে বাস করতে রাজী আছি, কিন্তু পাকিস্তানী মুসলিম রাজত্বে বাস করতে নারাজ।" স্বপনদা বলেন। "আশা করি সে রকম পরিস্থিতি কোনোদিন উদয় হবে না।"

"তা হলে ইংরেজকে পনেরো বছর কেন, আরো একশো বছর মাথায় করে রাখতে হয়। আমি তাতে নারাজ।" বৌদি সাফ কথা শুনিয়ে দেন।

"স্বাধীনতা বলতে পাকিস্তানী স্বাধীনতাও বোঝায়, রাম্নু। দশ কোটি মানুষ যদি আলাদা হবার স্বাধীনতা চায় তবে তাদের সে স্বাধীনতা কি অস্বীকার করা যায়? স্বাধীনতা বলতে যেমন বিবাহের স্বাধীনতা বোঝায় তেমনি বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতাও কি বোঝায় না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন ওরা এত অবুঝ হবে যে বিচ্ছেদ শ্রেয় মনে করবে? ধর্মের টানই কি সব? নাড়ীর টান কি তারই মতো একটা টান নয়? বাংলাদেশ, বাংলাভাষা, বাঙালী জাতি—এসব কি কেবল হিন্দুদেরই টানে? মুসলমানদেরও টানে না? মায়ের দুই ছেলে সমান নয়, একজন বড়ো, একজন ছোট। কিন্তু মা তো দু'জনেরই মা? মাকে শুদ্ধ অস্বীকার করার প্রবণতা এল কোন্‌খান থেকে?" স্বপনদা সুধান।

"এল পাঞ্জাব থেকে। পাঞ্জাবী মুসলমানরাই এর উদ্‌গাতা। বিশেষ করে মহাকবি ইকবাল। আইডিয়াটা তাঁর, নামকরণটা রহমৎ আলী বলে একটি ছাত্রের। ইংরেজী বর্ণমালা থেকে প্রদেশের আদ্য অক্ষর নিয়ে একত্র গেঁথে হয়েছে পাকি, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে স্থান। কিন্তু বাংলার 'ব' অক্ষর বর্জিত।" মানস উত্তর দেয়।

## ॥ আট ॥

ব্রেকফাস্টের পর স্বপনদা বলেন, "চল, আমরাও একটু বেড়িয়ে আসি। মীর আবদুল লতিফ সাহেবকে তো চেনো।"

মানস বলে, "একটা সভায় আলাপ হয়েছিল। চিঠিপত্রে সে আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে। উনিও সাহিত্যিক, আমিও সাহিত্যিক। আমার লেখার উনি পাঠক। ওঁর লেখার আমি। বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায়ও বহুদর্শী।"

"কিন্তু ওঁর প্র্যাকটিস তেমন জমল না। তাই পার্টটাইম চাকরি নিতে হয়েছে। ল কলেজে পড়ান। আমারও তো সেই দশা।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

মীর সাহেব তাঁর বৈঠকখানায় বসে তাঁর এক সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বেল শুনে বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলেন, "আইয়ে হজরৎ, তশরিফ লাইয়ে।"

স্বপনদা অবাক হয়ে সুধান, "হঠাৎ উর্দু কেন?"

"আরে. সেইটেই তো আজকের দিনের জ্বলন্ত প্রশ্ন। তাই নিয়েই তো আমার সম্পাদক বন্ধু কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। কী খাবেন, বলুন?" মীর সাহেব তাঁর খানসামাকে ডাক দেন।

"থাক, আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি।" স্বপনদা আপত্তি করেন।

মীর সাহেব নাছোড়বান্দা। বাড়ীর তৈরি মোরব্বা খেতে হবে।

' পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।" স্বপনদা হাসেন।

কামালউদ্দীন সাহেব বলেন, "কথাটা মিথ্যে নয়। খানা খাইয়ে সায়েস্তা খান্ আমার পূর্বপুরুষকে ব্রাহ্মণ থেকে যবন করেন। হিন্দুরা তখনকার দিনে আমাদের যবনই বলত। মুসলমান বলে চিহ্নিত করা হয় ইংরেজ আমলেই।"

মীর সাহেব বলেন, "ওরা আমাদের যবন করেছে, কিন্তু জবান তো কেড়ে নেয়নি। আমরা চিরকাল বাংলায় কথা বলে এসেছি, বড়জোর দু'চারটে আরবী ফরাসী কথা ব্যবহার করেছি। জলকে 'পানী' তো হিন্দু পানী-পাঁড়েরাও বলে। বিহারে গেলেই শোনা যায়। 'জী' বলে জবাব দেওয়া তো বিহারী হিন্দুদেরও অভ্যাস। আমরা যদি নবীজী বলি তো সেটা রামজী, গুরুজীর অনুসরণে। ধর্মে আমরা মুসলমান. ভাষায় বাঙালী। কিন্তু কলকাতার মুসলমান সমাজে দেখছি আমরা বাঙালী বলে পরিচয় দিলে যাকে বলে কল্‌কে পাইনে। উর্দুতে বাৎচিৎ করে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা যথার্থই মুসল-মান। নয়তো কাফের। বাংলা নাকি কাফেরদের জবান।"

স্বপনদা কামালউদ্দীন সাহেবের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান।

"মীর সাহেব বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন, তাই আমিই বলি, শুনুন। তাঁর পূর্বপুরুষ সুলতানী আমলের রইস। পাবনা জেলার একটি খানদানী বংশ। সারা উত্তরবঙ্গে সবাই ওঁদের এক ডাকে চেনে। কিন্তু ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় বসার পর থেকে তাঁকে কলকাতার মুসলমান সমাজে ব্যারিস্টার হিসাবে পরিচয় দিতে হয়েছে। বংশ পরিচয় কেউ জানেও না, জানতেও চায় না। এখন এই ব্যারিস্টার সাহেবের ডাক্তার ছেলে কলকাতার অভিজাত

পরিবারেরই বিয়ে করবে বলে বদ্ধপরিকর। তা করুক। মীর সাহেব ও তাঁর বেগম সায় দিলেন। বিয়ের পর দেখা গেল বৌমা শ্বশুরশাশুড়ীর সঙ্গে উর্দুতে কথা বলবেন, বাংলায় বললে তাঁর মানহানি হয়। কলকাতায় দু'পুরুষ বসবাস করে ওরা উর্দুভাষী বনে গেছে। নইলে ওদের আদিনিবাস তো নদীয়া মেহেরপুরে। কলকাতার বাঙালী মুসলমান এখন বাঙালী বলে পরিচয় দিতে নারাজ। তা হলে সে কী? বিহারী? পাঞ্জাবী? না, সে শুধু মুসলমান। মুসলমান কি একটা জাতির নাম? জিজ্ঞাসা করলে বলে, মুসলমানরা একটা জাতি, একটা নেশন। যেমন হিন্দুরা একটা জাতি, একটা নেশন। তা হলে বাঙালী কোথায় দাঁড়ায়? এর উত্তরে বলবে, বঙ্গালী তো হিন্দু। ও লোগ হিন্দু হ্যায়। আমরা এখন দোটানায় পড়েছি, গুপ্ত সাহেব। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? ধর্ম রাখি না ভাষা রাখি? ধর্ম রাখতে হলে ভাষা ছাড়তে হবে। মীর সাহেব অবশ্য উর্দু ভালো জানেন, কিন্তু তাঁর বেগম তো এত বয়সে উর্দু শিখতে পারবেন না। তাঁর টুটি ফুটি উর্দু শুনে বৌমা তো হেসে খুন। শাশুড়ীর হাড় জ্বালিয়ে বৌমা সেই যে বাপের বাড়ী গেছে, আর ফেরার নাম নেই। ছেলেটা বিষম অসুখী। না পারে মাকে উর্দু শেখাতে, না পারে বৌকে বাংলা ধরাতে। শেখাতে হবে না ওকে। ও বাংলা ভালোই জানে। কিন্তু বলবে না। পাছে কেউ ভাবে ও বাঙালা হিন্দু কাফের। আমাদের এখন কর্তব্য কী? ছেলের আবার বিয়ে দেওয়া? এবার আর কলকাতায় নয়। উত্তরবঙ্গের অভিজাত মুসলিম সমাজে?" কামালউদ্দীন সাহেব সুধান।

"আরে, না, ও কথা ভাবা যায় না।" মীর সাহেব শিউরে ওঠেন। "আমি বহুবিবাহে বিশ্বাস করিনে। আর দ্বিতীয় বিবির জন্যে প্রথম বিবিকে তালাক দেওয়াও আমার মতে অধর্ম। তালাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়। ছেলের জন্যে আমি অন্য বাসার বন্দোবস্ত করছি। বৌ নিয়ে ও আলাদা থাকবে। ওদের বাসায় ওরা কোন্ ভাষায় কথা বলবে ওরাই ঠিক করুক। তবে ছেলেও তার মায়ের মুখ রক্ষা করতে এক তৃতীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছে। সে বাংলাতেও না, উর্দুতেও না, ইংরেজীতে কথা বলবে। তার বৌ অবশ্য ইংরেজীশিক্ষিতা। ইচ্ছা করলে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান যদি একদিন হাসিল হয় তবে উর্দু জবান ফরজ হবে। ইংরেজী হবে হারাম। তখন কী উপায়?"

এবার মানস মুখ খোলে। পাকিস্তান যদি হাসিল হয় তাতে বাংলার মুসলমানদের কী? পাকিস্তানের ডেফিনিশনে তো বাংলাদেশের উল্লেখ নেই। ওটা মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড হতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র এক হোমল্যাণ্ড। সেখানকার ভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু হবে কোন্ যুক্তির জোরে?"

"যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা এক নেশন। সুতরাং একভাষী। বাঙালী বিহারী বলে কোনো ভেদ নেই, বাংলাভাষী উর্দুভাষী বলে ভেদ থাকবে কেন? আমার জন্ম চাষী পরিবারে। আমি চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দিয়েছি। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করি। আমার কাছে হিন্দু চাষী আর মুসলিম চাষী বলে দুই পৃথক শ্রেণী নেই। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মতে মুসলমানদের মধ্যে চাষী ও জমিদার বলে দুই পৃথক ভাগ নেই। সবাই ভাই ভাই। সকলেরই এক স্বার্থ। সেটা মুসলিম স্বার্থ। তার বিপরীত স্বার্থ হিন্দু স্বার্থ। অতএব দেশভাগ করতেই হবে। পাকিস্তানই মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি। এখন আমার কাগজ চালানো দায়। যদি বলি এটা ঠিক নয় তা হলে কাগজ চলবে না। দলেও ভাঙন ধরেছে। ইতিমধ্যেই অনেকে মুসলিম লীগে নাম লিখিয়েছে। পাকিস্তান চাই বললে ভোট পাবার সম্ভাবনা বেশী। চাইনে বললে সম্ভাবনা কম। পাকিস্তানের ডেফিনিশনে বাংলাদেশের উল্লেখ নেই, সেটা একটা স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড, এটাই লাহোর প্রস্তাবের মর্ম। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের বোলচাল বদলে গেছে। স্বতন্ত্র বঙ্গ বললে যত লোক ভোট দেবে স্বতন্ত্র পাকিস্তান বললে তার চেয়ে ঢের বেশী লোক ভোট দেবে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় যাঁরা মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত হবেন তাঁরা জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তান পসন্দ্ দল হিসাবেই কাজ করবেন।" কামালউদ্দীন উত্তর দেন।

মোরব্বা খেতে খেতে স্বপনদা বলেন, "দুঃস্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন! পাকিস্তান একটা দুঃস্বপ্ন! ইকবাল দেখতে চেয়েছিলেন। দেখতে পেলেন না। কিন্তু নজরুল যেন না দেখেন।"

"নজরুল এখন প্রকৃতিস্থ নয়। বেচারার বড়ো দুর্দিন যাচ্ছিল। সংসারচিন্তাই ওকে পাগল করে দিয়েছে। এর উপর যদি আসে পাকিস্তানের চিন্তা তা হলে ওর পাগলামি আর সারবে না।" মীর সাহেব বলেন উদ্বেগভরে।

"ওর নিজের বাড়ীতেই তো দুই নেশন।' মানস কটাক্ষ করে।

"ওর মতো বাঙালা জাতীয়তাবাদী আর কে? বাঙালী জাতিটাই আজকাল অপ্রকৃতিস্থ। বাঙালী হিন্দুরা যখন বাঙালীর গৌরবে আত্মহারা হন তখন বাঙালী মুসলমানদের অস্তিত্ব ভুলে যান। যেন ওরা বাঙালীই নয়। ব্যতিক্রম একমাত্র নজরুল। কিন্তু খোঁজ করলে দেখবেন আরো ব্যতিক্রম আছেন। তাঁরা বাঙালী হিন্দুদের চোখে মুসলমান, আর বাঙালী মুসলমানদের চোখে হিন্দু। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা মাছমাংসই খান না, গোমাংস তো দূরের কথা। আর হিন্দুত্বের সংজ্ঞাও আজকাল এমন হয়েছে যে যারা দেবদেবী মানে না তারা হিন্দুই নয়। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের অবস্থাও আমারই মতো। না ঘরকা না ঘাটকা।" আফসোস করেন মীর সাহেব।

"মানসের ও আমারও তো একই অবস্থা।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

"দেখুন, গুপ্ত সাহেব, তলে তলে এক প্রকার পোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। একদিকে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্দু। আরেক দিকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী বাঙালী মুসলমান। বাংলার বাইরে বাঙালামাত্রেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ত্রিশ বছর আগে তুঙ্গে উঠেছিল। কবিগুরু যখন নোবেল প্রাইজ পান। তার পর গান্ধীজীর সূর্য যখন পশ্চিমে উদয় হয় তখন বাঙালার সূর্য পূবদিকে হেলে। এই সেদিন অস্তাচলে গেল। কবিগুরুর জন্যে আমরা কি কম অশ্রুপাত করেছি? তাঁকেই আমরা ভালোবাসি, ইকবালকে নয়। কিন্তু হঠাৎ দেখছি ইকবালই হয়েছেন মুসলমানদের 'জাতীয়' কবি। রবীন্দ্রনাথ নাকি প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিক।" মীর সাহেব মুষড়ে পড়েন।

"আমার তো মনে হয় এটা একটা সাময়িক আত্মবিস্মৃতি। যেমন হিন্দুর পক্ষে, তেমনি মুসলমানের পক্ষে। নইলে 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে সিরাজের জন্যে কাঁদেনি কোন্ বাঙালী হিন্দু? কেউ কি চেয়েছিল পলাশীতে নবাবের হার হয়? তখন তো কারো আপত্তি ছিল না মুসলিম নবাবের অধীনে বাস করতে। মুসলিম বাদশাকে আনুগত্য জানাতে। রাজপুতরা বিদ্রোহ করেছিল, মরাঠারা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা বিদ্রোহ করেননি। অর্থনীতি তো তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। আর পশ্চিমা জৈন শেঠদের। রাজ্যহারা হয়ে মুসলমানদের যদি দুর্গতি হয়ে থাকে অর্থহারা হয়ে হিন্দুদেরও তেমনি দুর্গতি। ইংরেজ আমলে কেউ বা কয়েকটা চাকরি বেশী পেয়েছে, কেউ বা কয়েকটা কম। কিন্তু তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নয়। সব ক'টা চাকরি হারাতেও

আমাদের আপত্তি থাকত না, যদি আমরা বাণিজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতুম। তার পর কৃষিকর্মে। ঝগড়াটা তো হচ্ছে চাকরি বাকরির ইস্যুতে। সেটাকেই ঢাকা দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের ইস্যু দিয়ে। যেমন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।" মানস বিশ্লেষণ করে বলে।

"সেইরকমই ছিল দশ বছর আগে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এসে হিন্দুদের মনে দারুণ আঘাত হেনেছে। এর জন্যে ওরা ইংরেজকে তো ক্ষমা করেইনি, মুসলমানকেও দায়ী করেছে। 'আমরা একা লড়ে মরেছি আর তোমরা কিনা আমাদের লড়াইয়ের ফল ভোগ করছ।' হিন্দুদের ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে যে রাজার শত্রু বলে ওদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর রাজার মিত্র বলে মুসলমানদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে ওদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের স্থান বিরোধীদের আসনে। সরকারগঠনে নয়।" মীর সাহেব দুঃখিত।

"আমার ছেলেবেলায় আমি ছিলুম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। সেটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। বড়ো হয়ে হই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সেটা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। আরো বড়ো হয়ে ইউরোপে বাস করে আমি হই উদার মানবিকবাদী। আমার পক্ষে এখন পেছন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, মীর সাহেব। বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা যদি হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাসভূমি চায় তো তাকে পাকিস্তান বলে আখ্যায়িত করলেও সে গোলাপের মতো তেমনি সুগন্ধ বিতরণ করবে, কিন্তু তার যদি স্বতন্ত্র একটা কেন্দ্র হয়, সে কেন্দ্র যদি হয় বাংলাদেশের বাইরে কোনো এক শহরে, তার ভাষা যদি হয় উর্দু আর কর্তারা হন পাঞ্জাবী ও গুজরাটী মুসলমান, তবে সেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মতো এটাও হবে আরেক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। কেমন করে এর আমি সমর্থন করি, বলুন? তা হলে কি আমি এর বিরোধিতা করব? না, সেটাও আমার স্বভাবে নেই। আমি নির্বিরোধী। আমি ঘরবাড়ী বেচে দিয়ে বিলেত চলে যাব। সেখানেই প্র্যাকটিস করব। ভাবনা কেবল আমার ঘরণীকে নিয়ে। ঘর ফেলে যেতে পারি ঘরণীকে তো ফেলে যেতে পারিনে। আমি যদি তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে না পারি তবে তিনিই আমাকে টেনে রাখবেন এখানে। এই কলকাতা শহরে। কিন্তু পাকিস্তান তিনি মেনে নেবেন না। ইংরেজরা যাকে ইচ্ছে তাকে পুরস্কার দিক, কিন্তু তাঁর অধিকারে ঘা লাগলে তিনিও ঘা দেবেন। হিন্দুর জন্মভূমিতে হিন্দুর কোনো অধিকার নেই, একমাত্র অধিকারী মুসলমান,

এটা রাজনীতি হতে পারে, সুনীতি নয়। নৈতিক সমর্থন জোর করে আদায় করা যায় না। জোর করে আদায় করা যায় বশ্যতা। তার আগে যুদ্ধে জিততে হবে। গৃহযুদ্ধে। যেটা এই সাতশো বছরে ঘটেনি। কী আফসোস!" স্বপনদা কফিতে চুমুক দেন।

"আপনার সঙ্গে আমি একমত, গুপ্ত সাহেব। পাকিস্তানকে আমি বলি গোরস্থান। জিন্নাকে বলি জিন। বাঙালী মুসলমান যদি স্বতন্ত্র একটা নেশন হিসাবে স্বতন্ত্র একটা বাসভূমি চায়, যেটা পাঞ্জাবের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা আর যেটার রাজভাষা উর্দু, তা হলে আমিও প্রতিবাদ করব। কিন্তু ঘরবাড়ী ছেড়ে বিলেত যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে আমার গরিবখানা আছে। কলকাতা শহরেও ছোট্ট একখানা এমারত কিনেছি। আর আমার বেগম সাহেবা তো বাংলা ভিন্ন আর কোনো ভাষা বোঝেন না। গৃহত্যাগ না গৃহিণী-ত্যাগ আমার সমস্যা নয়। আমি পাকিস্তানেই থেকে যাব ও সুদিনের অপেক্ষা করব। একদিন না একদিন বাঙালী মুসলমান তার ভুল বুঝতে পারবে। আপনি সব মানুষকে কিছুদিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন কিছু মানুষকে সব দিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু সব মানুষকে সব দিনের জন্যে বোকা বানাতে পারেন না, জিন্না সাহেব। আর ওই ইংরেজের কৃপায় পাকিস্তান! ওটা যেন গোরু মেরে জুতো দান। পলাশীতে যাদের মার খেয়েছি তাদের হাত থেকে মীর জাফরের ইনাম!" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

কামালউদ্দীন নীরবে শুনছিলেন। বলেন, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ইংরেজ কি রাজত্বের মায়া কাটিয়ে ফকিরা নিচ্ছে? যুদ্ধে জিতলে আরো গ্যাঁট হয়ে বসবে। যুদ্ধে হারলে জার্মানদের হাতে সঁপে দেবে। আসলে এটা নির্বাচনে মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দেবার ফন্দী। কেবল বাংলাদেশে নয়, আর সব প্রদেশে। পাকিস্তানের মোহে সবাই চোখ বুজে ভোট দেবে। পাকিস্তানের ডেফিনিশন এখনো খোলা রয়েছে। ওর মধ্যে আসামও পড়তে পারে। দিল্লীও। কিন্তু লীগওয়ালারা ধরে নিয়েছেন যে শিখেরা রণজিৎ সিংহের রাজ্য বিনা যুদ্ধে পাকিস্তানের বাদশাদের চরণে সমর্পণ করবে। শিখদের সম্মতি না নিয়ে মুসলমানদের পুরস্কার দিতে গেলে আবার এক সিপাই-বিদ্রোহ।"

"সেকথা ঠিক। ইংরেজরা কেন সে ঝুঁকি নেবে?" মানস মন্তব্য করে।

স্বপনদা বলেন, "শিখদের পুরস্কার দিতে হবে। তাদের মতো রাজভক্ত

কারা? সিপাইবিদ্রোহেও তারা অংশ নেয়নি। তাদের চটালে নির্ঘাত সিপাইবিদ্রোহ।"

"আমাদের এক পাঞ্জাবী সহকর্মী পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসে বলেছেন সেখানে নাকি এক টুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই কিনে নিয়ে গোপনে হাতিয়ার বানাচ্ছে। প্রত্যেকেরই দাবী গোটা পাঞ্জাব। ইতিহাসের যতগুলো বড়ো বড়ো যুদ্ধ সব ক'টাই তো পাঞ্জাবেই ঘটেছিল।" মানস বলে।

"সেসব যুদ্ধ সৈনিকে সৈনিকে। জনতায় জনতায় নয়। সশস্ত্র জনতার সঙ্গে সশস্ত্র জনতার যুদ্ধ একটিমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকবে না। যেমন পানিপথে বা তরাইনে। সারা প্রদেশ জুড়েই হানাহানি কাটাকাটি লুটপাট ঘর জ্বালানি চলবে। নারী হরণও বাদ যাবে না। এর নজীর জার্মানীর সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশবছরের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা যায়। দেশ ছারখার হয়। খোপে খোপে বিভক্ত হয়। যদিও উপরে একজন সম্রাট তবু তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।" স্বপনদা ইতিহাস স্মরণ করেন।

"বাংলাদেশেও তো সেরকম ঘটতে পারে।" মানস আর্তস্বরে বসে।

"না, বাঙালীরা পাঞ্জাবীদের মতো ধর্মান্ধ নয়।" মীর সাহেব আশ্বাস দেন। "পাঞ্জাবে শিখদের উপর যে রকম উৎপীড়ন হয়েছিল বাংলাদেশে তার কোনো তুলনা নেই। ফলে শিখরা হয়ে ওঠে সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় কৃপাণধারী। ডাক দিলে সকলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সংগ্রামে। ব্যাংলাদেশের ঐতিহ্য অসামরিক। আমরা বাঙালীরা অসামরিক জাতি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ব না। আপস করব।"

কামালউদ্দীন সাহেব বলেন, "ধর্মান্ধতা না থাকলেও এখানে ধর্মের নামে রাজনীতি আছে। কৃষক প্রজার যে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ তা সে মুসলমান বলে নয় বা হিন্দু বলে নয়, সে শোষিত ও বঞ্চিত বলে। কিন্তু ভোটের দালালরা তাদের বোঝাচ্ছে তারা মুসলমান বলেই হিন্দু জমিদার ও মহাজন কুলের হাতে এই দুর্ভোগ। যেন মুসলিম জমিদার ও কাবুলী মহাজনকুল তাদের খাজনা ও সুদ মাফ করে। খাজনা বাকী পড়লে জমি খাস করে না, সুদ বাকী পড়লে লাঠিপেটা করে না। আরেক দল ভোটের দালাল এখন হিন্দুদের বোঝাচ্ছে হিন্দুর ধন মান প্রাণ বিপন্ন। কংগ্রেস তাকে রক্ষা করবে না। সে তো কেবল মুসলমানদের তোয়াজ করতেই জানে। গান্ধী তো

মুসলমানদেরই আপন জন। হিন্দুকে বাঁচাবেন একমাত্র বীর সাভারকর। এই যে ধর্মের নামে রাজনীতির খেলা এর উদ্দেশ্য যদিও ক্ষমতার রাজনীতি, তবু ভোটাভুটির মধ্যেই এটা নিবদ্ধ থাকবে না। তার পরের পর্যায় লাঠালাঠি। যার জমি নেই সে জমি কেড়ে নেবে, যার আছে সে হিন্দুধর্মের দোহাই দেবে। অমনি করে বেধে যাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ। গরিব হিন্দুকে মারবে গরিব মুসলমান। দুর্বল মুসলমানকে মারবে দুর্বল হিন্দু। বৃথা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখছেন মীর সাহেব। ধর্মের থেকে রাজনীতিকে পৃথক করতে না শিখলে হিন্দু বা মুসলমান কোনো পক্ষই নিরাপদ নয়। ধর্মও ভালো, রাজনীতিও ভালো, কিন্তু ধর্মের ভেক পরে রাজনীতি ভালো নয়। আমাদের পরীক্ষার দিন আসছে।"

"তা বলে ধর্মবর্জিত রাজনীতিও কি ভালো ?" মীর সাহেব প্রশ্ন করেন। 'ধর্মবর্জিত মার্কসবাদ আর তার প্রতিবাদী ধর্মবর্জিত ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদ আজ সারা ইউরোপকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। জাপান যদি যোগ দেয় তো সারা বিশ্বকেও। ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে রাজনীতি একটা অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে, কামাল সাহেব। রাজনীতি থেকে মহাত্মা গান্ধী বা মওলানা আজাদকে বিদায় দিলে লাভ যতটুকু হবে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশী।"

"মীর সাহেব," মানস বলে, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে বার্ক বলেছিলেন, শিভালরির যুগ শেষ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে আমিও তেমনি বলতে পারি, ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির যুগ শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীজীর পেছনে যেটা আছে সেটা ধর্মের জোর নয়, নীতির জোর। তিনি নিজেই একটা মরাল ফোর্স। যেদিকে তিনি সেদিকেই জয়। তাঁর সহকর্মীরা ঈশ্বর না মানলেও তিনি কিছু মনে করেন না, কিন্তু সত্য মানতে হবে, অহিংসা মানতে হবে, ত্যাগ মানতে হবে, সংযম মানতে হবে। আগে তিনি বলতেন, ঈশ্বরই সত্য। এখন বলেন, সত্যই ঈশ্বর। যারা সত্যাগ্রহী তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী না হলেও ঈশ্বরবিশ্বাসীর সমান। ধর্মবর্জিত রাজনীতি ভালো না হতে পারে, কিন্তু নীতিবর্জিত রাজনীতি নিশ্চয়ই মন্দ। এই পার্থক্যটা সহজে লোকের চোখে পড়ে না বলে ধর্মকেও নীতির খাপ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং সবাইকে বলা হচ্ছে ভালো হিন্দু বা ভালো মুসলমান বা ভালো খ্রীস্টান বা ভালো শিখ হতে। অর্থাৎ ভালো মানুষ হতে। গান্ধীজীও একজন মানবিকবাদী। একজন হিউমানিস্ট।" মানসের সিদ্ধান্ত।

"হিউমানিস্ট আজকাল কে নয়?" স্বপনদা বলেন, "মার্কসও হিউমানিস্ট। লেনিনও হিউমানিস্ট। সেইজন্যে তার সামনে একটা বিশেষণ বসাতে হয়। কী রকম হিউমানিস্ট? লিবারল হিউমানিস্ট, না র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট, না সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক হিউমানিস্ট, না রেভোলিউশনারি হিউমানিস্ট, না ন্যাশনালিস্ট হিউমানিস্ট? হিটলার মুসোলিনিও হিউমানিস্ট বলে দাবী করছেন। যদিও আমার মতে ওঁরা হিউমানিস্টই নন, ওঁরা রিভাইভালিস্ট। মুসোলিনি চান রোমান এম্পায়ারের পুনরাবৃত্তি। নিজেই হবেন সীজার। আর হিটলার চান হোলি রোমান এম্পয়ারের পুনরাবৃত্তি। নিজেই হবেন সম্রাট অটো দ্য গ্রেট। ইটালীও আসবে ওঁর পদতলে। পোপও হবেন ওঁর আজ্ঞাধীন। যে যার খুশিমতো পার্টি গঠন করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একপ্রকার না একপ্রকার মতবাদ। মতবাদীদের বলা হয় ফাসিস্ট বা নাৎসী। হিউমানিজমের বিকৃত রূপ। তার প্রায় সবটাই অন্ধ বিশ্বাস ও বিদ্বেষ। সেই সঙ্গে কিছু সদর্থকও আছে। সেটা জার্মানীর ও ইটালীর নব নির্মাণ। বেকার বলে কেউ নেই। অভুক্ত বলে কেউ নেই। জনতা যা পেয়ে তুষ্ট—ব্রেড আর সার্কাস। রোমানদের মতো।"

"একই রকম খোয়াব দেখছেন আমাদের লীগপন্থী বন্ধুরাও।" কামাল সাহেব বলেন। "ওঁরা বিশ্বে হোলি খেলাফৎ এম্পায়ার ফিরিয়ে আনবেন। পাকিস্তান তার শেষ নয়, তার শুরু। হিটলার, মুসোলিনির মতো জিন্নার পেছনেও গড্ডলিকাপ্রবাহ। তফাৎ শুধু এই যে হিটলার, মুসোলিনির রাজনীতি ধর্মবর্জিত। ধর্মের স্থান নিয়েছে নাৎসী ও ফাসিস্ট মতবাদ। তাদেরও শাস্ত্র আছে। শাস্ত্রী আছেন। শুধুমাত্র শস্ত্র নয়, শস্ত্রধারী নয়। লীগপন্থীরাও একদল উলেমাকে তাঁদের পক্ষে পেয়েছেন। একদল ইনটেলেকচুয়ালকেও। জমিদার, তালুকদার, ধনিক, বণিকরা তো তাঁদের পক্ষে আছেনই। আছেন ইংরেজ মুরুব্বিরাও। আমাদের সাধ্য কী যে আমরা তাঁদের প্রোপাগাণ্ডার মুখে দাঁড়াতে পারি! প্রোপাগাণ্ডাই তো অর্ধেক যুদ্ধ। আমার কাগজ উঠে যাবে। মীর সাহেবের লেখাও আর কোথাও বেরোবে না। উল্টো ফল হবে যদি হিন্দুদের পত্রিকায় বেরোয়। উনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান আর আমি কৃষক প্রজাদরদী মুসলমান। আমাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। আমরা একনৌকায় এতদিন ভেসেছি। কিন্তু হোলি খেলাফৎ এম্পায়ার যদি ফিরে আসে আমরা একনৌকায় ডুবব।"

"না, না, ইংরেজ থাকতে ওটা কখনো সম্ভব নয়। আর ইংরেজ কি বিনা পরাজয়ে যাবে?" মীর সাহেব এককথায় উড়িয়ে দেন।

স্বপনদা কথাবার্তাকে মোড় ফিরিয়ে দেন। 'আজ আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলুম, মীর সাহেব। আমার ছোটখাটো একটা গ্রুপ আছে। আমরা তার নাম রেখেছি 'লিবারল হিউম্যানিস্ট গ্রুপ'। বারো জনের বেশী মেম্বর থাকবেন না। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন মুসলমান। আপনাকে তো অবশ্যই, আপনার বন্ধুকেও আমাদের সঙ্গে পেলে প্রীত হই।"

"কিন্তু আমার কথাবার্তা শুনে কি মনে হয় আমি লিবারল হিউম্যানিস্ট? তা যদি হয় তো আমি সানন্দে সম্মত।" মীর সাহেব বলেন।

"আমারও সেই কথা।" কামালউদ্দিন সাহেব যদি'র উপরে জোর দেন। "মীর সাহেব আপনাদের মতোই বুর্জোয়া। আমি সমাজের পুনর্বিন্যাসে বিশ্বাসী।"

স্বপনদা ভেবে বলেন, "সমাজের পুনর্বিন্যাস নির্বিরোধেও হতে পারে। আপনি আসুন, এসে আমাদের কন্‌ভার্ট করুন। ইসলামে নয়, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদেও নয়, সব মানুষ যে সমান এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসে।"

মীর সাহেব জানতে চান গ্রুপের মূল বক্তব্য কী।

"আপনাকে আমাদের সঙ্গে বসে একটা ম্যানিফেস্টোর খসড়া মুসাবিদা করতে হবে, মীর সাহেব। আপনাকেও কামাল সাহেব। আমরা সেটাকে বলব লিবারল হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টো।" স্বপনদা বলেন। "আমাদের প্রথম কথা 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সে নারী না পুরুষ, হিন্দু না মুসলমান, ইউরোপীয় না ভারতীয়, বাংলাভাষী না উর্দুভাষী, জমিদার না চাষী, ধনিক না শ্রমিক, আর্য না অনার্য এসব হলো মানুষ নামক সত্যের উপরে নয়, নিচে। দ্বিতীয়ত, মানুষের স্বধর্ম মনুষ্যত্ব, যেমন সিংহের সিংহত্ব, অশ্বের অশ্বত্ব, ময়ূরের ময়ূরত্ব, সর্পের সর্পত্ব। মনুষ্যত্ব যদি আমার থাকে তবে দেবত্ব নেই বলে আমি ছোট হয়ে যাব না। মানব হিসাবেই আমার বিচার, দেব হিসাবে নয়। আমার কাছে পারফেকশন প্রত্যাশা করা অনুচিত। মানুষকে প্রকৃতি পারফেকট না করেই বানিয়েছে। সে হয়তো একদিন সাধনা করতে করতে অপেক্ষাকৃত পারফেক্ট হবে। তখন হয়তো দেখবে যে অনবদ্য পারফেকশন আরো সুদূর। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই আমাদের অন্বিষ্ট। কিন্তু পরিমিত পরমায়ুর মধ্যে তা কি কারো পক্ষে সম্ভব? প্রকৃতি অনুকূল না হলে, সমাজ

অনুকূল না হলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব কারো আয়ত্তগম্য নয়। তা হলেও সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তৃতীয়ত, শাদা আর কালো এই দুটি ছাড়া আরো অনেকগুলি রং আছে, আকাশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাই। মানুষের চরিত্রেও তেমনি অশেষ বৈচিত্র্য। ভালো আর মন্দ এই দুটি ভাগে তাকে বিভক্ত করা চলে না। ভালো মানুষেরও মন্দ দিক আছে, মন্দ মানুষেরও ভালো দিক আছে, কেউ নিপট ভালো নয়, কেউ নিছক মন্দ নয়। মানুষ এক জটিল সত্তা, তাকে সরল করতে গেলে সত্যতাহানি হয়। দেবত্ব ও দানবত্ব আরোপ করে রামের ও রাবণের সত্যতা হানি ঘটালে রামায়ণ আর মহাকাব্য থাকে না। হয়ে যায় ধর্মগ্রন্থ। রামও মানুষ, রাবণও মানুষ। দেবত্ব ও দানবত্ব হচ্ছে কাল্পনিক।"

মীর সাহেব স্মিত হেসে বলেন, "বুঝেছি। এর জন্যে লাঠির বাড়ি খেতে হবে। কে কে রাজী আছেন সেটা আগে জেনে নিয়ে তার পরে ম্যানিফেস্টো বার করা যাবে।"

'লাঠির বাড়ি' শুনে স্বপনদার, মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "ও গড!"

"ভগবানকে ডাকছেন যে!" মীর সাহেব সশব্দে হেসে ওঠেন, "হিন্দুরা তত নির্দয় নয়। আপনি লাঠির বাড়ি খাবেন না। কিন্তু আমাকে খেতে হয়েছে। আবার খেতে হবে। মুসলমানদের হাতে। কেন আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চান, গুপ্ত সাহেব?"

মানুষের ব্যাপারে ভগবানকে টেনে এনে স্বপনদা স্ববিরোধী কাজ করেছিলেন। সামলে নিয়ে বলেন, "কেউ কারো চেয়ে কম নির্দয় নয়, মীর সাহেব। হিন্দুরা তাদের ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করে, বাড়ীতে এলে তাদের খেতে দেয় উঠোনে চাকরদের সঙ্গে! বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে দান খয়রাত করে ফেরার সময় গাঁয়ের লোক তাঁর পাল্‌কীর গায়ে ঢিল ছোঁড়ে আর বিধবারাই তাঁকে শাপান্ত করে, 'তোর বৌ বিধবা হোক।' জোরসে পাল্‌কী চালিয়ে না দিলে হয়তো সেইদিনই শাপ ফলে যেত। তাঁর স্ত্রী বিধবা হতেন। হিন্দুর নির্দয়তার কি তুলনা আছে! সতীদাহ তো ওরা হাজার হাজার বছর ধরে চালিয়ে গেছে। সিপাইবিদ্রোহের অন্যতম কারণ হলো ফিরিঙ্গীরা কেন সতীদাহ বন্ধ করে দিয়েছে।"

মীর সাহেব হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে কিছুক্ষণ ওকালতী করেন ও স্বপনদা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে ব্যারিস্টারি। তার পরে দু'জনে মানসের রায় মেনে

নেন। সে বলে, "দু'পক্ষেরই ব্যাধি হলো পরাধীনতা ও তার আনুষঙ্গিক অজ্ঞতা। ব্যাধির প্রতিকার স্বাধীনতা ও তার আনুষঙ্গিক চিৎপ্রকর্ষ।"

স্বপনদা খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। খেই হাতে নিয়ে বলেন, "আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি, মীর সাহেব ও কামাল সাহেব। ফরাসী বিপ্লবের যুগ থেকে বিশ্বমানব শুনে আসছে একটি নতুন মন্ত্র। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বা লিবার্টি'ই সকলের আগে। তার পরে ইকুয়ালিটি বা সাম্য। তার পরে ফ্র্যাটারনিটি বা মৈত্রী। সেই আদিকাল থেকে মানুষ মানুষকে দাস করে রেখেছিল, ধর্মও তার উচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। কিন্তু লিবার্টি যেই মানবজীবনের মূলমন্ত্রের অন্যতম হলো অমনি ক্রীতদাসপ্রথার মূলে আঘাতের পর আঘাত পড়ল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। এখানে ওখানে তার শিকড় এখনো থেকে গেছে। বিশেষত আফ্রিকার বুকে। স্লেভারি যদি যায় তো ওয়েজ স্লেভারি কেন থাকবে? বণ্ডেড লেবার কেন থাকবে? শ্রমিকের গতিবিধির উপর অন্যায় বিধিনিষেধ কেন থাকবে? ক্রমে ক্রমে এসবও উঠে যাচ্ছে। একটি দেশের দ্বারা আর একটি দেশের লিবার্টি কেন রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকবে? তাই একটির পর একটি দেশ স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ও সফল হয়েছে। বিবাহিত জীবনে নারী কেন পুরুষের সেবাদাসী হয়ে থাকবে? এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের সূচনা হয় লিবার্টি'র দাবীতে। সে বিদ্রোহ এখন এদেশেরও ঘরে ঘরে। মুসলিম নারীসমাজও পেছিয়ে থাকবে না দেখবেন।"

"এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" মীর সাহেব অট্টহাস্য করেন।

"লিবার্টি'র জল অনেকদূর গড়িয়েছে। তারপর ইকুয়ালিটির জোয়ার। কালো মানুষ চায় সাদা মানুষের সঙ্গে সাম্য, ভারতীয় চায় ইউরোপীয়ের সঙ্গে সাম্য, মুসলমান চায় হিন্দুর সঙ্গে সাম্য, শ্রমিক চায় ধনিকের সঙ্গে সাম্য, নারী চায় পুরুষের সঙ্গে সাম্য। সাবালকমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার এখন প্রায় সব দেশেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এদেশেও হবে। তার তাৎপর্য সব নাগরিকই সমান। নাগরিকাও বাদ যায় না। এই যে সাম্যের জোয়ার একে বাধা দিতে গেলেই সমাজবিপ্লব। সময় থাকতে যতদূর সম্ভব স্বীকার করাই সুবুদ্ধি। সে সুবুদ্ধি ব্রিটেনের উচ্চতর শ্রেণীর আছে। সেইজন্যেই আমার বিশ্বাস ব্রিটিশ কর্তারা শেষপর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মিটমাটে হবেন। তবে যুদ্ধের মাঝখানে নয়। তা হলেও আমি পনেরো বছর

সময় হাতে রেখেছি। ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণগুলো দূর করতে হবে। নইলে শরিকে শরিকে লড়াই।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর মুখ অন্ধকার।

"তা হলে সেটা হবে গোরস্থানের ইকুয়ালিটি।", মীর সাহেব মন্তব্য করেন।

## ॥ নয় ॥

বিজন বর্ধন মানসের প্রথমে প্রতিযোগী, তার পরে সহযাত্রী ও সতীর্থ। বিলেত থেকে ফিরে ওরা একসঙ্গে একবছর একবাসায় কাটায়। বিজনের কনে দেখায় মানসেরও একটু ভূমিকা ছিল। আর মানসের বিয়েতে না হোক বিয়ের পরে বিজনের একটু ভূমিকা। মানস ও যূথিকার হানিমুনের সে নীরব দর্শক। কথা ছিল সে সেটলমেন্ট ট্রেনিং শেষ করে তার পরে বিয়ে করবে, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ক্লান্ত হয়ে সে অকস্মাৎ মত পরিবর্তন করে। ক্যাম্পে যাবার আগেই তার শুভকর্ম সারা হয়। ফলে বিজনের বধূ উদিতা মানসের প্রতি কৃতজ্ঞ। যূথিকার সঙ্গেও তার প্রীতির সম্পর্ক। কলকাতায় ওরা একসঙ্গে এলে বিজনদের অতিথি হয়।

স্বপনদার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মানস বিজনের ওখানে হাজিরা দেয়। উদিতা ওকে রিসিভ করে। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসে বিজন। ছুটির দিনেও ওর ছুটি নেই। সেক্রেটারিয়াটের সে একজন হোমরা চোমরা আমলা। পদভার তাকে ভারিক্কি করেছে। অর্থনীতি বিশারদ বলে সরকার তাকে সমীহ করেন। কিন্তু উপরওয়ালারা তো ওর পরামর্শে চালিত হবার পাত্র নন। তাই বিরোধ বাধে।

"মানস, আমি চোখে আঁধার দেখছি।" বিজন কথাপ্রসঙ্গে বলে।

"কেন, ভাই বিজন? মুসলিম মন্ত্রীরা কি খুব বেশী কমিউনাল?" গভর্নর কি ঠুঁটো জগন্নাথ?" মানস জেরা করে।

"না, না, ওঁদের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই। সমস্যাটা সাম্প্রদায়িক নয়, অর্থনৈতিক। যুদ্ধকালে খাদ্য বস্ত্র ঔষধপত্র দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়, এটাই তো মানব অভিজ্ঞতা। ইংলণ্ডে ওরা সময় থাকতে র‍্যাশনিং

প্রবর্তন করেছে। আর সেই র‍্যাশনিং দস্তুরমতো কড়া। এক মন্ত্রীর চাকরি চলে গেল তিনি নিজের পরিবারের জন্যে গোটা দুই খরগোস শিকার করে এনেছিলেন বলে। যাকে যা র‍্যাশন দেওয়া হবে তাই খেয়েই তাকে বাঁচতে হবে। তার বাইরে এক আউন্সও নয়। হোর্ডিং একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। যারা হোর্ড করে তারা মোটা মুনাফা করে। এটাও মানব অভিজ্ঞতা। নিজের ব্যবহারের জন্যেও হোর্ড করা বারণ। লণ্ডন থেকে কাগজপত্র আনিয়ে আমি একটা নোট পেশ করে বলি অবিলম্বে কলকাতা শহরে পুরো র‍্যাশনিং প্রবর্তন করা হোক। আর মফঃস্বলে আংশিক র‍্যাশনিং। বলো অন্যায় করেছি?" বিজন তার মোটা চশমার কাঁচ দিয়ে মিট মিট করে তাকায়।

"না, অন্যায় নয়। ঠিকই তো করেছ।" মানস সমর্থন জানায়।

"কে শোনে কার কথা! আমার বস্ মিস্টার বেনেট আমার নোটের উপর লেখেন, ক্যালকাটা ইজ নট লণ্ডন, বেঙ্গল ইজ নট ব্রিটেন। দেয়ার উইল বি নো ইনভেসন, নো শর্টেজ, নো হোর্ডিং, নো ব্ল্যাক মার্কেটিং। র‍্যাশনিং উইল বি ইমপসিবল টু এনফোর্স। তিনি আমাকে দয়া করে ডেকে পাঠান। বলেন, ইউ মে বি আ গ্রেট স্কলার। বাট আই অ্যাম আ প্র্যাকটিকাল ম্যান। কেমব্রিজের ছাত্ররা বিদ্বান হয়, অক্সফোর্ডের ছাত্ররা চৌকষ। তবে অক্সফোর্ডের পড়াশুনা শেষ করার আগেই আমাকে যুদ্ধে যেতে হয়। যুদ্ধশেষে আমাকে নমিনেট করে বেঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। তখন থেকেই আমি হাতে কলমে শাসনকার্য শিখে চুল পাকিয়েছি। আর আপনি তো সেদিনকার ছেলে। আমরা যদি এখন র‍্যাশনিং প্রবর্তন করি বাজারে প্যানিক সৃষ্টি হবে। স্টক মার্কেটে শেয়ার ফল করবে। ক্লাইভ স্ট্রীট আমাদের পেছনে লাগবে। আর মাড়োয়ারীরা একধার থেকে হোর্ড করবে। ডোণ্ট টেক ইট টু হার্ট, ইয়াং বার্ডান। আমি মুখ বুজে শুনে যাই।" বিজন মাথায় হাত দিয়ে বসে।

মানস মিস্টার বেনেটের অধীনে মহকুমা হাকিম হিসাবে কাজ করেছে। তিনি একজন সৎ ও সুদক্ষ শাসক! তিনি যদি র‍্যাশনিং প্রবর্তনের প্রয়োজন না দেখেন তো সেটা বোধহয় সত্যিই নিষ্প্রয়োজন। কই, কেউ তো সে রকম প্রস্তাব কোথাও তুলছেন না। না খবরের কাগজে, না জনসভায়।

"কী এমন ক্ষতি হবে, যদি অবিলম্বে র‍্যাশনিং প্রবর্তন না করা হয়?" মানস বিজনকে সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

"আজ থেকে কাজ শুরু করলে একবছর লাগবে স্কীমটাকে ঠিকমতো চালু

করতে। তা যদি না করি তবে পরে যুদ্ধের মাঝখানে খুব বেশী দেরি হয়ে গিয়ে থাকবে। খেতে না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মরবে, লাখে লাখেও মরতে পারে। আবার সেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর। সে সময়ও তো প্র্যাকটিকাল ম্যানের অভাব ছিল না। যেটার অভাব ছিল সেটা অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। আমাদের সামনে আছে এক ভয়ঙ্কর আকাল। একটা ডিজাস্টার।” বিজন ম্লান মুখে বলে।

মানসের বিশ্বাস হয় না। সে বলে, “যুদ্ধ কোথায় যে লোকে যুদ্ধের ভয়ে র‍্যাশনিংএ রাজী হবে? যুদ্ধক্ষেত্র বহুদূরে। জাপান যুদ্ধে নামবে বলে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সে তো আর আমাদের এদিকে আসছে না।”

বিজন উত্তর দেয় না। কী যেন চিন্তা পরে। তার বদলে উদিতা কথাবার্তা চালায়। চা এসে পড়ে। চায়ের সঙ্গে কেক।

“আমার এক বোন সবিতা এখন ওয়াকি হয়েছে। তার চিঠি মাঝে মাঝে পাই। তার সাথীদের একজনের নাম ঝরনা ঘটক। তার বাবা আমাদের সিভিল সার্জন ছিলেন পাবনা শহরে। সেইসূত্রে মেয়েটিকে আমরা চিনি। মাসকয়েক আগে ডাক্তার ঘটক হঠাৎ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, ঝরনা বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। সে এখন কোথায়? জানতুম না যে পালিয়ে এসেছে, দুঃখিত হই। কিন্তু কেমন করে বলব সে এখন কোথায়। বলি, যেখানেই থাক সবিতার সঙ্গে আছে। সবিতার চিঠিতে শিবিরের ঠিকানা থাকে না। শুধু থাকে পোস্ট অফিস আর্মি বেস্। ওকে চিঠি লিখলে আর্মি বেস্ পোস্ট অফিসের ঠিকানায় লিখি। যতদূর বুঝতে পারি ওরা এখন আরাকানে। নাম করে না। বর্ণনা করে। বর্ণনাটা আরাকানের সঙ্গে মিলে যায়। আকিয়াবে আমার এক মামা থাকতেন। তাঁর মুখে বর্ণনা শুনেছি। ছবিও তাঁর আলবামে দেখেছি।” উদিতা বলে যায় অযাচিতভাবে।

মানস তো শুনেছিল যে ঝরনাকে তার মাসী না পিসী কলকাতায় নিজের কাছে রেখেছেন, তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। তার পিতামাতা তার সম্বন্ধে বিস্ময়কররূপে নীরব। সে তা হলে সত্যি সত্যি ওয়াকি হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। সম্ভবত আরকানে। ঘটকরা কি একথা জানেন?

“না, আমরা তো জানাইনি। ঝরনা যদি জানিয়ে থাকে। জানালেও মিলিটারি সীক্রেট ফাঁস করবে না। অবস্থানটার নাম করবে না। ঘটকরা যদি আকিয়াব না ভেবে চট্টগ্রাম ভেবে থাকেন তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু

নেই। আর আমিও যে সুনিশ্চিত তাও তো নয়। রেঙ্গুনেও হতে পারে।" উদিতা চাপা দেয়।

"আচ্ছা, ওদের আসল কাজটা কী?" মানস বেফাঁস প্রশ্ন করে।

"ওয়াকিদের?" উদিতা ফিক করে হেসে বলেন, "না, যা শুনেছেন তা নয়। বিলেতের মেয়েদের যুদ্ধের কাজে অংশগ্রহণের জন্যেই উইমেন্স অগ্‌জিলিয়ারি কোর গঠন করা হয়। তার সঙ্গে ইণ্ডিয়া জুড়ে দিলে যা হয় তারই সংক্ষিপ্ত নাম ওয়াকি। বিলেতের ফ্রন্ট অনেক ছোট। ভারতের ফ্রন্ট অনেক বড়ো। ওয়াকিদের ভারতের বাইরেও কাছাকাছি কোথাও পাঠানো হয়। তবে প্রধান কাজ শত্রুপক্ষের বেতার বার্তা আড়ি পেতে শোনা ও শুনে নোট করা। তার জন্যে শত্রুপক্ষের ভাষাও শিখতে হয়। সেটাকে ইংরেজীতে তর্জমা করার মতো বিদ্যেও চাই। সবিতাকেও তালিম দেওয়া হয়েছে। ঝরনাকেও। ওরা অফিসার না হলেও যা পায় তা লোভনীয়। আমি হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের চেক আসে সবিতার তরফ থেকে। তার নির্দেশ অনুসারে। সে টাকা জমা হচ্ছে আলাদা একটা অ্যাকাউন্টে ওর বিয়ের খরচ-বাবদ। ঘটকরাও কি পাচ্ছেন না ও রকম একটা চেক? মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবেই। থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত সে যখন শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন। ধরা পড়লে কি আর রক্ষে আছে?" উদিতা দু'হাতে মুখ ঢাকেন।

মানসেরও কান্না পায়। সে আর কথা বাড়ায় না। শুধু বলে "মেয়েরাও যদি ইকুয়ালিটি চায় তবে ইকুয়াল রিস্ক নিতে হবে।"

"না, না, ইকুয়াল রিস্ক নয়। নারীর পক্ষে ওটা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। অযোধ্যার লোক সীতার মতো মহীয়সীকেও বিশ্বাস করেনি। ওঁর মহান স্বামীও না। সবিতার জন্যে আমি রোজ রাত্রে প্রার্থনা করি। ওকে তো আপনি দেখেছেন। কী ডানপিটে মেয়ে! ওর হাতে রিভলভার থাকলে ও আত্মরক্ষা করবে। আর নয়তো আত্মহত্যা। হ্যাঁ, ওদের রিভলভার রাখতে দেওয়া হয়।" উদিতা বলে।

কলকাতা থেকে ফিরে ঝরনা সম্বন্ধে এসব খবর মানস যুথিকাকে শোনায়। সে স্তম্ভিত হয়। তার চোখে জল এসে পড়ে।

"কিন্তু খবরদার!" মানস ওকে সাবধান করে দেয়। "ঘটকেরা যেন জানতে না পান যে আমরা এর বিন্দুবিসর্গ জানি। আর শহরের লোকের

স্বভাব তো সেই অযোধ্যার লোকেরই মতো। ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।"

"ত্যাখ, ওরকম একটা কানাঘুষা নতুন নয়! ছ'মাস কেটে গেল। মেয়ে একবারও মা বাবাকে দেখতে আসে না। মা যদিও অসুস্থ। এটা যত বড়ো সীক্রেট মনে করেছ তত বড়ো নয়। তা ছাড়া আমি বেস্ পোস্ট অফিস থেকে ডাক্তার সাহেবের নামে চিঠি আসে এটাও কি কারো নজরে পড়েনি? দুই আর দুই মিলে চার হয়। তবে আমি অতটা ভেবে দেখিনি।" যূথিকা হাসি চাপে।

দু'জনেই স্থির করে যে ডাক্তার দম্পতীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে ঝরনার প্রসঙ্গ ওরা এড়িয়ে যাবে। ওঁরা যদি আপনা থেকে কিছু বলেন সেকথা আলাদা।

মাসকয়েক বাদে একদিন ডাক্তার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। বলেন, "শুনেছেন নিশ্চয়ই? উল্লাসের এত কী আছে? মনে হচ্ছে সারা শহর উথাল পাথাল। বেশীর ভাগ লোকই জাপানের বীরত্বের প্রশংসা করছে। আরে, এটা কি একটা বীরত্বের নমুনা হলো? যুদ্ধঘোষণা না করেই অতর্কিতে পার্ল হারবারে হানা দিয়ে সব ক'টা জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া কি একটা বাহাদুরি না ট্রেচারি?"

মানসের রেডিও ছিল না। চাকরি ছেড়ে দেবে বলে সে আর বিলাসিতা বাড়ায়নি। খবরের কাগজ কলকাতা থেকে দেরিতে আসে। পার্ল হারবারের খবরটাও তার দেরিতে পাবার কথা। সে চমকে উঠে বলে, "এ যে সাংঘাতিক খবর! জাপান কি বুঝতে পারছে না যে আমেরিকাও একদিন চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে? যুদ্ধ শুরু করে দিতে যে কোন দেশ পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ করা তার হাতে নয়।"

ডাক্তার সাহেব এর পরে আসল কথাটা পাড়েন। "আপনার কি মনে হয় ওরা অমনি অতর্কিতে বার্মায় ইংরেজদের ঘাঁটিতে হানা দেবে?"

"দিতে পারে। কিন্তু অমনি অতর্কিতে নয়। সিঙ্গাপুর গেলে তো বার্মার পালা। সিঙ্গাপুর যাবে না। মালয় যাবে না। বার্মাও দুর্ভেদ্য।" মানস অভয় দেয়। সে বুঝতে পারে যে ঝরনা কোথায় আছে সেটা তার বাপের অজানা নয়।

সেদিন ডাক্তার ঘটক ভেঙে বলেন না যে তাঁর কন্যার জন্যেই তিনি চিন্তিত,

বার্মার জন্যে নয়। মানস তাঁকে আভাস দেয় না যে ঝরনা সম্ভবত বার্মায়। মাস দুই বাদে তিনি আবার ছুটে আসেন। রাগতভাবে বলেন, "আপনি, মশায়, একজন ফল্‌স প্রোফেট। সিঙ্গাপুরে জাপানীরা মালয়ের জঙ্গল ভেদ করে ঢুকেছে। এটা কারো মাথায় আসেনি। মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্স হচ্ছে নো ইন্‌টেলিজেন্স। আগে থেকে জানলে ডানকার্কের মতো অপসরণ করতে পারা যেত। জাহাজের তো অভাব ছিল না। শুনেছেন তো চৌষট্টি হাজার সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে সতেরো হাজার ব্রিটিশ, পনেরো হাজার অস্ট্রেলিয়ান, বত্রিশ হাজার ভারতীয়। হলদে মানুষের কাছে শাদা মানুষের মাথা হেঁট হয়েছে বলে শহরের অধিকাংশ লোক আনন্দে আত্মহারা। এদিকে যে কালো মানুষেরও মাথা নতুন করে হেঁট হলো—এবার হলদে মানুষের কাছে—তার জন্যে বেদনাবোধ নেই। আমার অবস্থাটা এখন চোরের মায়ের মতো। ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারিনে। আমি কি পাগল হয়ে যাব?"

"কেন? কেন?" মানস আঁতকে ওঠে।

"এতদিন কাউকেই জানতে দিইনি যে আমার মেয়ে ঝরনা আমার অমতে ওয়াকিতে যোগ দিয়েছে। সব চেয়ে খারাপটাই তো লোকে ভাবে। কী করে ওদের বোঝাব যে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারাও দেশের বিপদে সাড়া দিয়েছে? দেশের বিপদ নয় তো কার বিপদ? ইংলণ্ডের বিপদ? এই যে সিঙ্গাপুর গেল এটা কি ভারতের পূর্বদিকের গেটওয়ে নয়? কত বড়ো একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে মা আমার বার্মায় উপস্থিত হয়। মালয় গেছে, এরপরে বার্মাও যাবে। আহাহা! মল্লিক সাহেব, আমি আর সইতে পারছিনে। নারীর প্রাণের বাড়া তার মান ইজ্জত।" ডাক্তার সাহেব চোখে রুমাল দেন।

"আপনি কেমন করে জানলেন যে ঝরনা এখন বার্মায়।" মানস সুধায়।

"ওর শেষের দিকের চিঠিগুলোতে তার ইঙ্গিত ছিল।" তিনি উত্তর দেন।

জাহাজ ডুবছে দেখলে সকলের আগে মহিলাদের ও শিশুদের লাইফবোটে চাপিয়ে চালান দেওয়া হয়। এ নিয়ম যুদ্ধক্ষেত্রেও কি পালন করা হবে না? মানস ধরে নেয় যে সময় থাকতে ওয়াকিদেরও জাহাজে করে জাপানীদের নাগালের বাইরে চালান করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার সাহেবকে অভয় দিয়ে

বাড়ী পৌঁছে দিতে যায়। শুনতে পায় ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ। ঝরনার মা কাঁদছেন।

কান্নার আওয়াজ থেকেই শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যায় যে ইংরেজদের পরাজয়ের সঙ্গে ডাক্তার পরিবার জড়িত। দুই আর দুই মিলে চার হয়। ঝরনা ঘটক ওয়াকিদের একজন। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নিয়ে কলকাতা রওনা হন। ফিরে আসেন না। শোনা যায় তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। আরো বড়ো জেলায়।

যুথিকা বলে, "জানতে ইচ্ছে করে ঝরনার কী হলো।"

"জানতে পাবে যুদ্ধের পরে। মাঝখানে নয়। মিলিটারি সীক্রেট। লোকে অবশ্য যতরকম উড়ো গুজব রটাবে।" মানস গুজবে কান দেয় না।

এর পরে শোনা গেল জাপানীরা মালয় থেকে বার্মায় ঢুকেছে। এক এক করে শহর দখল করছে। ইংরেজরা তৈরি ছিল না। হটে আসছে আর হটবার সময় ঘরবাড়ী, জলের কল, পথঘাট, নদীর পুল, কলকারখানা, তেলের খনি, চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়ে আসছে। যাতে জাপানীদের ভোগে না লাগে। এর নাম ডিনায়াল পলিসি। গুজব শোনা যাচ্ছে খনি ধ্বংস করার সময় খনির ভিতরে যারা কাজ করছিল তাদেরও ধ্বংস করা হয়েছে। এর ফলে ইংরেজবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্মা থেকে শরণার্থীরা পালিয়ে আসছে, কেউ জলপথে, কেউ স্থলপথে। বার্মা সরকার নিজেই শরণার্থী।

বার্মা থেকে পলাতক এক ভদ্রলোকের মুখে শোনা গেল জাপানীরা নাকি বার্মার লোকদের বলছে, "আমরা এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসিনি, এসেছি তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে মুক্তি দিতে। তোমরা তোমাদের নিজস্ব সরকার গঠন করো। সে সরকার হবে আমাদের মিত্রপক্ষ।" সে রকম সরকার নাকি গঠন করা হয়ে গেছে। পাওয়ার ভ্যাকুয়াম ঘটেছিল মাত্র দু'দিন কি তিনদিনের জন্যে। সেই ক'টা দিন এক বিভীষিকা। চোর ডাকাতদের অবাধ স্বাতন্ত্র। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ওরা অবাধে খুন করেছে। জাপানী সৈনিকরাও যা করেনি। তেমনি এক বিভীষিকা আসামে ও বাংলাদেশে ঘটতে পারে। আর যেটা ঘটবার কথা সেটা জাপানীদের নয়, ইংরেজদের পোড়ামাটি নীতির প্রয়োগ। জাপানীদের বঞ্চিত করতে গিয়ে ওরা ভারতীয়দেরই বঞ্চিত করবে। জামশেদপুরকে ওরা জাপানীদের কাজে লাগাতে দেবে না। হাওড়া ব্রিজকেও না। বালী ব্রিজকেও না।

জাপানীরা যে কোন্ পথ দিয়ে ঢুকবে, কোথায় হানা দেবে, কারো জানা নেই। ইংরেজদেরও না। কোথায় বার্মা আর কোথায় মাদ্রাজ। মাদ্রাজের ব্রিটিশ গভর্নর সদলবলে শহর ছেড়ে মফঃস্বলে আশ্রয় নেন। কোথায় বার্মা আর কোথায় মেদিনীপুরের উপকূল। মেদিনীপুর থেকে রেকর্ড সরানো হয় বাঁকুড়ায়। কোথায় বার্মা আর কোথায় কলকাতা! কলকাতা থেকে অফিস সরানো হয় কৃষ্ণনগরে। ওদিকে নোয়াখালী চট্টগ্রামের নৌকা আর শাম্পান আগে ভাগে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পাছে জাপানীরা নদী পারাপার করে। চালের বস্তাও নাকি জলে ফেলে দেওয়া হয়, পাছে জাপানীরা খেতে পায়। সকলেই ভাবতে শুরু করে যে ইংরেজরা আসাম ও বাংলাদেশ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যেমন ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে সিঙ্গাপুর, মালয় ও বার্মা থেকে। সৈন্যেরা অভাবে নয়, বেকায়দায় পড়ে। লণ্ডনে কেন্দ্রীভূত মিলিটারি হাই কমাণ্ড পৃথিবীময় ছড়ানো সাম্রাজ্য রক্ষা করতে অক্ষম। বিকেন্দ্রীকরণ চাই! কিন্তু সেটা কি তারা প্রাণ ধরে করবে? ভারতীয়দের উপর ভার দিলে ফল অন্যরূপ হতে পারত।

"একেই বলে ডগ ইন দ্য মেন্‌জার! তোমরাও লড়বে না, আমাদেরও লড়তে দেবে না।" আক্ষেপ করেন কলকাতা থেকে পলাতক এক জমিদার, সুরেশ রায় চৌধুরী। এঁরা বাসা নিয়েছেন জজ কুঠির উল্টো দিকে। এঁদের ছেলেমেয়েরা মানসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে আসে। কিন্তু এঁরাই বা কদ্দিন এখানে তিষ্ঠতে পারবেন, যদি জাপানীরা এ জেলায় এসে হাজির হয়?

মানসের সঙ্গে দু'জন মিলিটারি অফিসারের আলাপ হয়। দু'জনেই ইংরেজ। মানস জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা হটতে হটতে আর কতদূর পেছোবেন? কোথায় লাইন টানবেন?"

"আমরা একটার পর একটা লাইন টানছি, কিন্তু আসল লাইনটা হচ্ছে রাঁচীর আশে পাশে। ডিফেন্সের দিক থেকে ওটাই আমাদের পক্ষে অনুকূল।" তাঁরা উত্তর দেন।

মানসের রাগ হয়। কিন্তু ঝগড়া করতে পারে না। যার কর্ম তারে সাজে। ওঁরা মিলিটারি অফিসার। ওঁরা জানেন কোন্ লাইনটা ডিফেন্সের যোগ্য। কোন্‌টা নয়। জাপানীদের বিহার পর্যন্ত এগোতে গিয়ে যথেষ্ট বলক্ষয় হয়ে থাকবে। ওঁরা তার আগে কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানবেন।

একদিন সরকারের কাছ থেকে এক গোপন সারকুলার আসে মানসের

নামে। তাতে একটা স্কীম দেওয়া হয়েছে আপৎকালে ইভাকুয়েশনের। প্রধান অফিসারগণ যে যার কাজের ভার পরবর্তী উচ্চতর কর্মচারীদের হাতে সঁপে দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসিত এলাকায় প্রস্থান করবেন। সব শেষে যাবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জাপানী কমাণ্ডারের হাতে চার্জ দিয়ে। কমাণ্ডার অনুরোধ করলে তিনি থেকে যাবেন।

মানসের মনে খেদ ছিল যে তাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে সরিয়ে জেলা জজ করা হয়েছে। স্তোক দেওয়া হয়েছে, "দেশ শাসন করতে হলে ভালো জজও তো চাই।" এখন ওই সারকুলারখানা পড়ে ওর বিশ্বাস হয় যে ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। ভাগ্যিস্ ওকে যুদ্ধকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়নি। জাপানীরা যদি আসে তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আটক থাকতে হবে না, কমাণ্ডারের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে না, তিনি অনুরোধ করলে তাঁর অধীনেকাজ করতে হবে না। অনুরোধ তো নয়, আদেশ। একেই বলে চেঞ্জ অভ্ মাস্টার্স। প্রভুবদল। জাপানীরা একটা দেশী সরকার গড়তে বলবে। কিন্তু তা বলে তারা মুক্তিদাতা নয়। মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুও তার নমুনা। জাপানীরা এলে মানসকে বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে সপরিবারে।

ওর এক বন্ধু বিহার সরকারে কাজ করে। সেও একটি গোপন সারকুলার পায়। তাতে ছিল ইভাকুয়েশন স্কীমের বিপরীত অংশ। আপৎকালে টেলিগ্রাম যাবে, "বেঙ্গল কামিং।" সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে শরণার্থী বাংলাদেশ সরকারের দফতর ও বাসস্থানের। শরণার্থী অফিসারদের উপযুক্ত পদের ও গৃহের। অবশ্য বাংলাদেশ থেকে বিহারে যাওয়া একটা সমস্যাই নয়। এককালে তো বাংলা, বিহার, ওড়িশা একটাই প্রদেশ ছিল। তখন বদলী না হতো কে? কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে যাঁরা শরণার্থী হয়ে যাবেন তাঁদের মানসম্মান থাকবে না। তাঁরা হবেন অতিথি অফিসার। কিছুদিন পরে অবাঞ্ছিত অতিথি।

"ছুটিই নিতে হবে, দেখছি। পুরো বেতনের ছুটি যথেষ্ট না হলে আধা বেতনের ছুটি। যদি সত্যিই জাপানীরা আসে।" মানস বলে যুথিকাকে।

"ওদের আসতে দেওয়া হবে না। ইংরেজরা যদি আসতে দেয় তবে ইংরেজদেরই বিদায় করতে হবে। জাপানীরা ওদের বিদায় করার আগে দেশের লোকই ওদের বিদায় করবে। বার্মার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে নয়।" যুথিকার চোখে আগুনের আভা।

"তুমি কী বলতে চাও, জুঁই ? বিপ্লব না বিদ্রোহ ?" মানস চমকে ওঠে।

"কমিউনিস্টরা করলে বিপ্লব। ন্যাশনালিস্টরা করলে বিদ্রোহ। দেখা যাক কে কার আগে করে। করবেই, কেউ না কেউ করবেই। এটা সিঙ্গাপুরও নয়, মালয়ও নয়, বার্মাও নয়। এটা বাংলাদেশ। কী আস্পর্দ্ধা ইংরেজের ! বলে কিনা ওদের পিছু পিছু বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিতে ! ছুটি নিতে চাও, নাও। কিন্তু বাংলার বাইরে যেয়ো না। তুমি বাঙালী সাহিত্যিক। সুখে দুঃখে বাঙালীর সঙ্গেই থাকবে। ছুটির বেতন না পেলেও সংসার চলবে। পলায়ন যদি করো তবে কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও প্রেস্টিজ যাবে। ইংরেজদের উচিত ছিল পালিয়ে না এসে প্রাণপণে লড়া। জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের গ্লানি কি কোনোদিন মুছবে ? মাঝখান থেকে ঝরনাটাকে বিসর্জন দিয়ে থাকবে। বেচারি এখন কোন জাপানীর কবলে পড়েছে কে জানে !" যুথিকার চোখ দিয়ে আগুন ছোটে, জলও ঝরে।

"না, না, ঝরনার কিছু হবে না।" মানস আশা করে।

"হবে গো হবে। এর নাম যুদ্ধ। এতে সব কিছু হয়। জাপানীদের আমি একরত্তি বিশ্বাস করিনে। বাংলাদেশকে কিছুতেই ওদের কবলে পড়তে দেওয়া চলবে না। ইংরেজদেরই তার আগে হটাতে হবে।" যুথিকার প্রতিজ্ঞা।

"জানিনে সৌম্যদা কী ভাবছে। ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। ও যদি একবার এদিকে আসত।" মানস স্মরণ করে।

"ওরই তো বিপদ সকলের আগে। জাপানীরা আর এক পা এগোলেই ওর অঞ্চল।" যুথিকা মনে করিয়ে দেয়।

জাপান যেদিন পার্ল হারবারে হানা দেয় তার দিনকয়েক আগে চার্চিল সরকার স্থির করেন যে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেবেন। বিশেষ করে নেহেরু ও আজাদকে। কারণ মিটমাটের কথাবার্তা প্রধানত এঁদের সঙ্গেই চলবে। এঁরা যদি যুদ্ধে সহযোগিতায় রাজী হন কংগ্রেসও রাজী হবে। গান্ধীজী তো যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। কেউ যদি তাঁকে রাজী করাতে পারেন তো নেহরু ও আজাদ।

তা ছাড়া গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তার প্রচ্ছন্ন শর্ত এই যে মিস্টার জিন্নাকেও তাঁর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে হবে। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার একচ্ছত্র অধিকার গান্ধীজীর নেই, কারণ কংগ্রেসই ভারতীয় প্রিন্স তথা পীপলদের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। হ্যাঁ, "পীপলদের"। একবচন নয় বহুবচন।

মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে মুসলিম লীগ। লীগের তরফে জিন্না সাহেব। এটা অপ্রমাণ করবার জন্যে কংগ্রেস তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করেছে মৌলানা আজাদকে। কথাবার্তা বলতে হলে কংগ্রেসের পক্ষে আজাদই বলবেন, লীগের পক্ষে জিন্না। গান্ধীজী কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবেন না, কারণ যতবারই কথা বলতে গেছেন ততবারই জিন্নার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়েছেন। জিন্না যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হন তবে গান্ধীও হয়ে যান কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বা অমুসলমান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি। তাতে তাঁর বদ্ধমূল আপত্তি। কারণ তিনি সমগ্র ভারতের সর্বসাধারণের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত। বড়লাট যদি এটা স্বীকার না করেন তো বড়লাটের সঙ্গে তিনি কথাবার্তায় যোগ দেবেন না। কংগ্রেসকে ডাকলে কংগ্রেসের হয়ে আজাদ সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু তাতে আবার উল্টো ফ্যাসাদ। আজাদ সাড়া দিলে জিন্না সাড়া দেবেন না। জিন্না সাড়া না দিলে ব্রিটিশ সরকার ফাঁপরে পড়বেন। কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট তাঁদের মূলনীতি নয়। মিটমাট হলে একই কালে লীগের সঙ্গেও হবে। নয়তো কারো সঙ্গে নয়। বড়লাট তাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করে কংগ্রেস তথা লীগের জন্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। দরজা খুলবেন যুদ্ধের পরে। নির্দলীয় সদস্যরাও জাঁকিয়ে বসেছেন।

সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিলেও মাসের পর মাস যায়, জাপান এক এক করে সিঙ্গাপুর নেয়, মালয় নেয়, বার্মা নেয়। এর পরে আসাম নেবে, বাংলাদেশ নেবে। বড়লাটের টনক নড়লেও হাত পা বাঁধা। গান্ধীজীকে তিনি ডাকবেন না। এঁদের বাদ দিয়ে জিন্নাকেও না। তা ছাড়া তাঁর নিজের ক্ষমতা খর্ব হোক এটাও তিনি চান না। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা গিয়ে গভর্নরদের ক্ষমতা খর্ব করেছেন। কেন্দ্রেও কি তাই হবে না? লিনলিথগো নাকি চার্চিলকে জানিয়ে দেন যে তিনি এতে নারাজ। তিনি বরং পদত্যাগ করবেন।

গড়িমসি করতে করতে রেঙ্গুনের পতন হয়। তখন চার্চিল সরকার বড়লাটের মারফৎ কথাবার্তা চালানো নিষ্ফল বুঝতে পেরে সার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠান। সমাজতন্ত্রী বলে জবাহরলালের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। উভয়েই ফাসিস্ট বিরোধী। বড়লাটের মতো তাঁর হাতপা বাঁধা নয়। তিনি নেহেরুকে তো আমন্ত্রণ করলেনই, আজাদকেও করলেন। নইলে নেহরু

কংগ্রেসকে রাজী করাতে পারতেন না। ক্রিপস প্রস্তাবে তাঁরা হয়তো রাজী হয়ে যেতেন, কিন্তু গান্ধীজী সরাসরি জানিয়ে দেন তিনি ওতে নারাজ।

ক্রিপস প্রস্তাবকে তিনি বলেন, "A post-dated cheque on a crashing bank." ফেল করতে যাওয়া ব্যাঙ্কের উপরে আগাম তারিখ দেওয়া চেক।

প্রস্তাবের সারমর্ম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় ইউনিয়ন যদি ইচ্ছা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হতে পারবে। কোনো একটি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য যদি ইচ্ছা করে সেও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে আলাদা হতে পারবে। যে যার ইচ্ছামতো সংবিধান রচনা করতে পারবে। আপাতত যুদ্ধের মাঝখানে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতির নেতাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন করা হবে, সামরিক ব্যতীত যাবতীয় অসামরিক বিষয় তাঁদের হাতে অর্পণ করা হবে। তাঁরাও জাপানকে প্রতিহত করার জন্যে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সামরিক তথা নৈতিক তথা বৈষয়িক।

কংগ্রেস নেতারা বলেন, "যুদ্ধের দায়দায়িত্ব যদি ভারতীয় সদস্যদের হয় তবে সামরিক দফতরটাও তাঁদের একজনকে দেওয়া উচিত। ইংরেজ সেনাপতি যথারীতি কাজ করবেন। কিন্তু শাসনপরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।"

ক্রিপস বলেন, "ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আর্মিরই একটা অঙ্গ। ব্রিটিশ আর্মির কণ্ট্রোল ব্রিটিশ মিলিটারি হাই কমাণ্ডের হাতে। যুদ্ধের মাঝখানে হাত বদল করা বিপজ্জনক। ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই সে কণ্ট্রোল হাতছাড়া করতে রাজী হবেন না।"

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্র ছিন্ন হয় এই ইস্যুতেই। কিন্তু এহো বাহ্য। শুধু সামরিক নয়, অসামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ এস্টাব্লিশমেণ্টের আন্তরিক আপত্তি ছিল। ব্রিটিশ সৈনিকরা তো নয়ই, ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও ভারতীয় কর্তাদের অধীনে চাকরি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জাপান আসছে তো কী হয়েছে? জাপানকে কয়েকটা প্রদেশ ছেড়ে দিয়েও তো অবশিষ্ট ভারতের উপর প্রভুত্ব করা যায়। পরে জাপানের কবল থেকে ফেরৎ পাওয়া যায়। জাপানীরা তো দিল্লী সিমলা পর্যন্ত পৌছচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে তো স্থানচ্যুত করছে না। স্থানচ্যুত হলে হবে আসাম সরকার তথা বাংলা সরকার।

ক্রিপসের প্রস্থানের পর রায় বাহাদুর বলেন, "স্রোতের মাঝখানে কেউ ঘোড়া বদল করে? ইংরেজরা যে করবে না এটা আমি জানতুম। গান্ধীজীও জানতেন। বেনিয়াকে বেনিয়াই চেনে। ইংরেজও বেনিয়া। গান্ধীও বেনিয়া। আর তা যদি বলেন, জিন্নাও বেনিয়া। সত্যিকার ক্ষমতা কংগ্রেসকে হস্তান্তর করলে মুসলিম লীগ অসহযোগ করত। মুসলিম রেজিমেণ্টগুলো বিগড়ে যেত। তা ছাড়া ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নিলে এটাও তো মেনে নেওয়া হতো যে মহাযুদ্ধের পরে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকেও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। শিখেরা শাসিয়ে রেখেছে ওরা মারামারি করবে। আমাদের রক্ত অত গরম নয়, তা বলে আমরাও কি বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে সহজে রাজী হব? ক্রিপস সাহেব প্রকারান্তরে মুসলমানদের উস্কে দিয়ে গেলেন, মিস্টার মল্লিক। বলে গেলেন, ওরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায় তোমরাও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেয়ো। কংগ্রেসকেও নোটিস দেওয়া হলো, সাবধান! আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে ফল হবে হিতে বিপরীত!"

মানস বড়ো আশা করেছিল যে কেন্দ্রে একটা বড়োরকম রদবদল হবে। ইংরেজ ও ভারতীয়, হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে মিলে মিশে জাপানীদের সঙ্গে লড়বে। নেতৃত্ব নেবেন নেহরু। স্টালিন যদি মার্শল স্টালিন হতে পারেন নেহেরু কেন হবেন না মার্শল নেহেরু? নেহরু যেমন করে দেশকে জাগাতে পারেন তেমন আর কে? যুদ্ধের জন্য অবশ্য। শিয়রে সংক্রান্তি। জাপান যে-কোনদিন আসাম নেবে, পূর্ববঙ্গ নেবে। হিন্দুও বিপন্ন, মুসলমানও বিপন্ন। এটা কি হিন্দু মুসলিম বিবাদের সময়? ইংরেজ বিপন্ন, ভারতীয়ও বিপন্ন। এটা কি ইঙ্গ ভারতীয় বিরোধের সময়?

## । দশ ।

রঙ্গমঞ্চে হতে যাচ্ছে 'হ্যামলেটে'র অভিনয়। থাকছেন না তাতে ডেনমার্কের যুবরাজ। হতে যাচ্ছে ভারতের বুকের উপর দিয়ে যুদ্ধ। থাকছেন না তাতে জবাহরলাল নেহরু। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট

রুজভেল্ট তথা চীনদেশের সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাইশেকপর্যন্ত বিচলিত। জাপানকে আরো বাড়তে দিলে তাঁদেরও তো বিপদ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে রুজভেল্ট স্বয়ং চিঠি লেখেন। অনুরোধ করেন ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে তার নেতাদের যুদ্ধের অংশীদার করতে। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। যুদ্ধের মাঝখানে ব্রিটিশ পলিসির হেরফের হবে না। যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের। সুতরাং ক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরই।

ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য মার্কিন সৈন্য প্রতিদিন আমদানী হচ্ছে। তাদের বাসস্থান জোগাবার জন্যে কলকাতার নাগরিকদের ঘরবাড়ী দখল করা হচ্ছে। তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে গ্রামের চাষীদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বিমানবন্দর তৈরী করা হচ্ছে। তাদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থার নামগন্ধ নেই। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে পরে একসময়। কাগজের টাকায়।

এই নাট্যাভিনয়ে গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতাদেব ভূমিকা কি নীরব দর্শকেব? গঠনকার্যে মন দিতে বললে কেউ মন দেন না। একদল প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীতে ও আইনসভায় ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল। আরেকদল জাপানী-দের সহযোগিতায় ইংরেজদের খেদিয়ে নিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব। এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন যে ইংবেজরা যে অঞ্চল থেকে অপসরণ করবে সে অঞ্চলে জাপানীদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন করে নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড বা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করতে হবে। সেখানে স্থাপিত হবে জাতীয় সরকার। সেখানে উড়বে জাতীয় পতাকা। জাপানকে সেখানে পাদপরিমাণ ভূমি দেওয়া হবে না। আর ব্রিটেনকে প্রত্যাবর্তনের ছল।

যারা রাজনীতির ধার ধারে না, ছাঁ-পোষা লোক, তারা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে জাপান রাজকে স্বাগত জানাবার জন্যে। যুগে যুগে এই কাজটি তারা করেছে। যে রাজা হবে তাকে তারা খাজনা দেবে। রাজভক্তি নিবেদন করবে। তাদের মতে—

"এক রাজা যাবে আর অন্য রাজা হবে
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

দেশের স্বাধীনতার মর্ম তারা বোঝে না। গণতন্ত্রও তাদের কাছে অর্থ-হীন। তারা শান্তিতে থাকতে চায়। যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়া তাদের কাছে একটা প্রশ্নই নয়। পেশাদার সৈনিক যারা তারাই যুদ্ধ করবে। সে

রকম লোক আর ক'জন! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। তারা সেই উলুখড়। তবে প্রাণ যাবার আগে তারা একবার পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে বিস্তর লোক। বোমার ভয়ে। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানীগুণীও আছেন।

একদিন আগাম খবর না দিয়ে সৌম্য এসে হাজির। দু'বছর বাদে দুই বন্ধুতে দেখা। মানস জিজ্ঞাসা করে, "তুমিও কি পলাতক?"

সৌম্য হেসে বলে, "কোথায় পালাব, বল তো? যেখানেই পালাই জাপানীরা তো সেখানেও ধাওয়া করবে। তোমার ইংরেজ সেনাই তো দৌড় দেবে। আপাতত যেখানেই ইংরেজ সেখানেই নিরাপত্তা। কিন্তু আখেরে?"

"কিন্তু ওরা এক জায়গায় না এক জায়গায় দাঁড়াবেই, সৌম্যদা। আমি জানি ওরা রাঁচীতে লাইন টানবে স্থির করেছে।" মানস জানায়।

"হা হা! জাপানীরা রাঁচী বাইপাস করে সরাসরি দিল্লীর দিকে যাবে। সেখানে গিয়ে দিল্লীর শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ জাফরের বংশধরদের একজনকে সিংহাসনে বসাবে। মাঞ্চুরিয়ায় যা করেছে তারই অনুকরণে। বার্মাতেও একটা তাঁবেদার সরকার তৈরি করেছে। সর্বঘটে বার্মার লোককে বসিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের উপদেষ্টা হয়েছে একজন জাপানী।" সৌম্য সংবাদ দেয়।

"তা হলে তোমাদের ভূমিকাটা কী? তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ইংরেজদের অপসরণ, জাপানীদের অধিগ্রহণ, দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহের অভিষেক। তোমাদের ভূমিকা তা হলে নীরব দর্শকের।" মানস কাতরস্বরে বলে।

"কী করি, বলো? আমাদের তো ঢাল নেই, তলোয়ার নেই। আশা করেছিলুম জাপানীরা আসছে শুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আমাদের নেতাদের হাতে ঢাল তলোয়ার দেবেন। কিন্তু তাঁর দূত সার স্টাফোর্ড ক্রিপস স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে মিলিটারির উপর খবরদারি যাঁদের হাতে আছে তাঁদের হাতেই থাকবে। তার মানে বড়লাটের সভাসদ্ হয়েও নেতারা হবেন নীরব দর্শক বা সাক্ষীগোপাল। ইংরেজ যদি পূর্ববঙ্গ থেকে হটে আসে নেতারাও হটে আসবেন, ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে এগোতে পারবেন না। আমরাও কি সঙ্গে সঙ্গে হটে আসব? তা হলে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবে কারা?

আমরা হটে এলে জনগণও কি প্রাণের দায়ে হটে আসবে না? কিংবা ঘরবাড়ীর মায়ায় জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না? পরে হয়তো ইংরেজরা যুদ্ধজাহাজ থেকে চট্টগ্রামে ল্যাণ্ড করবে ও পাল্টা আক্রমণ করবে। তখন দেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। আর আমি যদি সেখানে থাকি আমি হব দুই আগুনের মাঝখানে কাসাবিয়াঙ্কা।"

যুথিকা তা শুনে বলে, "ওমা! তুমি কেন কাসাবিয়াঙ্কার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুড়ে মরবে ও তলিয়ে যাবে?"

এই বলে সে আবৃত্তি করে ছেলেবেলায় পড়া ইংরেজী কবিতা—

"The boy stood on the burning deck,
Whence all but he had fled…"

মানস বলে, "ছেলেটির বাবা ওকে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাকে সরে যেতে বলতেন। কিন্তু তিনি শত্রুর গোলায় মারা যান। ছেলেটি তা জানে না। বার বার বাবাকে ডাকে। সাড়া পায় না। কী শোচনীয় পরিণতি! তা তুমি কেন কাসাবিয়াঙ্কা হতে যাবে? কার আদেশে?"

"আমারও তো একজন বাবা আছেন। যাঁর নাম বাপু। বাপুর আদেশ ও ছাড়া আর কী হতে পারে! আমার আশ্রমই হচ্ছে সেই ডেক যেখানে আমাকে খাড়া থাকতে হবে। তাঁর হুকুম না পেলে আমি সেখান থেকে নড়তে পারব না। ইংরেজ বা জাপানী কেউ না কেউ পোড়ামাটি নীতি মেনে শহরটাকে পোড়াবে। আশ্রমও পুড়বে। আমিও পুড়ব। এর থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় দেশটাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে না দেওয়া। ভারতকে বার্মা হতে না দেওয়া। সেটা হয়তো সম্ভব হতো চার্চিল যদি আমাদের নেতাদের বিশ্বাস করে মিলিটারি পাওয়ার দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে একটা সন্দেহ কাজ করছে।" সৌম্যর অনুমান।

"কী সন্দেহ?" মানস কৌতূহলী হয়।

"অহিংসাবাদী গান্ধীর পরামর্শে যদি ওঁরা জাপানের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করে যুদ্ধ থামিয়ে দেন সেটা হবে ব্রিটেনের দিক থেকে আরো বড়ো ক্ষতি। তার মনোবল ভেঙে পড়বে। গান্ধী না থাকলে কংগ্রেসকে পোষ মানানো তত কঠিন হতো না। ওই ক্রিপস প্রস্তাবেই সে রাজী হয়ে যেত। যত দোষ নন্দ ঘোষ ওই গান্ধী। কংগ্রেস নেতাদেরও কারো কারো ধারণা তিনি থাকতে

কোনোদিন তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসতে পারবেন না, যাঁরা আসন ছেড়েছেন তাঁরা ফিরতে পারবেন না। গান্ধীজী সেটা জানেন। দেখে এলুম তিনি আরো বেশী নিঃসঙ্গ।" সৌম্য দুঃখপ্রকাশ করে।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে গান্ধীজী যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন সৌম্যও তাদের অন্যতম। আপাতত তিনি নীরব শ্রোতা। তাঁর একমাত্র উপদেশ যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। সবাইকে স্বস্থানে থাকতে বলবে। যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালিয়ে কারাবরণ আর নয়। সে অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। নতুন অধ্যায় কী হবে তা কেউ জানে না। তিনিও চিন্তামগ্ন। সেগাঁও ইতিমধ্যে সেবাগ্রাম হয়েছে।

"অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আবার কবে হবে তা কে বলতে পারে? যদি কাসাবিয়াঙ্কা হতে হয় তো এই শেষ দেখা। তাই সেবাগ্রাম থেকে ফেরবার পথে ট্রেন বদল করে দেখা করতে এলুম।" সৌম্য যেন শেষ বিদায় নিতে চায়।

"শুনব না, শুনব না তোমার ওকথা।" যূথিকা রাগ করে। "ফের যদি অমন কথা মুখে আনো আমি অনশন করব, সৌম্যদা। এমন কিছু করতে হবে যাতে জাপানীরা আদৌ আমাদের দেশে না আসে। যদি আসে তবে এমন কিছু করতে হবে যাতে ইংরেজরা তার আগে আমাদের নেতাদের হাতে সামরিক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা একটা কাজের কথা নয়। জুলি এ বিষয়ে কী ভাবছে?"

জুলির নাম শুনে সৌম্য মিষ্টি হাসে। "জুলি? ও কি কোনোদিন কিছু ভেবেছে যে আজ ভাববে? ওর যখন যেটা খেয়াল তখন সেই অনুসারে কাজ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ করে বেড়াচ্ছে। ও কী বলে শুনবে? ও বলে, জোয়ার যখন এসেছিল তখন তোমরা তরী ভাসাওনি। তীরে দাঁড়িয়ে লগ্ন বইয়ে দিলে। পরে একটা লোক-দেখানো আন্দোলন করলে। ব্যক্তি সত্যাগ্রহ। কেন, গণ সত্যাগ্রহ নয় কেন? তার বেলা ভয়ে পেছিয়ে গেলে। জনতাকে ভয়। পাছে ওরা সেই সুযোগে বিপ্লব বাধিয়ে বসে। নেতৃত্ব কেড়ে নেয়। এখন হাজার মাথা খুঁড়লেও সেই জোয়ার আর ফিরবে না। নতুন জোয়ারের জন্যে প্রতীক্ষা করতে গেলে দল ভেঙে চৌচির হবে। রাজাজী তো প্রকাশ্যে বেঁকে বসেছেন। ভিতরে ভিতরে আরো অনেকে। তিন মাস পরে

দেখবে মন্ত্রীরা যে যার পদে ফিরে গেছেন। কেন্দ্রেও পণ্ডিতজী যোগ দিয়েছেন জাপানের ভয়ে। তোমরা হেরে গেছ, সৌম্যদা। আমি নিরুত্তর।"

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "পণ্ডিতজীর উপর জুলি এমন বিরূপ কেন?"

সৌম্য হেসে বলে, "জুলির বিপ্লবী গোষ্ঠীর মতে পণ্ডিতজী হচ্ছেন এদেশের কেরেনস্কি। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।"

"তা হলে এদেশের লেনিন কে?" যূথিকা সুধায়।

"লেনিন হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বিপ্লবের স্বার্থে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। এখন তিনি লেনিনেরই মতো কোথায় যেন আত্মগোপন করেছেন।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"বা! জুলির গোষ্ঠী যদি হয় এদেশের বোলশেভিক গোষ্ঠী তবে বাবলীর গোষ্ঠী কী?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"বোন, আমাকে জেরা করে কী হবে? আমি কী করে বলব বিপ্লবীদের কে কোন্ ধারা অনুসরণ করে? সব ক'টাই তো বিদেশী ধারা। পুঁথি থেকে পাওয়া। পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে বিপ্লব কবে কোন্ দেশে হয়েছে? বাবলীর কথা যখন উঠল তখন বলি বাবলীর সঙ্গে জুলির এখন গলাগলি বন্ধুতা নয়। চুলোচুলি শত্রুতা। এই মারে তো ওই মারে।" সৌম্য দুঃখিত।

"বিবাদটা কি মতবাদ থেকে? না আরো গভীর কারণ আছে? ব্যক্তিগত ঈর্ষাদ্বেষ নয় তো!" মানস উদ্বিগ্ন।

"না। দু'জনেই তার ঊর্ধ্বে। জুলির মতে স্বাধীনতা পেতে হলে এই তার মওকা। সুতরাং আগে ভারত, তার পরে রাশিয়া। বাবলীর মতে বিপ্লব যদি রাশিয়ায় ব্যর্থ হয় তবে ভারতেও ব্যর্থ হবে। সুতরাং আগে রাশিয়া, তার পরে ভারত। ওটা মতবাদের দ্বন্দ্ব।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"অথচ মজা এই যে দু'জনেই ওরা বিপ্লববাদী, দু'জনেরই মহাগুরু লেনিন। আমি মনে করি ওটাও একপ্রকার ধর্মান্ধতা। ফ্যানাটিসিজম।" মানস আক্ষেপ করে।

"মজা! তোমার কেবল সবতাতেই মজা। ওই যে দুটো মেয়ে চুলোচুলি করছে ওটা তোমার কাছে মজার বিষয়!" যূথিকা বকুনি দেয়।

"না, না, ঠিক চুলোচুলি নয়।" সৌম্য শুধরে দিয়ে বলে, "চিল্লাচিল্লি। স্বপনদা ওদের থামাতে পারেন না।"

"স্বপনদা! স্বপনদার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক!" যূথিকা অবাক হয়।

"স্বপনদা ওদের দু'জনকেই ডিনারে ডেকেছিলেন, যেমন আগেও ডাকতেন। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন জুলিদের বাড়ীতে অতিথি। জুলি আমাকেও ডিনারে নিয়ে যায়। টেবিলে আরো কয়েকজন ছিলেন। শুনলুম ওঁরা লিবারল হিউমানিস্ট। আলাপ আলোচনা রাজনীতিবর্জিত। কিন্তু কখন একসময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ওঠে। তার থেকে ইংরেজ বনাম জাপানী। অমনি বাবলী বলে ওঠে, জাপানকে রুখতে হবে। রাইফেল চাই। সঙ্গে সঙ্গে জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। রাইফেল দিয়ে কাকে মারবি? ইংরেজকে না জাপানীকে? বাবলী বলে, ইংরেজকে নয়, সে এখন রাশিয়ার জন্যে লড়ছে। আর যায় কোথা? বেধে যায় তর্কাতর্কি। গালাগালি। চিল্লাচিল্লি। স্বপনদা থামাতে পারেন না। আমার দিকে তাকান। আমি জুলিকে ঠাণ্ডা করি। তখন বাবলীকে ঠাণ্ডা করেন দীপিকা বৌদি। এর পর স্বপনদা বাবলীকে জেরা করেন। স্টালিনের মুখে সুভোরভের নাম কেন? সুভোরভ তো অষ্টাদশ শতাব্দীর জার আমলের সেনাপতি। ফিউডাল সামন্ত। ভূমিদাসদের দুশমন। বাবলী নির্বাক। তখন স্বপনদা বলেন, ওটা হচ্ছে রুশজাতির অতীত গৌরবের প্রতি আবেদন। সেক্ষেত্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদবুদ্ধি নেই। মতবাদে মতবাদে সংঘর্ষ নেই। আগে দেশ, তার পরে অন্য কথা। তা শুনে জুলির কী উল্লাস! ওপাশে বাবলীর মুখখানা শুকিয়ে যায় দেখে স্বপনদা সেই সঙ্গে জুড়ে দেন, সব দেশই মানুষের দেশ। ফ্রান্স যদি আমার আপনার হয়ে থাকে জার্মানী কি আমার পর? না, জার্মানীও পর নয়। জার্মানী যদি পর না হয় তবে রাশিয়া কি আমার পর? না, রাশিয়াও আমার পর নয়। রাশিয়ার জন্যেও আমার দরদ। তা শুনে বাবলী গলে যায়। কিন্তু জুলির চোখে তিরস্কার।" সৌম্য বিবরণ শোনায়।

"স্বপনদার ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়া উচিত। একজনকে ডাকলে আরেকজনকে ডাকতে নেই। ওরা এখন আর মানিকজোড় নয়।" মানস মন্তব্য করে।

যূথিকা হাফ ছেড়ে বলে, "বাঁচা গেল। ওদের ঠাণ্ডা না করলে ওরা হয়তো ছুরি কাঁটা নিয়ে খুনোখুনি করত।"

"না, না, অতদূর যেত না।" সৌম্য হেসে বলে, "ডিনারের পর দেখা গেল ওরা দিব্যি খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে। স্বপনদাও ধরিয়ে দিয়েছেন একজনের হাতে চকোলেট। আরেকজনের হাতে ক্যারামেল। বলছেন, নারীর শত্রু আর কেউ নয়, টাইম। একদিন দেখবে যৌবন চলে গেছে। রূপ ঝরে গেছে।

কেউ তোমাদের ধারে কাছেও আসছে না। তোমরাও ঝগড়াঝাটি করে কাউকেই কাছে টানতে পারছ না। রাইফেল, রিভলভার, জেল, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের জন্যে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি। যুদ্ধ বা বিপ্লবের পরেও এসব থেকে যায়। ধরে রাখে মেয়েরাই। যাও, বয়স থাকতে বিয়ে থা করো, মা হও। গান গাও, বাজনা বাজাও, নাচন নাচো, ছেলেছোকরাদের নাচাও। বাবলী আর জুলি খিলখিল করে হাসে। কে বিশ্বাস করবে যে একটু আগে এরাই দুই বিল্লীর মতো চিল্লাচিল্লি করছিল ? জুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমি ওদের বাড়ী ফিরি।"

"স্বপনদা হৃদয়বান পুরুষ, তবু পুরুষ তো! নারীকে তিনি তার নিজের জায়গায় রাখতে চান। যেমন ইংরেজরা ভারতীয়দের। তিনি ভাবতেই পারেন না বিপ্লবেও নারীর স্থান আছে, যেমন রোজা লুকসেমবুর্গের। যুদ্ধেও কি নারীর স্থান নেই, যেমন জোন অভ আর্কের ? বিপ্লবকে, যুদ্ধকে এঁরা উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন। তাই যদি হয় তবে বাবলীকে বা জুলিকে বয়স থাকতে বিয়ে থা করতে, মা হতে বলা কেন ? বিয়ে করতে চাইলেই কি বর পাওয়া যায় ? এই যেমন জুলির বর। বানপ্রস্থের বয়স না হলে কিছুতেই কি তিনি বিয়ে করতে রাজী হবেন ? বাবলীর ইতিহাস আমার জানা নেই। কিন্তু এদেশে ক'জন যুবকের এমন বুকের পাটা যে বাপ মার অমতে ওর মতো একটি খুন করতে উদ্যত মেয়েকে বিয়ে করবে ! হ্যাঁ, একজন জোয়ানের মতো জোয়ান বটে সুকুমার দত্তবিশ্বাস। মিলির অমন অপরাধের রেকর্ড আর অসুখের রেকর্ড শুনেও পেছিয়ে গেল না। এক কথায় বিয়ে করে বিলেত নিয়ে গেল। ভালো কথা, দাদা, মুস্তাফীদের খবর কী ? জাপানীরা এলে তাঁরা কী করবেন ?" যূথিকা চিন্তাকুল।

"তাঁরা সেবাপ্রতিষ্ঠান ফেলে কোথাও যাবেন না, যদিও কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কলকাতার বিপদ আরো বেশী। তার চেয়ে গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকা নিরাপদ। জাপানীদেরও তো ডাক্তারের দরকার হবে, ওষুধপত্রের দরকার হবে। ভালো কথা, শুনেছ বোধহয় ওঁদের একটি নাতি হয়েছে। হ্যাঁ, মিলিরই ছেলে।" সৌম্য সানন্দে শোনায়।

"ওমা, কবে ?" উৎফুল্ল হয় যূথিকা। "চিঠিপত্রে আভাসটুকুও দেয়নি। কেমন আছে ওরা ? মা আর ছেলে ?"

"ভালোই।" সৌম্য যতদূর জানে।

"লণ্ডনে বোমাবর্ষণ থেমেছে। না, মানস? আমি ভাবছি ওরা কি সেখানে নিরাপদ?" যূথিকার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"কলকাতার চেয়েও নিরাপদ। হিটলার এখন আর ওমুখো হবে না। যখন হবে তখন নেপোলিয়নের মতো রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে। তার পর আর একটা ওয়াটারলু।" মানস অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

যূথিকা ভোজের আয়োজন করতে যায়। মিলি ও তার বাচ্চার সন্ধানে। নিজের বাচ্চাদের সন্ধানেও লোক পাঠায়। ওরা গেছে পাড়ায় খেলা করতে।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, সেবাগ্রামে যাবার পথে তুমি তো কলকাতায় দিন-কয়েক কাটালে। কেমন দেখলে জুলির মনোভাব? ও কি বাবলীর মতো জাপানকে রুখবে? না জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজকে তাড়াবে?" মানস সুধায়।

"না, জুলি বাবলীর মতো জাপানকে রুখবে না। ও বলে, দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজত্বের মূলোৎপাটন করতে হলে জাপানের মতো বহিঃশক্তির কাঁধে ভর দিয়ে লড়তে হবে। আমেরিকানরাও লড়েছিল ফ্রান্সের কাঁধে ভর দিয়ে। ইতিহাসে আরো নজীর রয়েছে। জাপানীরা যদি জাঁকিয়ে বসতে চায় তাদের বিদায় করা তত কঠিন হবে না। জাপান যে এতদূর এসেছে সেটা আকস্মিক ঘটনা নয়, দৈবপ্রেরিত সুযোগ। আমরা যদি ওদের রুখতে যাই আমাদেরই ক্ষতি। বাবলীরা যদি রুখতে চায় ইংরেজদের কাঁধে ভর দিয়ে লড়বে। কিন্তু তাতে লাভ হবে সাম্রাজ্যবাদীদেরই। কমিউনিস্টদের কী! এসব যুক্তি অবশ্য জুলির নিজের নয়। ওর দাদাদের। তেমনি বাবলীর যুক্তি-গুলোও ওর নিজের নয়। ওর কমরেডদের। দেশের জনগণের সঙ্গে ওদের কোনো পক্ষেরই নাড়ীর যোগ নেই। জনগণ যদি জাগে তবে তাদের আত্ম-শক্তিই যথেষ্ট। জাপানীদের বা ইংরেজদের কাঁধে ভর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।" সৌম্যর বিশ্বাস।

মানস চিন্তান্বিত হয়। "তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর, সৌম্যদা, যে ভারতের জনগণ দুই হাতে দুই ফ্রন্টে লড়তে পারবে? এক হাতে জাপানীদের সঙ্গে, আরেক হাতে ইংরেজদের সঙ্গে? এই ধরো, পূর্ববঙ্গ যদি ইংরেজরা ছেড়ে দেয় আর জাপানীরা কেড়ে নেয় তবে সেখানকার লোকজন জাপানীদের সঙ্গে

লড়তে গেলে শুনবে তারা ইংরেজদের পঞ্চম বাহিনী। ধরা পড়লে কোতল হবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকজন লড়বে ইংরেজদের সঙ্গে। তখন শুনবে এরা জাপানীদের পঞ্চম বাহিনী। এরা হয়তো কোতল হবে না, কিন্তু এদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বেলুচীস্থানে বা সিন্ধে বা আজমীরে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বহুদূরে ও তাদের অজ্ঞাতসারে। সেটাও একপ্রকার জীবন্ত সমাধি। জুলিদের যুক্তি বুঝতে পারি, যদিও সমর্থন করিনে। বাবলীদের যুক্তিও বোধগম্য। যদিও সমর্থন করা শক্ত। সমর্থন করলে পোড়ামাটিও সমর্থন করতে হয়। জাপানীদের বঞ্চিত করার নামে ওরা জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানাও ধ্বংস করতে পারে। কমিউনিস্ট দোস্তরা বারণ করলে কি মিলিটারি হাই কমাণ্ড গ্রাহ্য করবে? যাতে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হয় সেই-জন্যেই তো কংগ্রেস নেতারা মিলিটারির উপর কণ্ট্রোল দাবী করেছিলেন। ভারতের স্বার্থ ওই কারখানাটাকে অক্ষত রাখা। জাপানীদের বঞ্চিত করতে গিয়ে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা কি উচিত? এটা অসম্ভব নয় যে জাপানীরা জামশেদপুর পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে ও টাটার কারখানাটা নিজেদের কাজে লাগাবে। কিন্তু তার দ্বারা জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে না জয়পরাজয় নির্ভর করবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলযুদ্ধের উপর। ভারত ভূখণ্ডের স্থলযুদ্ধের উপর নয়। পার্ল হারবারের জাহাজগুলো জাপান ডুবিয়ে দিয়েছে বলে সব ক'টা জাহাজ ডুবিয়েছে তা নয়। জার্মানরা কাবু হলে আমেরিকার আটলাণ্টিক নৌবহর প্যাসিফিকে চলে আসবে। তার সঙ্গে যোগ দেবে ব্রিটেনের নৌবহর। হিটলারের বরাতে যেমন আরেকটা ওয়াটারলু তোজোর কপালে তেমনি আর একটা ট্রাফলগার। জাপানের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত করে আমরা জয়গৌরবের ভাগী হব না, সৌম্যদা। জুলিকে এটা বুঝিয়ে দিয়ো তুমি। পরাজয়ের গ্লানির ভাগ নিয়ে আমাদের লাভ কী হবে? আর বাবলীকে বোঝানো কারো সাধ্য নয়। ওর কমরেডদের কাছে নির্দেশ আসছে মস্কো থেকে লণ্ডন হয়ে। ওর আক্কেল হবে যখন দেখবে ধনিকদের পৌষমাস শ্রমিক-কৃষকদের সর্বনাশ। সেই সর্বনাশ থেকে বিপ্লব গজালে বিপ্লবের ফলভাগী হবে কংগ্রেসের বামপন্থী দল। কমিউনিস্ট দল নয়। তখন দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্যে দিন গুনতে হবে। কে জানে কতকাল! ওরা যদি রাশিয়ার জয় নিয়েই সন্তুষ্ট হতে চায় তো ওদের সাধ মিটবে। কিন্তু ভারতের জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে না। ভারতের স্বাধীনতা যাদের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন তাদের

দৃষ্টি এখন গান্ধীজীর উপরে। দেখা যাক তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেটাই হোক সেটা অবিলম্বে গ্রহণ করা চাই। জাপানের পরবর্তী পদক্ষেপের পূর্বেই। নইলে তোমাকে হতে হবে কাসাবিয়াঙ্কা। কী ভয়ানক কথা!"

সৌম্য স্বভাবত শান্ত ও স্থিতধী পুরুষ। কিন্তু কাসাবিয়াঙ্কা হবার সম্ভাবনা তাকেও ভিতরে ভিতরে দোলা দিয়েছে। সে তার আধ্যাত্মিক সঞ্চয় থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। সে পালাবে না, মাথা হেঁট করবে না, জাতীয় পতাকা নামাবে না, আত্মসমর্পণ করবে না। জাপানীরা যদি তাকে বন্দী করে তবে বন্দী হবে, যদি গুলী করে তবে প্রাণ দেবে। সহযোগিতা নৈব নৈব চ। তথাকথিত স্বাধীনতার বিনিময়েও নয়। সে যুদ্ধবিরোধী। সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিরোধী। তার মধ্যে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলতে কেবল ব্রিটেনের নয়, জাপানেরটাও বোঝায়। তার স্থান দুই আগুনের মাঝখানেই।

"ভাখ, মানস, আমাদের যুদ্ধকালীন পলিসি আমরা পুরো একবছর ধরে ভেবে চিন্তে দেড়বছর আগে স্থির করেছি। সেই অনুসারে ব্যক্তিসত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দিয়েছি। সেটা কি আমরা প্রত্যাহার করেছি? না, সেটা বহাল রয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কথা মুখ ফুটে বললে আগে আমাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হতো। এখন দশটি কথা বললেও কেউ আমাদের গায়ে হাত দেয় না। এটাও একপ্রকার স্বাধীনতা। এমন স্বাধীনতা কি আর কোনো দেশের নাগরিকদের আছে? আমরা কি এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারি? তার আগে ওজন করে দেখতে হবে কী আমরা পাচ্ছি। তুমিই বিচার করে বলো, ভারতের অপরিমেয় লোকবল থাকতে রোজ শত শত ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে কিসের প্রয়োজনে? যুদ্ধজয়ের, না বিদ্রোহদমনের? তাদের থাকবার জায়গা জোগানোর জন্যে কলকাতা প্রভৃতি শহরের শত শত ঘরবাড়ী চব্বিশ ঘণ্টা নোটিসে দখল করা হচ্ছে কেন? তারা কি তাঁবুতে থাকতে পারত না? দেশে কি তাঁবুর আকাল? বাইরে থেকে আনিয়ে নেওয়া যেত না? তাদের ভোগের জন্যে একহাতে গোমাংস ও আরেক হাতে নারীমাংস খরিদ করা চলেছে। আমরা ভারতীয়রা টাকার লোভে বিক্রী করছি। সে টাকাও আমাদেরই রক্তনিংড়ানো টাকা। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে বহুলোকের চাষের জমিও দখল করা হচ্ছে। সেখানে নাকি বিমান বন্দর হবে। চাষের জমি গেলে ফসল ফলবে কোথায়? ভারতের

অভাব হবে না? লোকে খাবে কী? চট্টগ্রাম নোয়াখালীর নৌকা আর শাম্পান জোর করে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাছে জাপানীরা ব্যবহার করে। এদিকে ইংরেজের প্রজারাও যে ব্যবহার করতে পারছে না। তাঁদের মাল চলাচল বন্ধ। নিত্য প্রয়োজনীয় তেল নুন লকড়ির অভাব হবে না? প্রতিবাদ করতে গেলে কড়া সেনসরশিপ। সব ক'টা কাগজই এখন কর্তা-ভজা। এক গান্ধীজীর 'হরিজন' বাদে। সেটা তো এতদিন বন্ধই ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলে খুলেছে। কথাবার্তা বন্ধ হলেই আবার বন্ধ হবে। দেশের কোথায় কী ঘটছে তা জানবার কি জো আছে? রাতের বেলা যেমন বোমার ভয়ে ব্ল্যাক আউট দৈনিক পত্রিকায় তেমনি দিনের বেলা ব্ল্যাক আউট। সত্য হয়েছে প্রথম ক্যাস্থয়াটি। কংগ্রেস নেতারা যদি সরকারে যোগ দেন এ ক্যাস্থয়ালটি রোধ করা তাঁদেরও সাধ্য নয়। এই ইস্যুতেই বাপুকে কারাবরণ করতে হবে। এর থেকে তাঁকে টলানো যাবে না। সত্য আগে। আর-সব পরে। এমন কী, অহিংসাও। বাপুকে দেখে এলুম। তিনি ইস্পাতের মতো শক্ত। সত্য বলতে হবে, পূর্ণ সত্য বলতে হবে, কোনো কথা গোপন করা চলবে না। যেমন তোমার আদালতের শপথ। আমাদের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সত্যই আমাদের অস্ত্র। যুদ্ধকালে সত্যই ব্রহ্মাস্ত্র। নেহরু বা আজাদ কারো মুখ চেয়ে এ অস্ত্র আমরা ত্যাগ করব না। শর্তে যদি বনে জাতীয় সরকার হোক। আমরা বাদ সাধব না। কিন্তু আমাদের সত্যের মুখে বল্‌গা পরানো চলবে না। নেহাৎ যেগুলো মিলিটারি সীক্রেট সেগুলো আমরা ফাঁস করব না। কিন্তু এখন তো সব কিছুই যুদ্ধের নামে নিষিদ্ধ। সরকার পক্ষের প্রচারকার্য বাদে। সেটা তো মিথ্যার বেসাতি।" সৌম্য কিছুক্ষণ দম নেয়।

"কী করা যায়! যুদ্ধের প্রয়োজনে মিথ্যা তো সেই যুধিষ্ঠিরের আমল থেকেই দুনিয়ার নিয়ম। বোধহয় আরো আগে থেকে। গান্ধীজী যদি এ নিয়ম মেনে নিতে না চান তাঁকে কারাগারেই পাঠাতে হবে। কংগ্রেস নেতারা যদি এতে নারাজ হন তবে ক্ষমতার মায়া কাটাতে হবে। যুদ্ধ যতদিন সুদূর ছিল ততদিন আমি যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহের মহিমা উপলব্ধি করেছি। যুদ্ধ এখন দেশের দোরগোড়ায়। এটা কি সত্যাগ্রহের সময়?" মানস মাথা নাড়ে।

"তা হলে সিভিল লিবার্টির অর্থ কী? কেন তবে ইংরেজ ফরাসী আমেরিকানরা সিভিল লিবার্টির এত বড়াই করেন? কোন্ মুখে তাঁরা জার্মান

ও রাশিয়ানদের নিন্দা করেন? এদেশে যারা শান্তিবাদী তারা শান্তির জন্যে কাজ করলে যদি তাদের কারাগারে পাঠাতে চাও তো পাঠাও। কিন্তু তখন হয়তো দেখবে জনগণ তাদের কারামুক্ত দেখতে চায়। গান্ধীজীকে কারাগারে রেখে কংগ্রেস এদেশ শাসন করতে পারবে না। তা ছাড়া আরো কথা আছে। যে-কোনো দেশের পক্ষে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত। যুদ্ধের সিদ্ধান্তটা ভারতের উপর ছেড়ে না দিয়ে ইংলণ্ড নিজেই নিয়ে বসে আছে। তার লীগাল রাইট থাকতে পারে, কিন্তু মরাল রাইট আছে কি? গান্ধীজীর আপত্তি সেইখানে। এখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত যদি নিতে হয় নবগঠিত ভারত সরকারই নেবার মালিক। ভারতের জনমত এখনো জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেনি। জাপান বলছে না যে সে ভারতের শত্রু। সরকারী মহল যা খুশি বলুক, ভারতের জনগণ জাপানের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়। জাপান যদি গায়ে পড়ে আক্রমণ করে সেকথা আলাদা, কিন্তু তাকে খুঁচিয়ে শত্রু করে তোলাও উচিত নয়। প্রথম সুযোগে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা। বাপু তো বলেছেন এই বুড়ো বয়সেও তিনি জাপানে যেতে রাজী। প্রাণপণে চেষ্টা করবেন যাতে যুদ্ধ থামানো যায়। এর মানে কি ইংরেজের বা মার্কিনের পরাজয়? না, এতে কোন পক্ষেরই পরাজয় নয়, উভয় পক্ষেই সম্মানজনক সন্ধি। স্বাধীন ভারত যুদ্ধের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্রিটেনের উপর ছেড়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু শান্তির মতো আরেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না। যদি সেটা সম্মানজনক হয়। এই মহাযুদ্ধে শান্তিবাদীরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে তাকে শান্তির অভিমুখে পরিচালনার দায় মহাত্মার মতো শান্তিবাদীর। তিনি বেঁচে থাকতে দেশকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেবেন না। কারাগারেই অনশনে মৃত্যুবরণ করবেন। এবার তাঁর সংকল্প কেবল কারাবরণ নয়, অনিবার্য হলে অনশনে মৃত্যুবরণও।" সৌম্য আবার দম নেয়।

"শোন, সৌম্যদা, বিশ্ব রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তোমাকে জ্ঞান দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি বিশ্বযুদ্ধের দিন একতরফা সন্ধি স্থাপনের অধিকার কোনো যুদ্ধরত দেশেরই নেই। না ইংলণ্ডের, না আমেরিকার, না রাশিয়ার, না ভারতের, ভারত যদি মাঝখানে স্বাধীন হয়। গত মহাযুদ্ধে লেনিনই সে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, সেটা সম্ভব

হয়েছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে। ততদিনে রুশ সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়েছিল। আর জনগণও শান্তির জন্যে অধীর। এবারকার মহাযুদ্ধের মাঝখানে যদি বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে, তাও শুধু প্রথম বিপ্লবের নয়, দ্বিতীয় বিপ্লবেরও, তা হলে হয়তো একতরফা সন্ধি স্থাপন সম্ভব হবে। নয়তো নয়। দ্বিতীয় বিপ্লব দূরের কথা, প্রথম বিপ্লবও দূর অস্ত্। এটা রাশিয়া নয় ভারত।" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"তুমি যাই বলো, ভাই, সংগ্রাম যখন আরম্ভ করে দিয়েছি তার মোমেণ্টাম আমরা হাতছাড়া করব না। চার্চিল তাঁর শেষকথা বলে দিয়েছেন। রুজভেল্টও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সংগ্রাম এখন তার আপন মোমেণ্টামে চলবে। জাপানের আসা না আসা অবাস্তব। জাপান যদি আসে জাপান অধিকৃত অঞ্চলেও আমরা শান্তির জন্যে লড়ব। স্বাধীনতা ও শান্তি একসঙ্গেই অবতীর্ণ হবে। যদি বেঁচে থাকি বাঁচা সার্থক হবে। যদি মারা যাই মরা সার্থক হবে।" সৌম্যর শেষ কথা।

এমন সময় মণিকা এসে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দীপক এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। পেছনে ওদের মা।

## ॥ এগার ॥

সৌম্য এবার দীপকের জন্যে এনেছে একখানা অটোগ্রাফের বই। তাতে মহাত্মা প্রমুখ নেতাদের স্বাক্ষর। আর মণিকার জন্যে একখানা আলবাম। তাতে তাঁদের ফোটোগ্রাফ। বলে, "তোমরা এখন থেকে দেশের জন্যে একটু একটু ভাবতে শেখো। আমাদের তো যাবার সময় হলো।"

যূথিকা বিষম রাগ করে। "অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই। তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে। দেশকে স্বাধীন করবে। তার পর জুলিকে বিয়ে করে গৃহস্থ হবে। জুলিরও একটি খোকা হবে। যেমন মিলির হয়েছে।"

সৌম্য হেসে বলে, "তার পর একটি খুকি হবে না? যেমন তোমার?"

"হবে, হবে। তার জন্যেও বেঁচে থাকতে হবে।" যূথিকার আবদার।

"বেঁচে থাকা না থাকাটা আমার হাতে নয়, বোন। আমার সামনে এক অগ্নিপরীক্ষা। সীমান্তে বাস করছি। যে-কোনোদিন কামানের মুখে পড়তে পারি। আমাদের মানসমোহন যে ফ্রন্টে যাবার স্বপ্ন দেখছিলেন সেই ফ্রন্ট এখন হাতের নাগালে পেঁাছেছে। তবে জার্মান নয়, জাপানী, এই যা তফাৎ। তাঁর ভাগ্য ভালো, তিনি এখন নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু কে জানে, সরকার যদি তাঁকে আবার ম্যাজিস্ট্রেট করে সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়! জজিয়তী ওঁর ভালো লাগে না। এবার সামলাবেন ঠেলা জাপানী অভিযানের। রেঙ্গুনে কী হয়েছিল, শুনবে? ম্যাজিস্ট্রেটকে চার্জে রেখে আর সকলে চম্পট। মায় পুলিশ অফিসার, জেল অফিসার। কয়েদীরা ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে। বেপরোয়া ভাবে লুট করে, ধর্ষণ করে, খুন করে, ঘরে আগুন দেয়। সাক্ষীদের উপর প্রতিশোধ নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট কী করতে পারেন? সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, ইংরেজরা আগেভাগে সরিয়েছে। পাছে ধরা পড়ে বন্দী হয়। শেষে জাপানী কামাণ্ডারের হাতে চার্জ সঁপে দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে রেঙ্গুন থেকে বিদায়। তিনি তাঁকে আটকে রাখতেও পারতেন। শাসন চালানোর জন্যে। তা হলে তো আরো মুশকিলে পড়তে হতো। জাপানীরা জারি করে মার্শাল ল। ম্যাজিস্ট্রেট হন সাক্ষীগোপাল। মানস যাকে বলে নীরব সাক্ষী। সে রকম নীরব সাক্ষী হবার চেয়ে নিষ্ক্রমণই শ্রেয়। কিন্তু আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে? 'চাচা, আপনা বাঁচা' হাকিমদের নাতি হতে পারে, সেবকদের নীতি নয়। আমরা লোকসেবক, আমরা লোকের সঙ্গে বাঁচব, লোকের সঙ্গে মরব। ওদের পেছনে ফেলে পালাব না।" সৌম্য মন খুলে বলে।

"তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে, সৌম্যদা। সরকার যদি আমাকে আবার ওই জেলায় বদলী করে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট পদে, তা হলেই গেছি। আমি যে অ্যান্টিফাসিস্ট। কেউ না কেউ সে কথাটা ওদের কানে তুলবে। আমি এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ নই। সত্যের সঙ্গে আমি আপস করতে পারব না। যা থাকে কপালে। তবে আমাকে যদি বদলী করে জুঁইকে আর বাচ্চাদের সঙ্গে নেব না। বিহারে বন্ধুর বাড়ী পাঠিয়ে দেব। না, ছুটি চাইব না। সেটা কাপুরুষতা। ফ্রন্টে যেতে চেয়েছিলুম, ফ্রন্টেই যাব, নীরব সাক্ষী হব না। তবে জাপানীরা যদি সত্যি সত্যি আসে, আমাকে আটকে রাখে, মার্শাল ল জারি করে, তা হলে কিন্তু আমি নাচার। মহাত্মা নই যে অনশনে প্রাণ দেব" মানসও বলে প্রাণ খুলে।

যূথিকা উত্তেজিত হয়ে বলে, "তুমি কি ভেবেছ তোমাকে আমি একলা যেতে দেব? অত বড়ো বিপদের মুখে? বাচ্চাদের আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। ওদের ছেড়ে থাকতে পারব না। এ রকম হবে জানলে তোমাকে বলতুম, চাকরি ছেড়ে দাও। একবছর আগে চাকরি ছাড়লে কেউ বলত না যে বিপদ এড়ানোর জন্যে চাকরি ছেড়েছ। এখন ছাড়লে সকলেই ছি ছি করবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে দেশের জন্যে ছেড়েছ। হ্যাঁ, এটা একটা অগ্নি-পরীক্ষাই বটে। যেমন সৌম্যদার তেমনি তোমার, তেমনি আমার। রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?"

"আমার মনে একটুও খেদ থাকত না, সৌম্যদা, আমার বদলীটা যদি জাতীয় সরকারের নির্দেশে হতো। জানো তো ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যুদ্ধ ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে সেনাপতিদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। মন্ত্রীদেরই পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহির দায়। ভুলচুক হলে মন্ত্রীরাই লোকের আস্থা হারাবেন। সরকার পদত্যাগ করবে। একটা যদি ব্রিটেনের বেলা খাটে তবে ভারতের বেলাও খাটবে না কেন? যুদ্ধটা তো ব্রিটেনের দোরগোড়ায় নয়, ভারতেরই দোরগোড়ায়। সেনাপতিদের উপর চোখ বুজে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে কে? যাদের দেশ তারা নয়, যারা সাত সমুদ্রপারের বিদেশী রাজমন্ত্রী। এই মুহূর্তেই ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নেতাদের ডেকে নিয়ে সিভিল তথা মিলিটারি উভয়প্রকার ক্ষমতার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁরা যদি যুদ্ধের দায়িত্ব নেন তাঁদেরই উপর বর্তাবে জবাবদিহির দায়। অবশ্য সেনাপতিদেরও যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস যেটা দাবী করছে সেটা অযথা নয়। এমন কথা কি কংগ্রেস বলছে যে যুদ্ধ দফতরের ভার কংগ্রেসের একজনকে দিতে হবে? লীগের একজনকে দিলে তিনিও দেশের স্বার্থ দেখবেন। রেঙ্গুনের পুনরাবৃত্তি চট্টগ্রামে নাও হতে পারে। মণিপুরে নাও হতে পারে। আমি শান্তিবাদী নই, কংগ্রেসও শান্তিবাদী নয়, লীগও নয় শান্তিবাদী। জাপানকে রুখতেই হবে। রুখতে হবে সীমান্তেই। নইলে সে কলকাতা বাইপাস ধরে সটান দিল্লীতে গিয়ে হাজির হবে। তখন তো সরকার বদল হবেই। তার আগে নয় কেন?" মানস উত্তেজিত।

"আমারও সেই প্রশ্ন। তার আগে নয় কেন? কংগ্রেস, লীগ যেই যুদ্ধ দফতরের ভার নিক না কেন সেটা ভারতের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে গান্ধীজী সরে

দাঁড়াবেন। তবে তাঁর যুদ্ধবিরোধী মতবাদ শিকেয় তুলে রাখবেন না। সেটা তাঁর অন্তরাত্মার আদেশ। তাঁকে সে স্বাধীনতা দিতে হবে। নয়তো জেলে পুরতে হবে। তিনিও নেতাদের যুদ্ধে যোগ দেবার স্বাধীনতা দেবেন। সেটা যদি হয় তাঁদের অন্তরাত্মার নির্দেশ। এই সঙ্কিক্ষণে আমরা কেউ কাউকে বাধা দেব না, বাধ্য করব না। তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। তুমি অ্যান্টিফাসিস্ট। আমি অ্যান্টিওয়ার। অ্যান্টিওয়ার বললে অ্যান্টি-ফাসিস্টও বোঝায়। কিন্তু সামরিক অর্থে নয়। আমরা সত্যাগ্রহ করব। যেমন ব্রিটিশ অকুপেশনের বিরুদ্ধে তেমনি জাপানী অকুপেশনের বিরুদ্ধে। কিন্তু অসময়ে নয়। যথাকালে। কেউ যেন না ভাবে আমরা ইংরেজদের শত্রু, আর জাপানীদের মিত্র। শান্তিবাদীরা সকলেরই মিত্র। কারো শত্রু নয়। আরো একটা কথা, মানস। জাপানীরা যেদিন বার্মার মতো আসাম কিংবা বাংলা দখল করবে সেদিন সারা ভারত বিদ্রোহ করবে। সেটা হবে স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান। দিল্লীর সরকারের পতন অবধারিত। সে সরকার যদি কংগ্রেস-লীগ সরকার হয়ে থাকে তবে সে সরকারেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। অপসরণ ও পোড়ামাটি এই যদি হয় পলিসি তবে সরকার বদল বৃথা।" সৌম্য হুঁশিয়ারি দেয়।

"সেইজন্যেই তো সেনাপতিদের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিতে নেই।" মানস বলে।

"আমিও সেটা মানি। কিন্তু আমাদের যে আরো একজন সর্বাধিনায়ক। তিনি গান্ধীজী। আমাদের যে আরো একপ্রকার যুদ্ধ। গণসত্যাগ্রহ। যুদ্ধের সেটা নৈতিক বিকল্প। আমরা সেটা জোর করে কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাব না। শুধু এইটুকু চাইব যে উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত হলে আমরা যেন সেটা প্রয়োগ করার স্বাধীনতা পাই। যুদ্ধ এ পৃথিবীতে অনেকবার হয়েছে, অনেকবার হবে। যুদ্ধকালে গণসত্যাগ্রহ একবারও হয়নি। তার জন্যে সর্বাধিনায়কও মেলেননি। ইতিহাস কি আমাদের একবারও সুযোগ দেবে না? এবার যদি সুযোগ না পাই কবে আবার পাব? গান্ধীজী কি চিরজীবী? আমরাও কি চিরায়ু?" সৌম্যর কণ্ঠস্বরে আকুলতা।

মানসের মনে পড়ে কোথায় যেন পড়েছিল ইংরেজদের অপসরণের আর জাপানীদের অনুসরণের মধ্যবর্তী ব্যবধানে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার কল্পনা। জিজ্ঞাসা করে, তার কি কোনো সম্ভবনা আছে?

"আছে বইকি। সেটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই। সোভিয়েটের মতো পঞ্চায়েৎও আপনা আপনি গজিয়ে উঠবে। যদি টেকে আপন প্রাণশক্তির জোরেই টিকবে। আমরা গিয়ে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু উদ্যোগটা স্থানীয় লোকদের। মুশকিল হচ্ছে স্থানীয় লোকেরা যেখানে প্রধানত মুসলমান সেখানে ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে জাতীয় পতাকা ওড়াতে গেলে আপত্তি উঠবে। ওরা হয়তো লীগ নিশান ওড়াবে। এই নিয়ে মতান্তর থেকে মনান্তরও ঘটতে পারে। পাশাপাশি দুটি গ্রাম হয়তো হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। সে কী রকম মুক্তাঞ্চল! আমার আশ্রমের শাখা প্রশাখা বিভিন্ন গ্রামে। আমি কি পাকিস্তানী মুক্তাচলে বিদেশী বলে গণ্য হব? কাজেই সাবধান হতে হবে।" সৌম্য মনে মনে বামপন্থীদের হুশিয়ারি দেয়।

নৈশভোজনের সময় যূথিকা সুধায়, "দাদা, তুমি কি আজকেই ফিরে যাবে? রাতের ট্রেনে কষ্ট হবে না?"

"কলকাতায় কাল সকালে আমার একটা কাজ আছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"জুলির সঙ্গে দেখা হবে তো?" যূথিকা জানতে চায়।

"হবে সন্ধ্যার দিকে, যদি ওদের ওখানে যাই।" সৌম্য জানায়।

"তা হলে ওকে বোলো, বাঘের পিঠে চড়লে নামবার জো নেই। পিঠ থেকে নামলে পেটে যাবে। জাপানীদের কাঁধে চড়ারও একই পরিণাম। ওদের দেওয়া স্বাধীনতা আরেকরকম পরাধীনতা।" যূথিকাও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়ে না।

"সেটা আমারও মত, বোন। কিন্তু ও কি শুনবে?" সৌম্য হাসে।

"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, আমার শত্রুর যে শত্রু সে আমার মিত্র। জুলির শত্রু কে? না ইংরেজ। ইংরেজের শত্রু কে? না জাপানী। তা হলে জুলির মিত্র কে? না জাপানী।" মানসও হাসে।

"জুলি ভুল করছে। এটা কিছুতেই সত্য হতে পারে না যে জাপান ভারতের মিত্র। চীন তার কী ক্ষতি করেছিল? চীনকে আক্রমণ করতে গেল কেন? কোরিয়ার কী অপরাধ? দন্তের সহিতে জিহ্বার পীরিতি সুযোগ পাইলে কাটে। জাপান একদিন ভারতকেও তাঁবেদার বানাবে।" যূথিকা ভয় দেখায়।

"তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, বোন, গান্ধীজী এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন। মার্শাল

চিয়াং কাইশেক এসে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। চীনকে সাহায্য করাই স্বাধীন ভারতের নীতি হবে। কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ থেকে। এইখানে ইংরেজদের নীতির সঙ্গে আমাদের নীতির প্রভেদ।” সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

“কই, কংগ্রেস তো নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না!” মানস খোঁচায়।

“সেইখানেই তো কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মতভেদ।” সৌম্য কাটান দেয়।

মানস তা শুনে বলে, “একপক্ষ যদি হয় আক্রমণকারী ও অপর পক্ষ আক্রান্ত তবে নিরপেক্ষ থাকার অর্থ কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়?”

“না, তা কেন হবে? আমরা আক্রান্তকে আমাদের সহানুভূতি জানাব, সে একবারে নির্দোষ জানলে তাকে আমাদের নৈতিক সমর্থন জোগাব। প্রয়োজন হলে ডাক্তার পাঠাব, নার্স পাঠাব, ওষুধপত্র পাঠাব। কিন্তু তার পক্ষে অস্ত্রধারণ করব না। করলে এর পরে মধ্যস্থতা করতে পারব না। শান্তিস্থাপন করতে পারব না। আমাদের মুখে নিরস্ত্রীকরণের বুলি ফাঁকা শোনাবে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমরা অহিংসাবাদী। তা হলে এতদিন ধরে যে অহিংসার সাধনা করলুম সেটা হবে তাসের ঘর রচনা। একটি ফুঁয়ে ধ্বসে পড়বে। না, মানস, অন্তত একজনকে এ সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর দিক থেকে বিবেচনা করলে নিরপেক্ষতাই শ্রেয়। তবে সমগ্র দেশকে তো তিনি এখনো তাঁর সঙ্গে পাননি। সমগ্র কংগ্রেসকেও না। তাই মতভেদের উল্লেখ করেছি। দেশ যদি ইচ্ছা করে ইংরেজদের বা জাপানীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। শুধু এইটুকু হুঁশ রাখলেই হলো যে গান্ধী তার মধ্যে নেই। তাঁর যে সাধনা সেই সাধনায় তাঁকে অটল থাকতেই হবে। আমরা যারা তাঁর সঙ্গে আছি তারা তাঁকে ছাড়ব না। নিঃসঙ্গ হতে দেব না। একলা চলতে দেব না। আমরা আর ক'জন! আমাদের সামনে বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা। উত্তীর্ণ হব কি না কে জানে! আমাদের দৃষ্টি সরকারের উপর নয়, সরকার বদলের উপর নয়! আমাদের দৃষ্টি জনগণের উপর। তাদের আত্মশক্তির উপর। তড়িৎ জাগরণের উপর। ওরা যদি হিংসায় উন্মত্ত হয় তবে আমরা জানব যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে ব্যর্থতাই সিদ্ধির সোপান? যদি হাল ছেড়ে না দিই, হার মেনে না নিই। আমরা বিশ্বাস করি যে ইংরেজদেরও একদিন অন্তঃপরিবর্তন হবে। ওদের যদি হয় তবে জাপানীদেরও হবে। জার্মানদেরও হবে। সর্ব মানবের হবে। হিংসার যুগ শেষ হয়ে যাবে। নতুন যুগ আরম্ভ হবে।” সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

মানস ও যুথিকা স্তব্ধ হয়ে শোনে। তারা জানে যে এসব মুখের কথা নয়। প্রাণের কথা। অন্তরাত্মার কথা।

"তুমি তা হলে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছ? মানস সুধায়।

"হ্যাঁ, ভাই। কে জানত যে সেটাই হবে যুদ্ধের ফ্রন্ট? আমাকে তো পাঠানো হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্যে। এখন দেখছি নতুন দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আরো জটিল। এবার হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। ইংরেজ বনাম জাপানী। ইংরেজ বনাম ভারতীয়। জাপানী বনাম ভারতীয়। ভারতীয়দের একদল ইংরেজের পক্ষে। আরেক দল জাপানীর পক্ষে। কোথায় তলিয়ে গেছে হিন্দু মুসলিম সমস্যা! কিন্তু তলিয়ে গেলেও তলে তলে সক্রিয়। জনগণ বিভ্রান্ত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, তারা কি উলুখড়ের মতো প্রাণে মরবে? সেও তবু ভালো, কিন্তু এক রাজা যদি আরেক রাজার হাতে তাদের নিগ্রো ক্রীতদাসের মতো বেচে দিয়ে যায় তা হলে তার চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? যেমন বার্মায় ঘটেছে। আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মাছের রক্ত তো নয়। মানুষের রক্ত। অহিংসার বাঁধ ভেঙে যেতে চায়। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করি। বাপুকে একথা জানিয়েছি। তিনি জানেন।" সৌম্য তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকেও জানায়।

"বিষম জট পাকাতে যাচ্ছে। এ জট খুলতে না পারলে একে কাটতে হবে। তা বলে তোমাকে কেন কাসাবিয়াঙ্কা হতে হবে?" মানস পছন্দ করে না।

"সেটাই এই নাটকে আমার ভূমিকা। অন্য ভূমিকা যদি থাকে বাপু আমাকে জানাবেন।" সৌম্য এইখানে দাঁড়ি টানে।

বন্ধুকে বিদায় দেবার সময় মানস কাঁপা গলায় বলে, "এ দেখা শেষ দেখা নয়। আবার দেখা হবে।"

যুথিকা তার সঙ্গে যোগ করে, "জুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার উপর। মনে রেখো সেটাও তোমার একটা দায়িত্ব।"

সৌম্য অভিভূত হয়। বলে, "সত্যাগ্রহীরা অকারণে বা তুচ্ছ কারণে প্রাণ দেয় না। প্রাণের জন্যে কঠিন মূল্য নেয়। যদি কোনোদিন শোন যে আমি নেই তা হলে জেনো আমি স্বাধীনতাকে একচুল এগিয়ে দিয়ে গেছি। অহিংসাকেও।"

এর পরে মানস বলে তার জীবনসঙ্গিনীকে, "ওর কী ভূমিকা তা ও জানে।

সে ভূমিকা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন। কিন্তু আমার ভূমিকা আমার অজানা। আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ড্রিফ্‌ট করে চলেছি। কোথাও আমার স্থিতি নেই। আজ এ জেলা, কাল ও জেলা, কোথাও শিকড় গাড়তে পারছিনে। চাকরি ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু এখন যদি ছেড়ে দিই পরে একদিন পশতাব। ছাড়ব সেইদিনই যেদিন মনে হবে এখন না ছাড়লে পরে পশতাতে হবে।"

যূথিকা সায় দেয়। "যে কাজ করলে অনুশোচনা জন্মায় সে কাজ না করাই ভালো। আপাতত ছেলেমেয়েরা আর একটু বড়ো হোক। সৌম্যদার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। ও তো বিয়ে করেনি, ছেলেমেয়ের বাপ হয়নি। আর ওর পেছনে আছেন স্বয়ং গান্ধীজী। তোমার পেছনে কে আছে?"

"আমার পেছনে আছে গভর্নমেণ্ট।" মানসকে স্বীকার করতেই হয়।

"তা হলে সেই গভর্নমেণ্টের চাকরিতেই তোমার স্থিতি। আজ এ জেলা, কাল ও জেলা তো তোমার সার্ভিসের সকলেরই বেলা। স্থিতিশীল তো একজনও নন। অন্তত তোমার বয়সে। গতিশীল না হলে দেশকে চিনতে কী করে? স্বপনদার মতো কলকাতায় বসে? শান্তিনিকেতনে বাস করলেও তুমি দেশকে চিনতে না। তবে একঠাঁই শিকড় গাড়তে পারতে, সেটা ঠিক। কিন্তু সেই শিকড়ের তলায় কতটুকু মাটি আছে?" যূথিকার মনে সংশয়।

"যাক, স্থিতির সিদ্ধান্ত পরে নিলেও চলবে। ভূমিকার চিন্তাটাই আগে। দেশ এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে। আর দু'দিন বাদে জাপানীরা এসে পড়বে। তখন আমার ভূমিকা কী হবে? আদালতে বসে মামলার বিচার করতে থাকব? সেটাও একটা দরকারী কাজ। কত লোক মামলা করতে বা মামলা দেখতে আসে। সেটাও তো একপ্রকার নাটক। প্রত্যেকের মনে একটা কী হয়, কী হয় ভাব। আমি নিজেও জানিনে কোন্ মামলার পরিণাম কী হবে। বিয়োগান্ত না মিলনান্ত। সাজা পাবে না ছাড়া পাবে। হেরে যাবে না জিতে যাবে। উকীলরা এক একজন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন। তেমনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আদালতও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে আমি নীরব সাক্ষী নই। আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমার সিদ্ধান্তই ভাগ্যনিয়ামক। হাতে কাজ না থাকলে বিলিতী মামলার বিবরণ পড়ি। কোথায় লাগে ডিটেকটিভ নভেল।

কিন্তু এর নীট ফল হচ্ছে মানুষ জাতটার উপরেই ঘেন্না ধরে যাওয়া। কী কুৎসিত সব কেস্! মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে আমিও খুন করে লাশ লুকিয়ে রেখেছি। আমিও একজন আসামী। আমার মনের স্বাস্থ্যের জন্যে আমি পরিবর্তন চাই। চাইলে গভর্নমেণ্ট বলে, পাবলিক ইণ্টারেস্ট আগে। পার্সনাল প্রেফারেন্স পরে।" মানস আক্ষেপ করে।

এর কিছুদিন পরে কমিশনার সাহেব আসেন জেলা পরিদর্শনে। বাঙালী সিভিলিয়ান। বয়োজ্যেষ্ঠ। সারকিট হাউসে মিস্টার কিরণময় মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করতে যায় মানস। কথাপ্রসঙ্গে বলে জজিয়তী ওর ধাতে সয় না।

মজুমদার সাহেব একটু হেসে বলেন, "আমিও তো এককালে তাই ভাবতুম। জজের জীবন নেহাৎ একঘেয়ে। কারই বা ভালো লাগে! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। আত্মসম্মানের দিক থেকে, স্বাধীনতার দিক থেকে জজের মতো পদ আর নেই। ম্যাজিস্ট্রেটদের তো উপরওয়ালাদের মুখ চেয়ে কাজ করতে হয়। শেষপর্যন্ত কমিশনার পদের উপরে উঠতে দেয় না। দিলে ইংরেজদেরই দেয়। তাও আজকাল প্রোভিনসিয়াল অটোনমি হয়ে অবধি গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউনসিলার পদ উঠে গেছে। উঠে না গেলে আমাদের সার্ভিসের ইউরোপীয়ান মেম্বাররাই পেতেন। আমরা নয়। আমাকে কমিশনার পদেই পাকা করবে কি না সন্দেহ। আমার দৌড় ওই তিন হাজার টাকা অবধি। জজ হয়ে আপনি ভুল করেননি। আপনি যদি মন দিয়ে কাজ করেন শেষপর্যন্ত হবেন হাই কোর্ট জজ। আপনার বেতন হবে চার হাজার টাকা। যাতে আখেরে লাভ সেইটেই তো ভালো। কেন তবে আপনি মন্ত্রীদের খিদমদগার হতে যাবেন? বলা যেতে পারে আগেকার দিনে যাঁরা কমিশনার হতেন তাঁরা ছিলেন তিনহাজারী মনসবদার। সে যুগ তো আর নেই। ইউরোপীয়ান অফিসারদেরও আর সে প্রেস্টিজ নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বলুন, কমিশনার বলুন, সেক্রেটারি বলুন সকলেরই ক্ষমতা ও সম্মান কমে গেছে। সেই সঙ্গে কমে গেছে টাকার দাম। এই তিন হাজার টাকা কি সেই তিন হাজার টাকা? ইউরোপীয়ান অফিসাররাও হালে পানী পাচ্ছেন না। সে জাঁকজমক আর নেই। এই যুদ্ধ আমাদের পথে বসাবে, যদি বেশীদিন গড়ায়।"

"আপনি তবে জজের পদ ছেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট হতে গেলেন কেন? আখেরে যখন হাইকোর্ট জজ হতে পারতেন।" মানস কৌতূহলী হয়।

এর উত্তরে তিনি তাঁর জীবনের কথা বলেন। "জানেন তো, জজকে প্রয়োজন হলে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। চরম দণ্ড দেবার আগে জজেরা যতই সাবধান হোন না কেন, এক আধটা কেসে বিচারের ভুল হয়ে থাকেই। হাইকোর্টে সেটার সংশোধন হতে পারে, সাধারণত হয়ও। কিন্তু এমন একটি কেসের কথা জানি যেখানে তা হয়নি। ছেলেটা আপীলই করেনি। করতে দেয়নি। সে মরতেই চেয়েছিল, যদিও মারেনি। তার বাপকে খুন করেছে তার সৎমায়ের প্রেমিক। তার সৎমা তাকে জড়িয়েছে। তার বাপও অন্ধকারে চিনতে না পেরে তার নাম করেছে। সে মার্সি পিটশন পেশ করলে প্রাণদণ্ডের জায়গায় দ্বীপান্তর হতো। সেটাও সে করেনি। আমার কোর্টের কেস নয়, নইলে সে আমাকে চিরদিনের জন্যে বিবেক দণ্ড দিয়ে যেত। ওটা আমার আগে যিনি ছিলেন তাঁর কেস। বিভিন্ন সূত্রে যা শুনি তাতে আমি হকচকিয়ে যাই। সদ্য সাবালক ওই ছেলেটিকে আমি জেলখানায় দেখতে যাই। কিছুতেই সে মার্সি পিটিশন পেশ করবে না। করলে অপরাধটা মেনে নেওয়া হবে। অমন কাজ তো সে করেনি। অপরাধ স্বীকার করে মার্সি পিটিশন পেশ করলে ছোকরা বেঁচে যেত। আর আমিও জজের পদে থেকে যেতুম। কে জানে কখন ভুল করে একজন নিরীহ মানুষকে ফাঁসির হুকুম দিই এই ভয় আমার মনে হানা দেয়। যতই জপ করি না কেন নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী, ভগবানের সেই উপদেশ আমাকে শান্তি দেয় না। ভুল করে একজন নিরীহ মানুষকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে গীতার দোহাই দেওয়া আত্মপ্রতারণা। ছুটি নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও সব কথা খুলে বলি। তিনি আমাকে জুডিসিয়াল থেকে একজিকিউটিভে বদলীর আদেশ দেন। বিবেকের দায় থেকে আমি বর্তে যাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অমন করে হাইকোর্ট হারানোর সত্যি কোনো দরকার ছিল না। এ লাইনে এসে কি আমার বিবেককে নির্মল রাখতে পেরেছি ? কত ছেলেকে বিনা বিচারে ডিটেন করতে হয়েছে। পুলিশ যা বলবে তাই চূড়ান্ত। পুলিসের উপর এতখানি নির্ভরতা আগেকার দিনে ছিল না। টেররিস্টদের প্রাদুর্ভাব ইউরোপীয় অফিসারদের আর কোনো আশ্রয় রাখেনি।"

মানস তাঁর পরামর্শ চায়। "তা হলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন, মিস্টার মজুমদার। আমাকে তো ওঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার বেলা পুনর্বিবেচনার আশা নেই। একজিকিউটিভও তো আর লোভনীয়

নয়। টেররিজম গেছে, তার জায়গায় এসেছে কমিউনিজম। বিনা বিচারে ডিটেন করা বন্ধ হয়নি। যদিও এই মুহূর্তে কম। ইংরেজরা রাশিয়াকে যুদ্ধে মদত দিচ্ছে। অতএব কমিউনিস্টরাও গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধকালে শান্তি দিচ্ছে। যুদ্ধের পর আবার ধরপাকড় শুরু হবে। তার চেয়েও অপ্রিয় কর্তব্য সাম্প্রদায়িক গোলমাল থামানো। থামালেও মুশকিল, না থামালেও মুশকিল। একপক্ষ বলবে, লোকটা হিন্দুদরদী ও মুসলিমবিদ্বেষী। অপরপক্ষ বলবে, মুসলিমদরদী ও হিন্দুবিদ্বেষী। মুসলমানদের দাবী, হয় মুসলিম অফিসার পাঠাও, নয় ইউরোপীয়ান অফিসার পাঠাও। বড়ো বড়ো জেলাগুলো তো প্রায়ই পূর্ববঙ্গে। সেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। সেসব জেলায় হিন্দু অফিসারদের স্থান নেই। আর আমাকে 'হিন্দু' বলে চিহ্নিত করা হবেই না কেন? আমি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক। আমি ইণ্ডিয়ান বলেই পরিচিত হতে চাই। যে-কোনো ইণ্ডিয়ানের যে-কোনো জেলায় কাজ করার অধিকার আছে। অকালে অবসর নিলে আমাকে পেনসন দেবে না। নয়তো অকালেই অবসর নিতে চাই, মিস্টার মজুমদার।"

"না, না, ওটা হবে নেহাৎ ছেলেমানুষী।" কমিশনার সাহেব বলেন। "ইংরেজরা একটা ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করছে। একতরফা মনোভাব ওদের মধ্যে নেই। ওরা মুসলিমদরদী ও হিন্দুবিদ্বেষী নয়। তবে এটাও তো মানতে হবে যে টেররিস্টরা ছিল সকলেই হিন্দু আর কমিউনিস্টরাও প্রায় সকলেই তাই। আর গান্ধী, নেহরু, সুভাষ প্রভৃতি ন্যাশনালিস্টরাও একধার থেকে হিন্দু। কাজেই হিন্দুদের উপর ব্রিটিশ মনোভাব একটু কঠোর। আর মুসলিমরা সাধারণত সহযোগিতা করছে বলে তাদের উপর একটু নরম। ব্যালান্স সব সময় ঠিক সমান থাকছে না। যোগ্যের চেয়ে অযোগ্যের কদর বেশী। সব চেয়ে অবিচার দেখা যায় মহকুমাগুলোতে। মন্ত্রীদের ইচ্ছা তো লাটসাহেব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তা হলে আর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কী করে বলা যাবে? না, অকালে অবসর নেওয়া এর প্রতিকার নয়। সেটা একপ্রকার পলায়নী বৃত্তি। এসকেপিজম। আপনি জজ হয়ে ঠিকই করেছেন। কলেকটর হলেই ভুল করতেন। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী।"

কমিশনার সাহেব পরিদর্শন করে স্বস্থানে ফিরে যান। মাসখানেক বাদে মানস তার কুঠিতে বসে কাজ করছে, চাপরাশি এসে খবর দেয় কমিশনার

সাহেবের মেম সাহেব গাড়ী থেকে নামছেন। মানস তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, "মিসেস মল্লিক বাড়ী নেই। আপনি কি একটু অপেক্ষা করবেন ?"

"না, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আপনার সঙ্গেই আমার কাজ। সেটা গোপনীয়।" তিনি আসন নিয়ে বলেন।

মানস বুঝতে পারে না কী এমন কাজ। বলে, "আচ্ছা, শুনব।"

"দেখুন, আপনার কাছে কি ইণ্ডিয়ান ডাইভোর্স অ্যাক্ট আছে ? নেই। তা হোক, আইনটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে ?" তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

"আমার কোর্টে এখনপর্যন্ত তেমন কোনো কেস আসেনি। তবে একটা আইডিয়া আছে।" মানস বিস্মিত হয়ে বলে।

"আপনি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমার ছোট ভাইয়ের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। সেও তো আপনার সার্ভিসের লোক। কাউকে বলবেন না, আমি আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে ডাইভোর্স চাই।" তিনি উত্তেজনার সঙ্গে বলেন।

"সে কী ! আপনার স্বামী আমার শ্রদ্ধাভাজন সিনিয়র। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ শুনিনি। মদ কে না খায় ? বাজী কে না রাখে ? তার জন্যে তো ডাইভোর্স করা চলে না ?" মানস অভিমত দেয়।

"না, না, তা নয়। উনি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। ওঁর কাছে মুসলমানদের সাত খুন মাফ। উনি যেসব রিপোর্ট দেন সেসব মুসলমানদের পক্ষে। তা না হলে ওরা কমিশনার পদে পাকা করবে কেন ? মুসলমানদের তোয়াজ করতে গিয়ে যে সর্বনাশটি উনি করছেন আমি একদিন তা ফাঁস করে দেব। আপিস ঘরে গিয়ে ফাইলগুলো আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" তিনি চুপি চুপি বলেন।

মানস আঁতকে ওঠে। "ভয়ানক অন্যায় করেছেন। সরকারী ফাইল পড়া একেবারে বারণ। সরকার জানতে পেলে আপনার স্বামীরই সাজা হবে। সেটা কি ভালো কাজ ?" মানস তাঁকে বোঝায়।

"কিন্তু এটাও কি ভালো কাজ হচ্ছে ? এইভাবে মুসলমানদের আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলা ? এর জন্যে কি ডাইভোর্স দাবী করতে পারিনে ? আইন কী বলে ? আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।" ভদ্রমহিলার চোখে মুখে রোষ।

"না, এর জন্যে ডাইভোর্স দাবী করা যায় না। ইচ্ছা করলে আপনি জুডিসিয়াল সেপারেশন চাইতে পারেন। কিন্তু খবরদার, প্রমাণ হিসাবে ফাইল দাখিল করবেন না। কিংবা তার নকল।" মানস শাসিয়ে দেয়। তার পর বলে, "আমি যতদূর জানি উনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা ব্যালান্স চান। মুসলমানদেরকে তাদের বখরা দিতে হবে। নয়তো মুসলমানরাও তালাক দাবী করবে। তার জন্যে লড়বে। ফলে দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে।"

"কী জানি, ভাই! আমি অত শত বুঝিনে। না, সেপারেশন নিয়ে আমি কী করব? ওতে কী ওঁর শিক্ষা হবে? যাক, ও প্রসঙ্গ যাক। মিসেস মল্লিক কখন ফিরবেন? আমার যে, অন্য এনগেজমেণ্ট আছে। আজ তা হলে উঠি। কথাটা গোপন রাখবেন কিন্তু। দু'জনকেই নমস্কার!" ভদ্রমহিলা বিদায় নেন।

মানস তাঁকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দেবার সময় বলে, "দিদি, মনে রাখবেন, স্বামীটি আপনার, কিন্তু আপিসটি আপনার নয়। ফাইলগুলি পরকীয়।"

## ॥ বারো ॥

ইতিমধ্যে গোস্বামীর জায়গায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলী হয়ে এসেছেন মানসের বন্ধু আলী হায়দার। তাঁর পরিবার কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসেননি। কবে আসবেন তার কোনো স্থিরতা না থাকায় মহিলা সমিতির সদস্যারা একবাক্যে জজ গৃহিণী যুথিকাকেই তাঁদের সভানেত্রী পদে বরণ করেছেন। তার ফলে ওকে দুপুরবেলাটা মহিলা সমিতি আর নারীমঙ্গল সঙ্ঘের কাজকর্ম নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়। মহিলারা যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের জন্যে পশমের পুলোভার, মাফলার, দস্তানা, মোজা ইত্যাদি বাড়ীতে বসে বোনেন ও সমিতির মারফৎ যথাস্থানে দান করেন। আর নারীমঙ্গল কর্মীরা ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করে আসেন, সুতো কাটা হলে শাড়ী ধুতি গামছা প্রভৃতি বুনিয়ে নিয়ে সঙ্ঘের মারফৎ বিক্রী করেন ও লাভের টাকা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। কর্মীরা অধিকাংশস্থলে পুরুষ। সচিব একজন বদান্য মাড়োয়ারী। সভানেত্রী যুথিকা।

সেও চরকা কাটে, পুলোভার বোনে। ছেলেমেয়ের উপর নজর রাখার জন্যে বাসভবনেই সমিতির ও সঙ্ঘের আফিস বসায়।

"দু'বছর বাদে আবার আমাদের দেখা। এবার পশ্চিমবঙ্গে। কেমন আছেন আপনারা ?" একদিন কল করতে এসে আলী হায়দার সুধান।

"শারীরিক অর্থে ভালোই, মানসিক অর্থে নয়। চোখের সামনে এ দুনিয়ায় কত কী ঘটে যাচ্ছে। আমি শুধু নীরব দর্শক !" মানস দুঃখ করে।

"নীরব দর্শক! আপনার ওই এক কথা। ফ্রন্টে যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। ভাগ্যিস্ যাননি। গেলে তো আপনারও পরিণাম হতো আমাদের সেই ক্যাপটেন--না, না, মেজর—ল'র মতো।" হায়দার বিষন্ন স্বরে বলেন।

"আমাদের সেই সিভিল সার্জন? কী হয়েছে তাঁর ?" মানস উদ্বিগ্ন হয়।

"বেঁচে আছেন। কিন্তু বন্দীশালায়। সিঙ্গাপুরে। জাপানীরা ওঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছে। বাড়ীতে চিঠি লিখতেও দিয়েছে। বাড়ীর লোক কলকাতা থেকে সে চিঠির নকল আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার কাছে তাঁর আসবাবপত্র গচ্ছিত ছিল। তাঁর কথামতো আমি সেসব বিক্রী করে তাঁর বাজার দেনা ও ক্লাবের বিল শোধ করেছি। উদ্বৃত্ত যা ছিল তা ক্যাপটেন মুস্তাফীর সেবাপ্রতিষ্ঠানে খয়রাত করেছি। ল আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাতে বলেছেন। মুস্তাফীও।" হায়দার বলে যান।

'তার পর আর কী খবর ? জাপানীরা তো পূব বাংলার দোরগোড়ায়। কবে ভিতরে পদার্পণ করবে ? তবু ভালো যে আপনাকে ওদের অভ্যর্থনা করতে হবে না। হয়তো আটকই করত।" মানস সহানুভূতির স্বরে বলে।

"আমি অকুতোভয়। খোদা ভিন্ন কাউকে ডরাইনে। জাপানী তো জাপানী সাক্ষাৎ শয়তান এলেও আমি ভয় পেতুম না।" হায়দার বুক ফুলিয়ে বলেন। "আমাকে চার্জ নিতে বললে আমি চার্জ নিতুম। সেইভাবে মুসলমানদের মনের জোর জোগাতুম। শহর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসত না ওরা কেউ। তবে হিন্দুদের কথা আলাদা। ওদের আতঙ্ক জাপানীদের নিয়ে ততটা নয়, যতটা সমাজবিরোধীদের নিয়ে। রেঙ্গুনের মতো লুটপাট, নারীধর্ষণ, খুনজখমের আতঙ্ক ওদেরি যেন বেশী। আমি থাকতে ওদের মধ্যেও প্যানিক ছিল না। দোকানবাজার সুরক্ষিত। কিন্তু ধানচালের আড়ত

আমরা দখল করে নিয়েছি। যাতে জাপানীদের হাতে না পড়ে। দেশের লোক বরং না খেয়ে মরবে, তবু জাপানীকে খেতে দেওয়া হবে না। এর নাম হলো ডিনায়াল পলিসি। কী করা যায়, বলুন? আমরা নাচার।"

"এইখানেই তো গান্ধীজীর আপত্তি। ডিনায়াল পলিসির শিকার জাপানীরা নয়, বাঙালীরা। আপনারা কি নৌকোগুলোও আটক করেছেন? শুনেছি কোথাও কোথাও নাকি ডুবিয়ে দিয়েছেন। নদনদীর দেশ। লোকে চলাফেরা করবে কী করে? কত লোকের রুজি রোজগার যাবে!" মানস চিন্তিত।

"সেকথা ঠিক। পাবলিক থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে। আমরাও পাবলিকের পক্ষে। কিন্তু মিলিটারি অফিসাররা কোনোরকম ঝুঁকি নেবেন না। ডিনায়াল পলিসি তো ওঁদেরই পলিসি। সিভিলিয়ান সরকারের নয়। লোকে ভুল বোঝে। যুদ্ধকালে বড়লাটের সিদ্ধান্তের উপরে জঙ্গীলাটের সিদ্ধান্ত। কী করা যায়, বলুন। এর কি কোনো প্রতিকার আছে?" হায়দার দিশাহারা।

"সেই প্রশ্নেই তো ক্রিপস প্রস্তাব ভেস্তে গেল। সেনানায়কদের সিদ্ধান্তের উপরে সিভিলিয়ান ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত। এটাই তো খোদ ব্রিটেনের রীতি। এ রীতি ভারতে প্রয়োগ করা হবে না কেন? নাৎসীরা যখন ব্রিটেন আক্রমণ করতে উদ্যত হবে তখন পরিণিবঘটিত গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কি সিভিলিয়ান ক্যাবিনেটের না মিলিটারি হাই কমাণ্ডের? কংগ্রেস নিজের জন্যে এ দায়িত্ব দাবী করছে না। করছে মুসলিম লীগের জন্যেও। জিন্না সাহেব জঙ্গীলাটের উপরওয়ালা হয়ে ওই ডিনায়াল পলিসি রদবদল করতে পারতেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই ওর ভুক্তভোগী।" মানস যুক্তি দেখায়।

"আপনার যুক্তিতে কোনো ভুল নেই, ভাই মল্লিক।" হায়দার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "কিন্তু কোথায় বাধছে, বলব? আট আটটি প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল দখল করার পর থেকে কংগ্রেস নেতাদের মাথা ঘুরে গেছে। তাঁরা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার আগে জিন্না সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেননি। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার আগেও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি। নিজেদের খুশিমতো জেলে গেছেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকার দখল। এখন দেখছেন সেটা তাঁদের একার সাধ্যে কুলোবে না। অথচ জিন্নাকেও তাঁর পাওনা দেবেন না। ওই আটটি প্রদেশে কি তাঁর কোনো পাওনা নেই? সেটা কি তিনি আগে বুঝে না নিয়ে কেন্দ্রীয়

সরকারে যোগ দিতে যাবেন ? কেন্দ্রে তাঁর দল অন্যতম শাসকদল হবে, অথচ বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে হবে বিরোধী দল। তাঁর নিজের প্রদেশ বম্বেতেই হবে বিরোধী দল। অন্য পাঁচটা প্রদেশের কথা নাই বা উল্লেখ করলুম। লীগ সদস্যদের কাউনসিলে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ? কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে চাপ দিলে সুফল কতটুকু হবে, জানিনে। জঙ্গীলাট রাগ করে ইস্তফা দিতে পারেন। জিন্না তখন কার উপর হুকুম জারি করবেন ? তা ছাড়া তাঁর আসল লক্ষ্যটা তো শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ নয়।" হায়দার বাকীটা হাতে রাখেন।

"কী সেটা ?" মানস কৌতূহল হয়।

"সেটা হচ্ছে দ্বৈরাজ্য অথবা স্বতন্ত্র রাজ্য। কংগ্রেস ও লীগ যদি একই মসনদে বসে তবে বড়ভাই ছোটভাই হিসাবে নয়, সমান শরিক হিসাবে। প্রদেশগুলোতে তিনি প্যারিটি দাবী করবেন না, সেখানকার দাবী ওয়েটেজ। কিন্তু কেন্দ্রে তাঁর পলিসি হচ্ছে ব্যালান্স অভ পাওয়ার।" হায়দার বাকীটা দেখান।

"কিন্তু সেটা তো ইংরেজদেরই পলিসি।" মানস শক্ পায়।

"সেটা নাচার হয়ে জিন্না সাহেবেরও পলিসি। দেশীয় রাজন্যরা যদি ফেডারেশনে যোগ দিতেন, যদি ফেডারল আইন সভায় তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠাতেন তা হলে কংগ্রেস কখনো একক মেজরিটি পেতো না। বাধ্য হয়ে লীগের দ্বারস্থ হতো। তখন লীগ দর হাঁকত। ফেডারেশন কেঁচে গেছে। কংগ্রেসের একক মেজরিটি জিন্নাসাহেব কিছুতেই মেনে নেবেন না। তার চেয়ে বরং দেশভাগ ভালো। আপনারা বলবেন লোকটার দেশপ্রেম নেই, লোকটা সাম্প্রদায়িক বাতিকগ্রস্ত। কিন্তু চিরকাল একটি সম্প্রদায় তার মেজরিটির জোরে শাসন করবে, আরেকটি সম্প্রদায় শাসিত হবে, এটাই বা কেমনতর নিয়তি! কংগ্রেসনেতারা মুখে যাই বলুন না কেন তাঁদের জোর আসলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটের জোর। মুসলিম ভোটটা বাহুল্য।" হায়দার অভিমানের সুরে বলেন।

"কেন ? ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা কি মুসলমান নয় ?" মানস তর্ক করে।

হায়দার এর জবাব না দিয়ে বলেন, "তারপর এটা কেমনতর ডেমোক্রাসী যেখানে চেক নেই, ব্যালান্স নেই, মেজরিটি একেবারে নিরঙ্কুশ! ইংরেজ লাটসাহেবরা থাকতেই এই! ওঁরা চলে গেলে তো বল্গাহীন স্বৈরাচার।

জবাহরলাল তো শাসিয়ে রেখেছেন যে জমিদার ও তালুকদারদের উচ্ছেদ করবেন, ক্ষতিপূরণ দেবেন না। ধনিকদের ধনাগমের উপায় কেড়ে নেবেন। কারখানা রাষ্ট্রসাৎ করবেন। বিদেশী কোম্পানীদের তল্পিতল্পা গুটোতে হবে। রাজন্যদের রাজ্য থেকে মহাপ্রস্থান। কংগ্রেস যে বামপন্থীদের কবলে পড়বে না তেমন নিশ্চয়তা কোথায়? গান্ধীজী আর কদ্দিন! তাঁর পরেই তো তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন নেহরু। এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মরবে। তাদের মধ্যে আমরা যুক্তপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও। আমাদের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘ-কাল কংগ্রেসে ছিলেন তাঁরা কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে মুসলিম লীগে ভিড়ে গেছেন। তার মানে কি তাঁরা কমিউনালিস্ট? না, জিন্নাও তেমনি কমিউ-নালিস্ট নন। তিনি চান চেক আর ব্যালান্স। যাতে নিরঙ্কুশ বামপন্থীদেরও আইনের শিকল পরানো যায়। মুসলিম লীগের পার্টি ফাণ্ডে হিন্দু জমিদার তালুকদাররাও চাঁদা দিয়েছেন। লীগ যদি কোয়ালিশনে যোগ দেয় তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করবে। যদি অপোজিশনে থাকে তা হলেও তাঁদের স্বার্থে লড়বে। তবে পাকিস্তানের আওয়াজ তোলার পর থেকে হিন্দু সাহায্য কমে গেছে। তেমনি মুসলিম সাহায্য বেড়ে গেছে। পদ্মার ওপারে দেখে এলুম গরিব মুসলমানরাও কৃষকপ্রজা দল ছেড়ে মুসলিম লীগে জোট বাঁধছে। কংগ্রেস থেকে অবশ্য আরো আগে থেকে বিদায় নিয়েছিল। কায়দে আজমের এমনি দুর্বার আকর্ষণ ”

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে মন্তব্য করে, "জিন্না দেখছি সব মানুষের কাছে সব জিনিস। যুক্তপ্রদেশে জমিদারদের রক্ষক। বাংলাদেশে জমিদারদের ভক্ষক। কংগ্রেসী-দের ভূমিকাটা ঠিক বিপরীত। যুক্তপ্রদেশে ভক্ষক। বাংলাদেশে রক্ষক।"

"তা হলে বুঝতে পারছেন তো কেন কংগ্রেস লীগের কোয়ালিশন হবার নয়। কোয়ালিশন না হলে পার্টিশন ছাড়া আর কী হতে পারে? তারই অন্য নাম পাকিস্তান। নামের মহিমায় অসংখ্য লোকের ভোট মেলে। তবে ওটার একটা কমিউনাল গন্ধ আছে, তা মানতেই হবে, মল্লিক। আমি খুব খুশি নই। এতকাল একসঙ্গে থেকে আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যাব! আমি তো খোন্দকার জাফর হোসেন নই, আমার বাড়ী তো বেঙ্গলে নয়, আমার কী লাভ! তা বলে কংগ্রেসকে কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ হতে দেওয়া যায় না। কংগ্রেস মূলত হিন্দু। এমনি এক পরিস্থিতি হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডের। স্বাধীনতার জন্যে একসঙ্গে সংগ্রাম চালাবার পর উত্তরের প্রটেস্টাণ্টরা স্বতন্ত্র

রাজ্য চায়। তারা সমগ্র দেশের ক্যাথলিক মেজরিটির আধিপত্য মেনে নেবে না। বরং ব্রিটেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে। আয়ারল্যাণ্ড দু'ভাগ হয়ে যায়। ওটা ঠিক ইংরেজদের কারসাজি নয়। মেজরিটির উপর মাইনরিটির অনাস্থা। তার চেয়ে বরং তৃতীয় পক্ষের উপর আস্থা। সেবার আয়ারল্যাণ্ডের পালা। এবার ইণ্ডিয়ার পালা। কংগ্রেস লীগ একমত হলে অখণ্ডতা। না হলে দ্বিখণ্ডতা।" হায়দার বলেন।

"কংগ্রেস লীগ একমত হলে অখণ্ডতা, একথা ঠিক। কিন্তু না হলে দ্বিখণ্ডতা কেন? ত্রিখণ্ডতা কেন নয়? শিখেরা কি লাহোর অমৃতসর বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবে? আর এদিকেও তো বাঙালী হিন্দুরা আছে। তারা যে এতদিন ধরে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করে এল সেটা কি বাংলার মসনদে মুসলিম লীগকে বসাতে? ইংরেজরা থাকে কি না সন্দেহ। যাবার আগে তারা যদি দেশটাকে আস্ত রেখে যায় হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই মিলে তাকে জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। নয়তো জাপানীরা সেকালের মগ ফিরিঙ্গীর মতো বাংলাদেশে হানা দেবে ও তার কতক অংশ দখল করে নেবে। মুসলিম লীগ কি ওদের হটাতে পারবে? যদি পারে তো সেসব অংশ পাকিস্তানে যাক। কিন্তু কলকাতা আমরা যেমন করে পারি রক্ষা করবই। জাপানীদের হাত থেকেও, ইংরেজদের হাত থেকেও, পাকিস্তানের হাত থেকেও। লাহোরে বইবে রক্তসিন্ধু, কলকাতায় রক্তগঙ্গা। দিল্লীতে রক্তযমুনা বইতে পারে, যদি পাকিস্তানীরা দিল্লী দাবী করে। অখণ্ডতা থাকবে না এটা এখন কংগ্রেস নেতারাও বুঝতে পারছেন। কয়েকটি প্রদেশ তাঁরা আলাদা হয়ে যেতে দেবেন, কিন্তু তার আগে সীমানা কাটছাঁট করতে হবে। পৃথক হয়ে যাবার পর ওরা একত্র হয়ে পাকিস্তান গঠন করতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু নেতারা চান আজ এখনি কেন্দ্রে পুরোপুরি বদল। জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে এটা অপরিহার্য। জিন্না সাহেব যদি ব্যালান্স অভ পাওয়ার চান সেটাও আপসে পেতে পারেন। কিন্তু কেবল কেন্দ্রে। প্রদেশে নয়। আগে তো কেন্দ্রে সদ্‌ভাব প্রতিষ্ঠিত হোক। পরে প্রদেশেও হবে। তখন কোয়ালিশন অবধারিত।" মানস আশাবাদী।

"হ্যাঁ, কিন্তু একটা জায়গায় গোল বাধতে পারে, মল্লিক।" হায়দার ইতস্তত করে বলেন, "গান্ধীজীর যেমন ধারণা কংগ্রেস ভারতীয়দের সকলের

একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি কংগ্রেসের, তেমনি জিন্না সাহেবেরও ধারণা মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ও তিনি মুসলিম লীগের। বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমানদের জন্যে যেসব আসন নির্দিষ্ট হবে তার সব ক'টি লীগপন্থী মুসলমানদের দিতে হবে। একটিও কংগ্রেসপন্থী মুসলিমকে না। কংগ্রেস কি এতে রাজী হবে? না হলে তো এই প্রশ্নেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন প্রস্তাব ভেস্তে যাবে।"

"যথার্থ। সেটা হৃদয়ঙ্গম করে গান্ধীজী বলতে শুরু করেছেন যে ইংরেজরা যদি অবিলম্বে ক্ষমতাত্যাগ না করে তবে তারা ভারত ত্যাগ করুক। সৈন্যদল সরাতে হবে না, বেসরকারী ইংরেজদের সরাতে হবে না, কিন্তু সরকারী ইংরেজদের সরাতে হলে। ইচ্ছে করলে ওঁরা কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে লীগের হাতে, ইচ্ছে করলে ভগবানের হাতে বা অরাজকতার হাতে। কিন্তু আগে তো একটা শূন্যতা সৃষ্টি হোক। তার পরে শূন্যতাপূরণের পালা আসবে। যেভাবেই হোক শূন্যতা পূরণ হবেই। মুসলিম লীগ ইচ্ছে করলে পাকিস্তান জবরদখল করতে পারে, কমিউনিস্টরা ইচ্ছে করলে চীনের মতো মুক্তাঞ্চল কায়েম করতে পারে। কংগ্রেস হয়তো আটটা প্রদেশ জিতে নেবে। এসব কথা অবশ্য তাঁর একার। কংগ্রেসের নয়।" মানস বুঝিয়ে বলে।

"তা হলে তিনি আর প্রতিনিধি হলেন কী করে?" হায়দার হাল ছেড়ে দেন।

"তাঁকে এখন তিন তিনটি ফ্রণ্টে লড়তে হবে। একটি তো আগেকার মতো ব্রিটিশ ফ্রণ্ট, আরেকটি হবে জাপানী ফ্রণ্ট। জিন্নাসাহেব যদি পাকিস্তানের জিগীর তুলে লড়াইতে নামেন তবে আরো একটি, মুসলিম ফ্রণ্ট। এমন সঙ্কট তাঁর জীবনে আর কখনো আসেনি। তাঁর প্রাণসংশয়। অনশনের কথাও তিনি ভাবছেন।" মানস তাঁর লেখা পড়েছে।

হায়দার হেসে বলেন, "জিন্না কবে লড়াইতে নেমেছেন যে এখন নামবেন? যখন জাপান আসি আসি করছে ও ইংরেজ যাই যাই করছে। তবে, হ্যাঁ, যেদিন দেখবেন যে ইংরেজরা যাবার সময় ভারতের ভার কংগ্রেসের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছে, মুসলিম লীগকে বখরা দিচ্ছে না, আর কংগ্রেসও ইংরেজদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করছে, লীগের সঙ্গে নয়, সেদিন তিনিও একটা জেহাদের ডাক দেবেন। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। জিন্না সবুর করবেন। ইতিমধ্যে

কংগ্রেস আরেক দফা জেলযাত্রা করতে চায়, করুক না ? মুসলমানরা কংগ্রেসের পক্ষেও থাকবে না, বিপক্ষেও থাকবে না। ইঙ্গ-কঙ্গ সংঘর্ষে ওরা নিরপেক্ষ। কিন্তু ইঙ্গ-কঙ্গ সন্ধির দিন ওদের মার মূর্তি।"

মানস বেদনা বোধ করে। অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার কেমন আছেন ? মোহিনীমোহন ধর কেমন আছেন ?

"দু'জনেই বাড়ীর মেয়েছেলেদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ইংরেজরা কখনো কলকাতা ছেড়ে যাবে না। বোমা দুটো একটা পড়বে, কিন্তু আক্রমণ তত সহজ নয়। জাপানীদের সম্বন্ধে দু'জনের দু'রকম মত। রায় বাহাদুর মনে করেন ওরা বাঙালীর শত্রু নয়, ইংরেজর শত্রু। বাঙালীর সঙ্গে গায়ে পড়ে শত্রুতা করবে না। বরঞ্চ মিত্রতা করবে। আর মোহিনীবাবু মনে করেন ওরা ফিরে যাবার আগে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে। ধনসম্পদ, শিল্পদ্রব্য, প্রাচীন নিদর্শন। জোর করে জাপানী মাল গছিয়ে দিয়ে যাবে। তা তুমি কিনতে চাও আর নাই চাও। ওরাও সাম্রাজ্যবাদী বলে ওদের লোভ আরো বেশী। ওদের চেয়ে ইংরেজ ছিল ভালো। উনি এই সময় ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের পক্ষপাতী নন। কংগ্রেস নেতাদের কাছে আবেদন নিবেদন করছেন ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া না করতে। এ বিষয়ে রায় বাহাদুরও তাঁর সঙ্গে একমত।" হায়দার বলেন।

"কেউ কি বলছে না দেশকে স্বাধীন করার এই হচ্ছে সুযোগ ?" মানস সুধায়।

"বলছে বইকি। তেমনি আরেক দল বলছে পাকিস্তান হাসিল করার এই তো মওকা। এরা যদি বলে, ভারত ছাড়ো, ওরা বলে, ভাগ করো আর ছাড়ো। গান্ধী ও জিন্নার ধ্বনিও প্রতিধ্বনি।" হায়দার মুচকি হাসেন।

"যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের জন্যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে না ?" মানস সৌম্যদার মতো কর্মীদের সম্বন্ধে পরোক্ষে প্রশ্ন করে।

"নাঃ ! যত সব ক্র্যাঙ্ক ! সৌম্য চৌধুরী বলে একজন নামকরা গান্ধীবাদী আছেন। তাঁকে কিছুদিনের জন্যে আটক করা হয়েছিল। না করলেও চলত। কারণ তাঁর কথায় কেউ কান দেয় না। বহু লোক যুদ্ধের ঠিকাদারি নিয়ে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে। বহু লোক হাতিয়ার নাড়াচাড়া করার জন্যে স্বেচ্ছায় রিক্রুট হয়েছে। মেয়েরাও চায় ওয়াকি হতে। কিন্তু আমরা তাদের প্রশ্রয় দিইনি। দুটি একটিকে কলকাতা পাঠিয়েছি। শুনছি ওয়াকি-

দের বার্মা থেকে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছে সমুদ্রপথে, যাতে ধরা না পড়ে। যুদ্ধ ব্যাপারটা এমন ট্রেচারাস। যাদের জয় করার কথা তারাই কিনা পরাজিত। কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে যে ইংরেজ অফিসাররা সারেণ্ডার করবেন জাপানী অফিসারদের কাছে? হলদে চামড়ার কাছে শাদা চামড়ার ইজ্জৎ রইল কোথায়! সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার সে অপমানের জ্বালা আমরা ভুলিনি।" হায়দার তলে তলে ইংরেজবিদ্বেষী।

"মানুষ শাদাই হোক আর কালোই হোক তার সে অপমান আমারও অপমান, আপনারও অপমান। মানুষমাত্রেরই অপমান।" মানস দুঃখ প্রকাশ করে।

এমন সময় যুথিকার প্রবেশ। খাবার সে নিজের হাতে তৈরি করেছে। বলে, "সালাম আলায়কুম, হায়দার ভাই। আপনারাও এখানে বদলী হয়ে এসেছেন জেনে দারুণ খুশি হয়েছি। কই, আমার ছোট বোনটি কোথায়?"

"আলায়কুম সালাম, ভাবীজী। আপনার ছোট বোনটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন জৌনপুরে আমাদের গরিবখানায়। জাপানীরা ফিরে না গেলে ওঁরা ফিরবেন না। তবে আমি পশ্চিমবঙ্গে বদলী হয়েছি শুনে ফিরে আসতে পারেন।" হায়দার কুণ্ঠিত ভাবে বলেন।

"একটু আগে শুনছিলুম আপনি নাকি অকুতোভয়।" মানস চেপে ধরে।

"আমি অকুতোভয় বলে কি আমার বিবিও তাই? যেখানে ইংরেজ ফৌজ পর্যন্ত দৌড় দেয় সেখানে নারী কী করে নিরাপদ বোধ করবে? আর পূর্ববঙ্গে নদীনালার সংখ্যা এত বেশী যে যুদ্ধকালে সেটা একটা মরণফাঁদ। মানুষ পালাতে চাইলে পালাবে কোন পথে? স্টীমার যদি না চলে, নৌকো যদি সরকারের হুকুমে ডুবিয়ে দেওয়া হয়? সাঁতার আমরা কেউ শিখিনি। শিখেছি ঘোড়ায় চড়তে। আমার বিবিও ঘোড়ায় চড়তে জানেন। যদিও চড়েননি বড়ো হয়ে অবধি। কিন্তু সাঁতার? কখনো কি ভেবেছি যে আমাকে বেঙ্গলে চাকরি করতে হবে? তাও পূর্ববঙ্গে? সুখেই তো ছিলুম। খাওয়াদাওয়ার এত সুখ আর কোনখানে? স্বর্গ যদি থাকে তো সে এইখানে, সে এইখানে, সে এইখানে। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, জাপানী এসে সীমান্তের ওপারে চড়াও। কী করে জানব যে জাপানীদের দৌড় এতদূর! আগে থেকে বদলী না হয়ে থাকলে আপনাদেরও একই দশা হতো, মল্লিক।"

"আমার বিবি যে আমাকে একলা ছেড়ে আসতেন না, হায়দার! ওঁর

আদর্শ একসঙ্গে বাঁচা ও একসঙ্গে মরা। শুধু বাচ্চা দুটির জন্যেই যা ভাবনা। যাক, এখানে আপাতত তেমন কোনো ভয়ের কারণ নেই। আশা করি মিসেস হায়দারকে আমরা আবার দেখতে পাব।" মানস নিরাপত্তার ভরসা দেয়।

যূথিকা সকৌতুকে বলে, "আপনি তো একজন পাকিস্তানপ্রেমিক। কিন্তু জাপানীরা যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে আপনার পরিবারের আশ্রয়স্থল হবে হিন্দুস্থান।"

"ভাবীজী, আমরা সুলতানী আমল থেকেই জৌনপুরের বাসিন্দা। আমাদের প্রজারা হিন্দু। বন্ধুবান্ধবদের অর্ধেক হিন্দু। আমরা কি কখনো ভাবতে পেরেছি যে একদিন আমাদের হিন্দুস্থান ছাড়তে হবে? গান্ধী জিন্না একমত হলে আমরা যেখানকার লোক সেখানেই হবে আমাদের হোমল্যাণ্ড। নয়তো আমরা কলকাতায় কি লাহোরে ভাগ্য অন্বেষণ করতে বাধ্য হব।" হায়দার খোলাখুলি বলেন।

"কলকাতায়!" চমকে ওঠে যূথিকা। "কলকাতা কি পাকিস্তানের সামিল হবে? ওমা, কোথায় যাব!"

"হবে না? বেঙ্গল কি মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়? কলকাতা কি বেঙ্গলের রাজধানী নয়?" হায়দারও বিস্মিত হন।

"না, না, হায়দার ভাই। তা কখনো হতে পারে না। আমরা মুসলমানদের ভালোবাসি। তাদের জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে রাজী আছি। কিন্তু কলকাতা কিছুতেই নয়। কলকাতা যে বাঙালী হিন্দুর মক্কা।" যূথিকার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

"বাঙালী মুসলমানও তো কলকাতা বলতে পাগল। ওটা ওদের দ্বিতীয় মক্কা। আগে তো জাপানকে ঠেকানো যাক। নয়তো ওরাই ফোর্ট উইলিয়ামে জাঁকিয়ে বসবে। তাতে হিন্দুর কী আর মুসলমানের কী?" হায়দার বিমর্ষ।

"তাই যদি হয় তবে দেশভাগের দাবী তুলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করতে যাওয়া কেন? বাংলাদেশ পাকিস্তান হবে জানলে কোন্ বাঙালী হিন্দু তার জন্যে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে রাজী হবে? যেখানে খোদ ইংরেজ সেনা দৌড় দিচ্ছে সেখানে কি মুসলিম সেনা একা ওদের রুখতে পারবে? যুদ্ধকালে যদি হিন্দু মুসলমানের একজাট্টা হবার প্রয়োজন থাকে

তবে শান্তিকালেই বা সে প্রয়োজন থাকবে না কেন? যুদ্ধ কি আর কখনো বাধতে পারে না? সারা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে যদি দেশ ভাগ করতে হয় তো করা যাবে, কিন্তু এখন থেকে কেউ কথা দিতে রাজী নয়। না ইংরেজ, না কংগ্রেস। আমাদের মুসলিম বন্ধুরা আমাদের যেন ভুল না বোঝেন।" মানস ব্যথা বোধ করে।

"দেখুন, ভাই মল্লিক, আমরা এখন এমন এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছি যখন আমাদের ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করতে হবে। জাপান এদেশে খুঁটি গাড়তে পারবে না, যদিও গ্রাস করবে কতক অংশ। সেটা সাময়িক। কিন্তু ইংরেজ গেলে যে শূন্যতাটা হবে সেটা সাময়িক নয়, সেটা চিরস্থায়ী। সেইজন্যে চাই একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কংগ্রেস চিরস্থায়ী নয়, লীগ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু হিন্দু চিরস্থায়ী, মুসলমান চিরস্থায়ী। মেজরিটি চিরস্থায়ী, মাইনরিটি চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী মেজরিটির সঙ্গে চিরস্থায়ী মাইনরিটির এমন কী বন্দোবস্ত হতে পারে যা চিরস্থায়ী? কেন্দ্র যদি একটাই হয় তবে আমাদের সিকিভাগ দিলে নেব না, দিতে হবে অর্ধেক ভাগ। হিন্দু মুসলমান সমান সমান। হিন্দী উর্দু সমান সমান। শাসনক্ষমতা সমান সমান। চাকরিবাকরি সমান সমান। পেট্রনেজ সমান সমান। কিন্তু আমরা জানি যে দাঁড়িপাল্লা সমান রাখা সম্ভবপর হবে না। কার্যকালে উনিশ বিশ হবেই। তা নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধবেই। সেইজন্যে আমাদের মতে ইংরেজ থাকতেই দেশ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া ভালো। হিন্দুর ভাগে পড়বে হিন্দু-মেজরিটি প্রদেশপুঞ্জ। মুসলমানদের ভাগে মুসলিম-মেজরিটি প্রদেশগুচ্ছ। হিন্দুরাই পাবে সিংহের ভাগ। তা হলে তাদের আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? শিখরা যদি আপত্তি করে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া মুসলমানরাই করবে সেটা হবে পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা। তাদের তো কোনোখানেই মেজরিটি নেই। নয়তো তাদের জন্যে আলাদা একটা শিখিস্থান তৈরী করে দেওয়া যেত।" হায়দার দুই কাঁধ তুলে অসহায়তা জানান।

"ইংরেজ থাকতেই?" মানস পরিহাস করে। "কোথায় থাকতেই? কে জানে এ যুদ্ধের পরিণতি কী হবে! ইংরেজ একটা কিছু করে দিলেই যে সেটা ধোপে টিকবে তা নয়। যাদের দেশ ভাগ হবে তাদের সম্মতি থাকা চাই। নেতারা বাঁদরকে দিয়ে পিঠে ভাগ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু যার ভাগে কম পড়বে সে কি চুপ করে সহ্য করবে? ততদিন বাঁদর হয়তো জাহাজে

উঠে বসে আছে। তাকে দায়ী করতে পারা যবে না। গান্ধীজী আগে থেকেই বলে রেখেছেন যে তিনি এর মধ্যে নেই। তিনি ক্ষমতা চান না। তিনি পিঠে থাবেন না। কংগ্রেস অবশ্য জোর করে কোনো প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আটকে রাখবে না, কিন্তু উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদি লীগের চেয়ে কংগ্রেসকেই পছন্দ করে তাকে জোর করে লীগের কোলে তুলে দেবে না। রাজাজী কাটছাঁট করার কথাও বলেছেন। কগ্রেসনেতারা বেঙ্গল থেকে কতক অংশ কেটে রাখতেও পারেন যেমন কলকাতা। যেটা হিন্দুপ্রধান। তা ছাড়া এসব সিদ্ধান্ত তো কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে নেওয়া হবে, যেখানে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা কেউ থাকবেন না। ভারতীয় প্রতিনিধিরাই নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করবেন। পাকিস্তান সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ অ্যাওয়ার্ড হিসাবে সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা, ব্রাদার, ইংরেজ যদি না থাকে কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আহ্বান করবে কে? ইংরেজরা কারো উপর শাসনভার দিয়ে না গেলে গান্ধীজীর বিশ্বাস কিছুদিন অরাজকতার পর একটা প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট গড়ে উঠবে। কিন্তু একটা কেন? তিনটে কেন নয়? দিল্লীতে যেটা গড়ে উঠবে সেটাকে বেঙ্গল মেনে নেবে কেন? পাঞ্জাব মেনে নেবে কেন? এরাও নিজের নিজের প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট গড়ে তুলবে। তা হলে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিও একটা নয়, তিনটে। জবাহরলাল কি মনে করেন তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই একটিমাত্র কনস্টিটিউশন তৈরি হবে? জিন্নার পরিকল্পনা অনুসারে আরো একটি নয়? কংগ্রেস কি লীগকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছে? গান্ধীজী কি মুসলমানদের প্রেমের জোরে জয় করেছেন? বাকী থাকে ভোটের জোর। সেই ভোটও তো স্বতন্ত্র ইলেকটোরেটে বিভক্ত। কংগ্রেসের ভোটের জোরে কনস্টিটিউশন হলে সবাই সেটাকে মান্য করবে কেন? একটার জায়গায় যদি তিনটে কনস্টিটিশন হয় তবে দুটো তো মুসলমানদের ভোটের জোরেই হবে। সে দুটো হবে পাকিস্তানী কনস্টিটিউশন।" হায়দার ধরে নেন।

"তা কেমন করে মানব?" মানস বলে, "বাঙালী হিন্দু মুসলমান যদি তৃতীয়পক্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় তবে নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নেবে। তখন যেটা গড়ে তুলবে সেটা পাকিস্তান নয়; বাংলাদেশ।"

"তাই যদি হয় তবে বুঝব ওরা সাচ্চা মুসলমান নয়। একেই তো ওরা

উর্দু বলতে পারে না। মুসলমানদের পক্ষে কত বড়ো একটা গুনাহ।" হায়দার আফসোস করেন।

"আপনার জিন্নাও তো উর্দুনবীশ নন।" যূথিকা ফোড়ন কাটে।

"হ্যাঁ, ভাবীজী। কথাটা ঠিক। জিন্না কিসের মুসলমান? কিন্তু আর কোনো নেতাও তো নেই আমাদের।" হায়দার করুণ স্বরে বলেন।

দু'চার কথার পর হায়দার তদ্গতভাবে স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান, সর্বজনশ্রদ্ধেয়। হিন্দুরাও তাঁকে পীরের মতো মানতেন। একদিন তিনি বাড়ীর সবাইকে ডেকে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। তারপর খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা চাদর টেনে নিয়ে বলেন, 'সারাজীবন যদি আমি পুণ্য কর্ম করে থাকি, যদি কখনো কারো অনিষ্ট না করে থাকি, যদি বান্দার মতো আল্লার আদেশ পালন করে থাকি তবে আজ এখনি তিনি এ প্রাণ গ্রহণ করুন।" এই বলে চাদর মুড়ি দেন। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিতেই দেখা গেল তাঁর দেহ পড়ে আছে, তিনি নেই।

আবেগে হায়দারের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। তিনি বলেন, "হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁর জন্যে শোক করে। সত্যিকার ধার্মিক যে তার আত্মপর ভেদ নেই। ধার্মিক হিন্দুও তো আমি দেখেছি। তাঁদেরও আত্মপর ভেদ নেই। আমি কি বুঝিনে যে হিন্দুস্থান ছাড়লে আমার পূর্বপুরুষদের কবরকেও ছাড়তে হবে, কীর্তিকেও ছাড়তে হবে? এক কথায় অতীতকেও ছাড়তে হবে। কিসের গর্ব করবে আমার পুত্রকন্যা? অপর পক্ষে, পাকিস্তান না হলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না। কিসের স্বপ্ন দেখবে আমার পুত্রকন্যা? হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যাবে, তলিয়ে যাবে, মাথা তুলতে পারবে না! ইংরেজরা আমাদের রাজ্য কেড়ে নিলেও আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধাও দিয়েছিল। উর্দু এখনো আদালতের ভাষা। ওরা চলে গেলে তো উর্দুও উঠে যাবে। পাকিস্তান পেলে সেখানে আমরা উর্দুকেই রাজভাষা করব। নইলে উর্দুর কী ভবিষ্যৎ?"

যূথিকা এর উত্তরে বলে, "তা হলের বাংলার কী ভবিষ্যৎ? আমাদেরও পুত্রকন্যা আছে, তাদের কী ভবিষ্যৎ?"

হায়দার উঠে দাঁড়ান। "বিবি এলে পরে আপনারা আসবেন একদিন।"

## ॥ তেরো ॥

পার্ল হারবার যাদের উল্লসিত করেছিল, সিঙ্গাপুর যাদের উৎফুল্ল করেছিল, রেঙ্গুন তাদের মুখ হাসায়। তবে কি জাপানীদের লক্ষ্য বার্মার পর ভারত? না, না, ওরা চীনকেই ঘেরাও করতে চায়, তাদের লক্ষ্য চীনের দিকে। ভারতের দিকে নয়। কিন্তু একথা যারা বলে তারাও চুপি চুপি বলে যে জাপানীরা আসছে ভারত থেকে ইংরেজদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে। তার পর ভারতের সিংহাসনে ভারতীয়কে বসিয়ে পূর্ব মুখে প্রস্থান করতে।

জুলি তার মাকে বোঝায় জাপানীরা হচ্ছে বিজ্ঞানে যাকে বলে ক্যাটালিস্ট। সীমান্তের ওপারে ওদের উপস্থিতিটাই যথেষ্ট। ওদের সীমান্ত পার হতে হবে না। জুজুর ভয়ে এর মধ্যেই কলকাতায় ব্ল্যাক আউট। সিভিল ডিফেন্সের ধুম পড়ে গেছে। রাস্তার ধারে শেলটার খোঁড়া হচ্ছে। এসব লক্ষণ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মতৎপর করে তবে ইংরেজদের জাপানীরা খেদিয়ে নিয়ে যাবে কেন, জুলিরাই খেদিয়ে নিয়ে যাবে। সিংহাসনে কে বসবে না বসবে সেসব পরে স্থির করলেও চলবে। এখন থেকে করতে গেলে অনাবশ্যক মতভেদ। জবাহরলালকে জুলি দেখতে পারে না। তিনি নাকি ভারতের কেরেনস্কি। কিন্তু ভারতের লেনিনটি যে কোন্‌খানে আত্মগোপন করেছেন তা তিনিই জানেন। কবে আসছেন সেটাও অজানা। বাবলীরা অবশ্য তাঁকে স্বীকার করতে চায় না। কমিউনিস্টদের মতে তিনি ফাসিস্ট। এ নিয়ে দুই কন্যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বাবলীরা জাপানকে রুখবে। কারণ জাপানীরাও ফাসিস্ট। জুলিরা রুখবে না, তবে ওদের আসার আগেই কেল্লা দখল করবে। ভাবনা কেবল এই যে ওরা বোকার মতো কলকাতায় বোমাবর্ষণ করে সাধারণ মানুষকে উদ্বাস্তু করে তুলবে। উদ্বাস্তু হলে কি মানুষ জাপানকে ক্ষমা করবে, না জুলিদের স্বাগত জানাবে?

"জাপানের পলিসি কি তোদের কন্ট্রোলে?' জুলির মা বিনীতা সিন্‌হা উপহাস করেন। "ওদের নক্‌শা কি ওরা তোদের দেখতে দিয়েছে? লড়াইটা তো হচ্ছে জাপানী হাই কমাণ্ডের সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমাণ্ডের। দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে দাবাখেলার ছক। জাপানীরা আপাতত এগোচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু ইংরেজরাও যে ক্রমাগতই পেছোবে তা নয়। বোমাবর্ষণের পরে যারা ভয় পেয়ে কলকাতা ছেড়ে দিল্লী, সিমলা, কাশী পালিয়েছিল তারা একে একে

ফিরছে। আরো শ্বেতাঙ্গ সৈন্য আসার পর থেকে হাওয়া একটু একটু করে বদলাচ্ছে। জাপানীরা হয়তো উপকূল অঞ্চলে হানা দেবে বা হামলা করবে। কিন্তু উপকূল থেকে বেশীদূর ঢুকতে ওদের সাহস হবে না। দেশটা তো মালয়ের মতো সংকীর্ণ নয়। বার্মার মতো বনজঙ্গলে ভরা নয়।"

"আমিও কি বলছি যে জাপানীরা বেশীদূর এগোবে? আমরাই বা দেব কেন এগোতে? ওদের ভূমিকা হলো পরিস্থিতিটাকে পাকিয়ে তোলার। যেটা আমাদের একার সাধ্য নয়। পরিস্থিতিটা যেই পরিপক্ক হবে অমনি সুযোগ বুঝে আমরা পাকা আমটি পেড়ে খাব। ছেলেবেলায় পড়েছি না— অজগর আসছে তেড়ে। আমটি আমি খাব পেড়ে। অজগর হচ্ছে জাপানী। আমটি হচ্ছে বিপ্লব।"

মিসেস্ সিন্‌হা মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করে বলেন, "ইঁদুরছানা ভয়ে মরে। ঈগল পাখী পাছে ধরে। ইঁদুরছানা হচ্ছে ভীতু বাঙালী। ঈগলপাখী হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতাভর্তি ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য।"

জুলি জেল থেকে ফেরার পর আরো উদ্দাম হয়েছে। ইংরেজরা যে তাকে জেল থেকে বিনা শর্তে খালাস করে দিয়েছে এটা কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনার আবহাওয়া তৈরি করার উদ্দেশ্যে নয়। দক্ষিণপন্থীরা তাই বলছে বটে, কিন্তু আসলে সেটা বন্দীদের অবাধ্যতার দরুন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর থেকেই তারা বেপরোয়া। সরকার দুর্বল না হলে তাদের উৎপাত সহ্য করবে কেন?

সরকার কিন্তু সবাইকে মুক্তি দেয়নি। দাদাদের কেউ কেউ এখনো বন্দী। সব চেয়ে যাঁদের উপর সন্দেহ তাঁরা সব চেয়ে দূরে ও নির্জনে। লাহোরে বা মুলতানে। যেখানে ইংরেজ রাজের সিংহাসন অটল। জাপানীরা কি ততদূর ধাওয়া করতে পারবে? না পারলে ইংরেজ তো থেকেই গেল ভারতের এক কোণে। ইংরেজকে পেছনে রেখে জাপানী কি কোনোদিন পিছু হটবে? পাল্টা আক্রমণে নাজেহাল হবে না? দাদাদের উভয়সঙ্কট। জাপানীরা ঘরে না ঢুকলে ইংরেজরা ঘর থেকে বেরোবে না। তা হলে কি জাপানীরা আদৌ ঢুকবে না? অথবা একবার ঢুকলে সমস্ত ঘরটাই জুড়ে বসবে? তখন যদি ওরা আপনা থেকে সরে না যায় ওদের সরাবে কে? মিত্র বলে কি তারা নিঃস্বার্থ মিত্র? জুলি যদিও সরলবিশ্বাসী তবু জাপানীদের নিঃস্বার্থ অপসরণে সন্দিহান। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ তো এক জায়গায় না এক জায়গায় ঘটবেই। সম্ভবত

দিল্লীর কাছাকাছি। যেখানে ভারতভাগ্য বার বার নির্ধারিত হয়েছে। সেই কুরুক্ষেত্রে জাপানীদেরও তো লোকক্ষয় হবে। ক্ষতিপূরণ আদায় না করেই কি তারা ভারত ত্যাগ করবে? না সেটা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের অকুপেশন বজায় রাখবে? কারো কাছে জুলি যুক্তিপূর্ণ উত্তর পায় না।

গণ সত্যাগ্রহের উপর থেকে তার বিশ্বাস টলেছিল। কই, জনগণ তো সাড়া দিল না? আবার কি দেবে? জোয়ার কোথায় যে দেশ উথাল পাথাল হবে? গান্ধীজীর দৌড় দেখা গেছে। হাজার পঁচিশ লোক কারাবরণ করেছে। চল্লিশ কোটির মধ্যে হাজার পঁচিশ তো নস্যি। সব ক'টা জেলও তো তিনি ভর্তি করতে পারলেন না। অবশ্য ইংরেজরা তাতেও দমত না। জেলের বাইরে বন্দীশিবির বানাত। গণ জাগরণে জুলির বিশ্বাস একদা ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস আর নেই। তার স্থান অধিকার করেছে সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু সেটা তো আর প্রকাশ্যে প্রচার করা যায় না। পুলিশ তো এখনো রাজভক্ত। সৈন্যদলও তাই। ওদের কথা হলো ওরা যার নিমক খাচ্ছে তার সঙ্গে নিমক-হারামী করবে না। যত সব মান্ধাতার আমলের অন্ধসংস্কার! রাজভক্তির চেয়ে দেশভক্তি বড়ো কবে ওরা এটা বুঝবে? যে বোঝাতে যাবে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজদ্রোহের দায়ে ঝুলিয়ে দেবে। যুদ্ধকালে তো সাধারণ আদালতে নয়, সামরিক আদালতে নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারবে।

পূর্ণযৌবনা দামাল মেয়েকে নিয়ে তার মা পড়েছেন ঘোর বিপাকে। তবে জুলির একটা গুণ সে মার কাছে কিছু লুকোয় না। রাতে মার সঙ্গেই শোয়। ছেলেবেলার মতো মাকে জড়িয়ে ধরে। তার সেই 'বেবী' নামটা এখনো ঘোচেনি। সেই নামেই তিনি তাকে ডাকেন। ওকে আলাদা ঘরে শুতে দেবার পরিণাম হয়েছিল ওর বালিশের তলা থেকে রিভলভার উদ্ধার। উচ্চপর্যায়ে তদ্বিরের দৌলতে আদালতে সোপর্দ করা হলো না। কিন্তু বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হলো যতদিন না লেডী হ্যারিংটন হস্তক্ষেপ করেছেন। সেটা অবশ্য সুকুমার দত্তবিশ্বাসের উদ্যোগে। তখন থেকে মেয়ে হয়েছে নজরবন্দী।

পাখী যেমন দিনভর আকাশে উড়ে বেড়ায়, সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে, জুলিও তেমনি ব্রেকফাস্টের পর সারাদিন বাইরে ঘোরাফেরা করে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ী ফিরে আসে। মা ততক্ষণ ওর জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকেন। যদি না বাইরে নিমন্ত্রণ থাকে। তার বা ওঁর বা দু'জনের। ব্ল্যাকআউট হওয়ার পর

থেকে জুলি আরো সকাল সকাল বাড়ী ফেরে। একটু ভয়ডরও ঢুকেছে ওর মনে। ব্ল্যাক আউট তো সরকার অকারণে করছে না। না করলেই বরং অন্যায় হতো। আর সিভিল ডিফেন্সও অহেতুক নয়। জুলিরও ইচ্ছে করে সিভিল ডিফেন্সের তালিমী নিতে। তাতে যোগ দিতে। কত মেয়ে তালিমী নিচ্ছে, যোগ দিচ্ছে। কিন্তু তা হলে তো প্রকারান্তরে যুদ্ধে যোগ দেওয়া হয়। যেটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে ও জেল খেটে এসেছে। "না একো জওয়ান না একো রুপেয়া" এই যার স্লোগান সে হঠাৎ ভোল বদলায় কী করে? ইংরেজ কী স্বাধীনতা দিয়েছে? নেতারা কি স্বাধীনভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

মা বলেন, "তুই যেমন বেবী ছিলি তেমনি বেবী রয়ে গেছিস্। তিরিশ বছর বয়সেও তোর ছেলেমানুষী গেল না। দুশো বছর ধরে আমরা পর্বতের আড়ালে আছি। নাদির শা'র পর আর কেউ এদেশ আক্রমণ করেনি। এই প্রথম আমরা আক্রমণের আশঙ্কা করছি। এই যে পর্বত যার আড়ালে আমাদের সাত পুরুষ কেটেছে সে যদি সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়ে যায় তা হলে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে ভেবে দেখেছিস্? হিমালয় যদি হঠাৎ মৈনাকের মতো উড়ে যায় তা হলে উত্তর থেকে ঝড়ঝঞ্ঝা এসে দেশের আবহাওয়াটাকেই বদলে দেবে। দক্ষিণ থেকে মৌসুমী বাতাস এসে উত্তরে চলে যাবে। বর্ষাকালে বর্ষণ হবে না। ধানগাছ শুকিয়ে মরবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তেমনি ব্রিটিশ রাজ হচ্ছে আমাদের হিমালয় পর্বত। একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত না করে ইংরেজরা যদি উধাও হয় তো আমাদের কপালে আছে আবার সেই বর্গীর হাঙ্গামা, পিণ্ডারী ও ঠগীর উপদ্রব। আবার সেই মোগল রাজপুত যুদ্ধ। মোগল শিখ যুদ্ধ। মোগল মারাঠা যুদ্ধ। হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ। মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ জেরবার হয়ে বলবে, ইংরেজ, তুমি ফিরে এস। ইংরেজ বোধহয় ফিরবে না। অতখানি প্রেস্টিজহানির পর কেউ ফেরে? ওই জাপানীই মোগল, শিখ, মারাঠা, রাজপুতকে একে একে হারিয়ে দিয়ে সসাগরা ভারতের অধীশ্বর হবে। জোর যার মুলুক তার। তোদের কোথায় জোর? তোরা তো এখনো, এই বিপত্তির দিনেও, একজোট হতে পারলিনে। হিন্দু মুসলমান শিখ কেউ কাউকে দেখতে পারে না। হিন্দুসমাজও ছোট ছোট গণ্ডীতে বিভক্ত। কেউ কারো হাতে জল খাবে না। অসবর্ণ বিবাহ করবে না। মুখে বলবে আমরা এক নেশন, কিন্তু কাজ দেখলে মনে হবে একশোটা নেশন কি

তার চেয়েও বেশী। নেশনবোধ তো জাগিয়েছে ওরাই। ওই ইংরেজরাই। ওরা চলে গেলে কি নেশনবোধ থাকবে? মুসলিম লীগ তো এর মধ্যেই দুই নেশনের ধুয়ো ধরেছে। খুব একটা মিথ্যে নয়। কংগ্রেসের এক নেশনটাও কি খুব একটা সত্যি? আমি বলি, পর্বতকে এখন টলাতে যেয়ো না! তোমরা যদি সহযোগিতা করতে না চাও, কোরো না। বিনা সহযোগিতায় ওরা কতদূর যেতে পারে দেখা যাক। যখন দেখবে সহযোগিতা না পেলে ওদেরই সর্বনাশ তখন ওরাই সহযোগিতার জন্যে সাধবে। তখন তোমরা একমত হয়ে স্বাধীনতা চাইবে। যদি একমত না হতে পারো তা হলে সর্বনাশটা ওদের নয়, তোমাদেরই। ওদের একটা নিজস্ব দেশ আছে, ওরা পালিয়ে বাঁচবে। তোমরা পালাবে কোথায়? হয় অরাজকতা, নয় দাঙ্গাহাঙ্গামা, নয় নতুন করে পরাধীনতা। এ ছাড়া আর কী আছে তোমাদের কপালে? শুধুমাত্র পরজাতিবিদ্বেষ নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। কোথায় সেই স্বজাতিপ্রেম?"

একেই বলে কার্টেন লেকচার। জুলির বাবা বেঁচে থাকতে জুলির মা তাঁকে এমনি কার্টেন লেকচার শোনাতেন। তিনি তো নেই, তাঁর ছোট মেয়ের কানে এই কথামৃতবর্ষণ। জুলি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। অর্ধেক কথা ওর কানে পশে না। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশা তো দূরের কথা।

"তোর বন্ধু বাবলী আজকাল আসে না কেন রে?" মা একদিন জানতে চান।

"ওরা এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছোট তরফ। কোথায় গেল বিপ্লবচিন্তা। মওকা তো ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তবু ওদের হুঁশ নেই। দেশের শ্রমিক কৃষক ওদের কাছে নেতৃত্ব আশা করে, সেটা ওরা ভুলে গেছে। ওদের কেবল একমাত্র ধ্যান রাশিয়া কেমন করে জার্মানদের রুখবে। বিদেশের ওই যুদ্ধটাই নাকি এদেশের জনযুদ্ধ। এটা কি ডাহা মিথ্যা নয়?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"আমি তো শুনেছি ওরা এই সুযোগে জনগণের হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিতে চায়। তাই যদি হয় তবে এটা জনযুদ্ধ নয় তো কী? জনযুদ্ধটা কাদের বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। জাপানীরা তো এ তল্লাটে নেই। এদের কতক লোক তো রাইফেল নিয়ে জাপানীদের দলেও ভিড়ে যেতে পারে। যাদের রাজভক্তির বালাই নেই, দেশভক্তির বালাই নেই, তাদের আছে যে-কোনো একটা যুদ্ধই জনযুদ্ধ। ধর্মের নামেও সেটা হতে পারে। অর্থের জন্যেও

হতে পারে। যে যুদ্ধ সেনাপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যা অপর একটি সৈন্য-দলের সঙ্গে নয়, তা তো নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর সশস্ত্র ব্যাণ্ডিটদের হাঙ্গামাও হতে পারে। যেমন মগদের হাঙ্গামা।" মা উত্তর দেন।

"তা হলে বুঝতে পারছ আমরা কেন এখন এক পথের পথিক নই। আমি তো মনে করি বাবলী ভুল পথে চলেছে। সেটাকেই বিপ্লববাদ বলে চালাচ্ছে। যেন রাইফেল হাতে পেলেই বিপ্লব হয়, রাইফেলের লক্ষ্য কে তার ঠিকানা না জানলেও চলে। আমাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ রাজ। যার ঠিকানা দিল্লী, কলকাতা, সব বড়ো বড়ো শহর। সব বড়ো বড়ো রেল জংশন। সব বড়ো বড়ো বন্দর। ওদের লক্ষ্য যদি জাপানী আর্মি হয়ে থাকে তবে ওদের ফ্রণ্টে যেতে হবে। জাপানীদের সঙ্গে লড়তে হবে। মরতে হবে। গোটাকতক জমিদার কি মহাজন মারার জন্যে অতগুলো রাইফেলের কী দরকার? আর জমিদার মহাজনরাও তো রাইফেল পেতে পারে। ওরা যুদ্ধে অর্থসাহায্য করছে না? অফিসার ক্লাস তো ওদের পুত্ররাই। ওদের সম্পত্তিতে হাত পড়লে ওদের রাইফেলের লক্ষ্য কি জাপানীরা হবে? না ওরা জাপানীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ওদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবে? বাবলীর সঙ্গে আমার মিল ছিল যখন আমাদের লক্ষ্য ছিল এক। এখন লক্ষ্য ভিন্ন। তাই পথও ভিন্ন। বাবলী আমাকে ভজাতে পারেনি, আমিও ওকে ভজাতে পারিনি। ও আমার প্রাণের বন্ধু, আমিও ওর। কিন্তু রুশপ্রেম আর দেশপ্রেম আজকের অবস্থায় মেলানো যায় না। বিচ্ছেদ অনিবার্য।" জুলি দুঃখের সঙ্গে বলে।

"দেখিস্ বিচ্ছেদ থেকে যেন বিরোধ না আসে!" মা সতর্ক করে দেন।

"আমরাও কি বিরোধ চাই? ইংরেজের সঙ্গে বিরোধই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বিরোধ। রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ আমাদের কাম্য নয়। স্বাধীন হলে আমরাও রাশিয়াকে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে স্বাধীন হওয়া চাই। যে নিজে পরাধীন সে পরকে সাহায্য করবে কোন্ মুখে? ওরা যে রাইফেল চাইছে সে রাইফেল নিয়ে কি ওরা সাগর পারে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়তে রাজী আছে?" হেসে উড়িয়ে দেয় জুলি।

"ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করতে হলে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। তা চুরি করেই হোক আর লুট করেই হোক আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম করেই হোক। ওদের পথে ওরা ঠিকই আছে, বেবী। সেটা ব্রিটিশ রাজও জানেন। তাই ফাঁকি দিয়ে রাইফেল পাওয়া

ওদের বরাতে নেই। কিন্তু তোরাই বা কী করে আশা করছিস্ যে জার্মানী থেকে বা জাপান থেকে শস্ত্র এসে তোদের হাতে পৌঁছবে? এক যদি সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তা হলে ইংরেজের দেওয়া শস্ত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাগিয়ে ধরতে পারে। কিন্তু এই স্টেন গান, ব্রেন গানের যুগে রাইফেল ওদের কতটুকু কাজে লগেবে? কামানের গোলাকে কি ওরা ভয় করে না? ট্যাঙ্ক থেকে গোলা বর্ষণ হলে ওরা কতক্ষণ রুখতে পারবে? আর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ হলে ওরা কি ছত্রভঙ্গ হবে না? যেটা সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শর্ত সেটা হচ্ছে সিপা-হীতে সিপাহীতে একতা। হিন্দু মুসলমান শিখ সিপাহী যদি একজোট হতো তা হলে তাদের দমন করা দুঃসাধ্য হতো। কিন্তু তার যেটুকু সম্ভাবনা একশো বছর আগে ছিল সেটুকুও এখন আর নেই। সিপাহীরাও এখন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, শিখিস্থানের স্বপ্ন দেখছে, যদি ইংরেজ সত্যি সত্যি ভারত ছেড়ে যায়। জোড়াতালি দিয়ে একটা ন্যাশনাল আর্মি খাড়া করা যায়। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে ওদের উস্কে দেওয়াও শক্ত নয়। তখন ওরাই পরস্পরকে মেরে সাবাড় করবে। বাবলীদের থীসিস যেমন অবাস্তব তোদের থীসিসও তেমনি। তোরা দু'জনেই আলেয়ার পেছনে ছুটেছিস্। দু'টো দু রকম আলেয়া।" মিসেস সিন্‌হা আবার এক লেকচার শোনান।

"তা বলে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। একটা কিছু করতে তো হবে। নয়তো তোমার ওই পর্বত আরো দু'শো বছর আমাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকবে। তুমি মডারেট ঘরের মেয়ে। ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তোমার লাভ্ রিলেশনশিপ। আর আমি এক্স্ট্রীমিস্ট বাপের মেয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার হেট রিলেশনজিপ। তবে ইংরেজ জাতির সঙ্গে তা নয়। লেডী হ্যারিংটন আমার জন্যে যা করেছেন তা কি আমি ভুলতে পারি?" জুলি আবেগের সঙ্গে বলে।

"তা হলে তোর ওটা লাভ্-হেট রিলেশনশিপ।" মা সস্নেহে বলেন।

"তোমার কাছে গোপন করব না, মা। ইংরেজকে মারতে আমার হাত উঠবে না। রাইফেল হাতে পেলেও না। রিভলভার হাতে পেলেও না। তবে আমি জোন্ অভ্ আর্কের মতো সৈনিকদের উদ্দীপনা দেব। প্রেরণা জোগাব। যদি কোনোদিন সুযোগ মেলে। পর্বতের আড়ালে বাস করে আমি তোমার মতো শান্তিতে ঘুমোতে পারব না। অমন শান্তি যেন কবরের শান্তি।" জুলি বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন সৌম্য আসে দেখা করতে। এবার সে সোদপুরে উঠেছে। সেখানেই রাত কাটাবে। জুলির মা ওকে নৈশভোজনের আমন্ত্রণ জানান। তার জন্যে সে তৈরি হয়েই এসেছে। জুলিকে তো অন্য সময় পাওয়া যাবে না।

"বাবা সৌম্য, তুমি তো আমাদের পর নও। তোমার যখন খুশি তুমি এ বাড়ীতে আসবে। এখানেই উঠবে। আমরা থাকতে সোদপুর কেন? তোমাকে দেখে আমি মনে ভরসা পাই যে আমার অবর্তমানে তুমিই জুলিকে সুপথে রাখবে। এতদিন আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছি। আর ক'দিন পারব? এই যুদ্ধে আমার কপালে কী আছে কে আমাকে বলবে? বোমাবর্ষণ যে-কোনোদিন হতে পারে! সেই ভয়েই না ব্ল্যাক আউট।" মিসেস সিন্‌হা অন্তরঙ্গভাবে বলেন। "অথচ কলকাতা থেকে পালাবারও জো নেই। জুলি এখান থেকে নড়বে না। অন্ধকারেই ওর আনন্দ।"

"আপনারা থাকতে সোদপুরে কেন? মাফ করবেন, মাসিমা। আমরা আশ্রমিক মানুষ, একহিসাবে শ্রমিকও বলতে পারা যায়। আমাদের অন্নশ্রম বা ব্রেড লেবার হলো চরকা কাটা। একসঙ্গে বসে করি, তাতে একটা কমিউনিয়নের ভাব আসে। বিশজন পঁচিশজন মিলে একসঙ্গে সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান এরও একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। যদিও আমরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী নই, আমাদের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকও আছেন। সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বরবিশ্বাসনির্ভর নয়। সত্যে মতি থাকলে একজন নাস্তিকও আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন হতে পারেন। গান্ধীজী দশবছর আগে নাস্তিকদের অপাঙ্‌ক্তেয় করতেন। এখন তাঁদের স্বাগত করেন। আগেকার দিনে বলতেন, ঈশ্বরই সত্য। ইদানীং বলছেন, সত্যই ঈশ্বর। সূত্রযজ্ঞে সকলেরই অধিকার আছে। সেই সূত্রে আমাদের সকলের কমিউনিয়ন হয়। তবে উপাসনার সময় সকলের যোগদান আবশ্যিক নয়। যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা সরে থাকেন। কেউ কিছু মনে করেন না। সেটাও একপ্রকার কমিউনিয়ন। পাড়ার লোকরাও এসে যোগ দেয়। যারা গান্ধীপন্থী নয় তারাও। তা হলে বুঝতে পারছেন, মাসিমা, কেন আমি সোদপুর আশ্রমে উঠি। গতবারে তো আপনাদের এখানেই উঠেছিলুম।" সৌম্য সবিস্তারে বোঝায়।

"দেখছি তোমরাও একজাতের কমিউনিস্ট।" মাসিমা পরিহাস করেন।

"কমিউনিস্টও বলতে পারেন, সোশিয়ালিস্টও বলতে পারেন। তবে সেই সঙ্গে একটি বিশেষণ জুড়ে দেবেন। ননভায়োলেণ্ট। ওঁদের মতো আমরাও

চাই শোষণশূন্য সমাজ, শ্রেণীশূন্য সমাজ। কিন্তু রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে নয়। আমরা মানুষের প্রাণকে সব চেয়ে মূল্যবান মনে করি। প্রাণ নিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে আমরা সামাজিক অন্যায় দূর করতে চাই। পারব কি না জানিনে। হয়তো পারব না। সেটা আমাদের দোষ। আমাদের নীতির দোষ নয়। স্বয়ং গান্ধীজীও নিখুঁত নন।" সৌম্য স্বীকার করে।

হুড়মুড় করে জুলি এসে ঘরে ঢোকে। কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "নিখুঁত নন তো নেতার আসন জুড়ে বসে আছেন কী করতে? ওই জাঁকালো বৃদ্ধ মনুষ্যটি আরব্য উপন্যাসের সেই বৃদ্ধটির মতো সিন্ধবাদ নাবিকের পিঠে লেপটে আছেন কেন? আমরা না পারি তাঁকে সরাতে, না পারি তাঁকে বইতে। বলেন বটে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন, চার আনা চাঁদাও দেন না। কিন্তু লোকে তো জানে, যে গান্ধী সেই কংগ্রেস, যে কংগ্রেস সেই গান্ধী। কিছুতেই যদি সিন্ধবাদকে বৃদ্ধের বাহুপাশ থেকে ছাড়াতে পারা যেত!"

ওর মা রাগ করে বলেন, "এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। ভুলভ্রান্তির নিন্দা করতে চাস্ তো কর। দেখিয়ে দে কোন্‌খানটা ভুল। বুঝিয়ে দে কেন ভুল। তা নইলে লোকে শিখবে কী করে? তা না করে এই পার্সনাল অ্যাটাক কেন? পার্সনাল অ্যাটাকই যদি রাজনীতি হয় তবে কোন্ পার্সন তেমন অ্যাটাকের হাত থেকে নিরাপদ? ইংরেজ হলে বলত, এটা ক্রিকেট নয়।"

জুলি বকুনি খেয়ে সৌম্যর দিকে তাকায়। "তুমি কী বল?"

"তোমাদের মনের কথাটা তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। সেটা ব্রিটিশ শাসকদেরও মনের কথা। গান্ধী না থাকলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের তাঁরা এতদিনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকতেন। বামপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়তেন। ক্রিপসের দৌত্যের উদ্দেশ্যই ছিল নেহরুকে ও আজাদকে গান্ধীজীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। তাঁকে একঘরে করা।" সৌম্য উত্তর দেয়।

মিসেস সিংহা হেসে বলেন, "তার মানে কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে গান্ধীজীর একটা টাগ অভ ওয়ার চলেছে। একবার শাসকরা চেষ্টা করেন ওঁদের কাছে টেনে নিতে। একবার গান্ধীজী চেষ্টা করেন তাঁর কাছে টেনে রাখতে। তাঁদেরও দোনোমনো যায় না। একবার যুদ্ধে যোগ দিতে লাফান। একবার সত্যাগ্রহে ঝাঁপ দেন। কখনো হিংসাবাদী,

কখনো অহিংসাবাদী। যখন যেমন তখন তেমন। গান্ধীজীকে দোষ দেওয়া বৃথা।"

"গান্ধীজী কায়মনোবাক্যে যুদ্ধবিরোধী। কংগ্রেস তা নয়। কংগ্রেসকেও দোষ দেওয়া বৃথা। সম্মানজনক শর্ত পেলে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। গান্ধীজীও নেতাদের সেইকথাই বলেছেন। এ জগতে কে কাকে টেনে রাখতে পারে? মাসিমা, আপনিও কি জুলিকে টেনে রাখতে পারলেন?" সৌম্যও হাসে।

"যা বলেছ। আমার এখন একমাত্র আশা ওর বর ওকে টেনে রাখতে পারবে। ও যদি কাউকে বরণ করে।" মা আড়চোখে তাকান।

জুলি রাগের ভান করে বলে, "দিস্ ইজ নট ক্রিকেট।"

ওর মা শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে বলেন, "সৌম্যকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাওয়া গেছে। ঝগড়া করে যেন সময় বইয়ে না দেওয়া হয়!"

"কেন? কয়েক ঘণ্টা কেন? কয়েক দিন কেন নয়?" জুলি কৈফিয়ৎ চায়।

"ওই জাঁকালো বৃদ্ধ মনুষ্যটি সিন্ধবাদ নাবিককে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। আর দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর। এবার তিনি নিজেই জেলে যাবেন বলে নোটিস দিয়েছেন। ওই বৃদ্ধ যদি জেলে যান আমাকেও অবিলম্বে প্রস্তুত হতে হবে। ওই বৃদ্ধ পিঠ থেকে নেমে গেলে সিন্ধবাদ মুক্ত। সিন্ধবাদকে কেউ জেলে যেতে বলছে না। সে জেলে যাবে কেন, সে যাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায়, লাটসাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম করবে। বড়লাটও তাকে তাঁর পারিষদসভায় আসন দিতে উন্মুখ। তবে তার রুচিমতো নয়। বড়লাটের তো আরো কয়েকজন পারিষদ আছেন। তাঁদের তো তিনি পথে বসাবেন না। তাঁরা আরো নির্ভরযোগ্য। তিনি হিন্দু মুসলমানে একটা ব্যালান্সও রাখবেন। তাঁর হাতে দাঁড়িপাল্লা। সিন্ধবাদ নাবিক আর সমুদ্রে ফিরে যেতে চায় না, বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে ঢের হয়েছে। ছেড়ে দে, বুড়ো, কেঁদে বাঁচি। কিন্তু বুড়োই যে নিজের থেকে ছেড়ে দিয়ে বরাবরের মতো চলে যাচ্ছেন অকূল সাগরে। ফিরবেন কি না সন্দেহ। খেতে না পেয়ে মরে যেতেও পারেন। ওঁর আবার এক বাতিক আছে। খেতে দিলেও খাবেন না। আর এই পোড়া দেশের মন পড়ে থাকবে কারাগারে যেখানে বুড়ো দিন দিন শুকিয়ে মরছেন। সিন্ধবাদ দেখবে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। জনগণ তার দিকে ফিরেও

তাকাচ্ছে না। জনগণের নজরে পড়ার জন্যে তাকেও বৃদ্ধের অনুসরণে কারাবরণ করতে হবে। খালি পেটে তবু দু'চারদিন থাকতে পারা যায়, কিন্তু খালি পিঠে একদিনও নয়। সিন্ধবাদকে ঐ বৃদ্ধের বোঝা পিঠে তুলে নিতেই হবে। বৃদ্ধ তাকে মুক্তি দিলেও সে বৃদ্ধকে মুক্তি দেবে না। যদি না বড়লাট তাকে টেনে নিয়ে মাথায় করে রাখেন ও তারই কথায় রাজত্ব চালান। বৃদ্ধের হাত থেকে সিন্ধবাদ নয়, সিন্ধবাদের হাত থেকে বৃদ্ধই চান মুক্তি। মুক্ত হয়ে তিনি একাই চালিয়ে যাবেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। স্বাধীনতা বলতে যুদ্ধ না করার স্বাধীনতাও বোঝায়। এইখানেই সিন্ধবাদের সঙ্গে বৃদ্ধের মতভেদ। সেটা পথভেদও বটে, কারণ একবার অহিংসা মেনে নিলে পরে আর আবালবৃদ্ধ বনিতার উপর নির্বিশেষে বোমাবর্ষণ চলে না। যেটা সিন্ধবাদও যুদ্ধে গেলে করবে।" সৌম্য একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

জুলির ভাবান্তর দেখা যায়। সে বলে, "তুমি কি আবার জেলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছ ?"

"না, আমার উপর অন্য নির্দেশ। সেবারেও অন্য নির্দেশ ছিল, কিন্তু আমার কেবলি মনে হতে লাগল জুলি জেলে গেছে, আমি বাইরে আছি, এতে আমাদের দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরবে। এবার বাপু আমাকে বলেছেন জেলে যাওয়াটা খুব নরম কাজ। ওর চেয়ে কঠিন কিছু করতে হবে। দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। একদিকে জাপানী, আরেক দিকে ইংরেজ, মাঝখানে আমি ও আমার সহকর্মীরা। আমরা পালাব না, বিপদের মুখোমুখি হব। বাপুর পণ তিনি এদেশকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেবেন না। কিন্তু ইংরেজ আর জাপানী মিলে যদি তা করে তবে দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়ানোই তৃতীয় পন্থা। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গুলীগোলা খাব। সেই ত্যাগ ব্যর্থ যাবে না। তার থেকেই আসবে স্বাধীনতা।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

জুলি একবার সৌম্যর দিকে তাকায়। একবার মায়ের দিকে। কাতর-কণ্ঠে বলে, "ও যদি আমার জন্যে জেলে গিয়ে থাকে তবে আমাকেও তো ওর জন্যে গুলীগোলার সামনে দাঁড়াতে হয়, মা।"

"তা কী করে হয় ?" মা তো হতভম্ব।

"কেন হবে না, মা ? তুমি কি জানো না আমাদের দু'জনের কী সম্পর্ক ? বিয়েটা অবশ্য হতে পারছে না, যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়।" জুলি সৌম্যর দিকে করুণ চক্ষে তাকায়।

"তার তো এখনো ঢের দেরি। ইংরেজকে 'ভারত ছাড়ো' বললেই কি সে অমনি ভারত ছাড়ছে? এটা কি একটা কথা হলো যে ঈশ্বরের হাতে বা অরাজকতার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। ঈশ্বর এ দায়িত্ব নিতে রাজী হবেন কেন? আর অরাজকতা তো দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত। বাঁকা ভাষায়, সম্রাটকে বলা হয়েছে অ্যাবডিকেট করতে। সম্রাট অ্যাবডিকেট করলে তাঁর পুত্র তাঁর সিংহাসনে বসেন। এক্ষেত্রে কংগ্রেসই হবে সেই পুত্র। কিন্তু বেঙ্গল তা মানবে কেন? পাঞ্জাব তা মানবে কেন? এরাও এক এক শরিককে মসনদে বসাবে। গান্ধী মহারাজ এক একটা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেন আর আমরা সাধারণ মানুষ হকচকিয়ে যাই। ওদিকে জিন্নাসাহেবও প্রতিধ্বনি করেছেন, ভাগ করো আর ভাগো।" মা কোনোটাতেই কান দেন না।

"মার ধারণা তিনি পর্বতের আড়ালে আছেন ও থাকবেন। বুঝলে, সৌম্যদা, এই ধারণাও পর্বতের মতো অটল অনড়। এক জাপানীরা যদি না একে টলায় বা নড়ায়। কংগ্রেস কি পারবে? বাংলাদেশে কোথায় কংগ্রেস? তার পেছনে কি জনগণ রয়েছে? কোথায় সেই জনগণ? তুমি যদি মরতে যেতে চাও তো আমাকেও তোমার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। বিয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে।" জুলির কণ্ঠে বিষাদ।

"জাপানীদের আশা ছেড়ে দাও, জুলি। ওটা আশা নয়, আশঙ্কা। ওদের আসার আগেই পর্বতকে টলাতে হবে। যেটা হবে সেটা সারা দেশ জুড়েই হবে। যদি দেশের লোক সাড়া দেয়। কিন্তু আমাকে প্রস্তুত হতে হবে আচমকা আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে। কারণ আমার বাস সীমান্তে। যুদ্ধ যদি বাধে আমি যেন কাসাবিয়াঙ্কা। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কী করবে? যদি জোন অভ্ আর্ক হতে চাও তো তোমার কর্মক্ষেত্র ওখানে নয়, যেখানে তোমার অনুগত সৈন্যসামন্ত সেখানে। বেঁচে থাকলে বিয়ের লগ্ন আসবে। আগে তো মুক্তির লগ্ন আসুক।" সৌম্য কথা দেয়।

এটাই ওদের বাগ্‌দান। মায়ের মৌন আশীর্বাদ।

## ॥ চৌদ্দ ॥

ওদের দু'জনকে কথাবার্তার নিরিবিলি দিতে জুলির মা অন্য ঘরে যান। সেটা শোভনা দিদির ঘর।

তখন জুলি বলে, "এখানে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগছে না, সৌম্য। তুমি যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেতে তা হলেই আমি সুখী হতুম। কিন্তু জানি তোমার সে স্বাধীনতা নেই। দেশের স্বাধীনতা আগে, তোমার স্বাধীনতা পরে। কী করি? আমার কপাল।"

"কেন? তুমিও তো বিপ্লবী নায়িকা। ঘর গেরস্তালির জন্যে তোমার অবসর কোথায়? আশ্রমে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন কারাজীবনের বিকল্প। ওখানেই বা তোমার ভালো লাগবে কেন?" সৌম্য বিচলিত হয়।

"না, ঘর গেরস্তালির কথা ভাবছিনে। সঙ্গসুখের কথাই ভাবছি। কিন্তু আমি জানি দেশের এই পরিস্থিতিতে সেটা সঙ্গত নয়। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে মায়ের সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করা আমার পক্ষে কষ্টকর। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তিনি পর্বতের আড়ালে আছেন। যার নাম ব্রিটিশ রাজত্ব। ইংরেজবর্জিত ভারত যেন হিমালয়বর্জিত ভারত। অথচ আমার প্রতিদিনের ধ্যান হলো এই পর্বতকে ডাইনামাইট দিয়ে ওড়ানো। জানি তুমি এর মধ্যে ভায়োলেন্সের গন্ধ পাচ্ছ। কিন্তু অসত্যের গন্ধ নিশ্চয়ই নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কলহ তো এই নিয়ে। তিনি সাধুসন্তদের একজন। যেমন নানক, কবির, চৈতন্য। হয়তো বুদ্ধ খ্রীস্টের সঙ্গে একসারিতে বসবেন। কিন্তু রাজনীতিতে নামলে অমন নীতিবাগীশ হওয়া চলে না। ফল কী হয়েছে? উনি নিষ্ক্রিয়।" জুলি নালিশ করে।

"একবার যদি মেনে নাও যে নৈতিক শক্তি বলে আরো একটা শক্তি আছে আর সে শক্তি দিয়েও পর্বতকে টলানো যায় তা হলে দেখবে ডাইনামাইট ছাড়াও ডাইনামিক অ্যাকশন হয়। তার আগে তোমাকে একটা গল্প বলি। সত্যঘটনামূলক। একজন আই এম. এস. ডাক্তারের মুখে শোনা। বাঙালী। তিনি তখন বিলেতে পড়াশুনা করছেন। লণ্ডনের একটি ঘরোয়া বৈঠকে দক্ষিণ

আফ্রিকা থেকে আগত গান্ধীর সঙ্গে প্রবাসী বিপ্লবী সাভারকরের বিতর্ক হয়। সেখানে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন পরবর্তীকালের কর্নেল নাগ। সাভারকর বলেন, গান্ধী, মনে করো তোমার দিকে একটা বিষধর সাপ তেড়ে আসছে আর তোমার হাতে আছে একগাছা লাঠি। তুমি কি মারবে, না মারবে না? গান্ধী উত্তর দেন, লাঠিখানা আমি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব, পাছে মারতে প্রলুব্ধ হই। তা শুনে সাভারকর বলেন, গান্ধী, ধর্মে তুমি আমার গুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনীতিতে গুরু নও।" সৌম্য সেই ঐতিহাসিক কথোপকথনের মর্ম শোনায়।

"সাপকে মারব না, লাঠি হাতে থাকলে ছুঁড়ে ফেলে দেব, এতখানি ঝুঁকি নিতে আমিও তো পারব না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা বিষধর সাপ ছাড়া কী? ভারতবাসীর হাতে লাঠি নেই, এই যা আফসোস। তা বলে কি সাপের কামড়েই মরব? অহিংসা মন্ত্রে সাপকে বশ করার ক্ষমতা কার আছে?" জুলি বিশ্বাস করে না।

"উপমাটাই ভুল। মানুষ সাপ নয়। শক্তিমদে মত্ত হতে পারে। অহিংসা-মন্ত্র দিয়ে নয়, অহিংস আচরণ দিয়ে তাকে সংযত করা যায়. প্রকৃতিস্থ করা যায় বইকি। আর সেই অহিংস আচরণ নির্বৈর হলেও নির্বীর্য নয়। অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটেছে। সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করেছে, শত শত লোক লাঠির বাড়ির সামনে বুক পেতে দিয়েছে। ফলে আটটি প্রদেশে আংশিক স্বরাজ সম্ভব হয়েছে। একদিন পূর্ণ স্বরাজও সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আরো বড়ো ত্যাগের আহ্বান আসবে।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

"আরো বড়ো ত্যাগের আহ্বান বলতে কী বোঝায়, সৌম্য? গান্ধীজী কি তার কোনো আভাস দিয়েছেন?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"যুদ্ধের মাঝখানে গণসত্যাগ্রহ মানে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা যেন বলতে চায় এটা রাজায় রাজায় যুদ্ধ। সেই যে একটা কথা আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। এতকাল উলুখড়েরা কেউ প্রতিবাদ করেনি, অকারণে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণদানের বিনিময়ে কিছু লাভ করেনি। এবার ওরা আর উলুখড় হতে রাজী নয়। ওরা দুই রাজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে বাধা দেবে। যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। রাজশক্তি যদি মিটমাট চায় তো ওরাও রাজী। যদি মিটমাটই শ্রেয় হয় তবে সে রাস্তা সব সময়ই খোলা থাকবে। আর যদি মিটমাটের বদলে মারধরই রাজকীয় নীতি

হয় তবে ওরা বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেবে, বুকে গুলী খাবে, পিঠে গুলী খাবে না। কারাবরণ নয়, মৃত্যুবরণই এবারকার বৈশিষ্ট্য। এবারকার ধ্বনি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। করব, নয়তো মরব। ফলাফল বিধাতার হাতে। রাজশক্তি মিটমাট করতেও পারে, না করতেও পারে, বিদ্রোহীরা যুদ্ধ থামিয়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে। কিন্তু স্বাধীনতার দিকে দেশকে এগিয়ে দিয়ে যাবে। তাদের ত্যাগ ব্যর্থ যাবে না। তাদের মৃত্যু তাদের অমর করবে।" সৌম্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

জুলি ধৈর্য ধরতে নারাজ। "স্বাধীনতা আমরা অবিলম্বে চাই। তার জন্যে যদি গুলীর বদলে গুলী চালাতে হয় তাও সই। পড়ে পড়ে মার খাব কেন? আমরাও মারব।"

সৌম্য তাকে শান্ত করার জন্যে বলে, "গান্ধীজীও অবিলম্বে স্বাধীনতা চান। তিনি তো নিজেকে দস্তুরমতো ঘৃণা করেন।"

"কেন? ঘৃণা করেন কেন?" জুলি আশ্চর্য হয়।

"দেশকে স্বাধীন করতে বেরিয়েছেন বাইশ বছর আগে। এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি। দোষটা তিনি নিজের গায়েই টেনে নিচ্ছেন। তাঁর মতো অধীর আর কে? তাঁর মতো প্যাশন আর কার?" সৌম্যও তাঁর মতো।

"বাব্বা! বাইশ বছর! বাইশ বছরে আমিও তো বুড়ী হতে চললুম। গান্ধীজীর জানা উচিত যে এই তাঁর শেষ চান্স। হয় করতে হবে, নয় মরতে হবে। এবার ব্যর্থ হলে আর বেঁচে থাকা বৃথা। নেতৃত্ব হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। এক অকৃতকার্য, অথর্ব বৃদ্ধকে দেশ আর সহ্য করবে না।' জুলি চরমপত্র দেয়।

সৌম্য আহত হয়ে বলে, "নেতৃত্ব কি তিনি কারো হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন যে আর কেউ তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেবে? তোমরা নেতৃত্বের উপর জোর না দিয়ে নীতির উপর জোর দাও। তা হলে দেখবে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে—যাকে মহাদেশ বললেও চলে—জনগণকে জাগানোই হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ। জনগণ যদি উদাসীন থাকে তবে সিপাহী বিদ্রোহও নিষ্ফল। যেখানে সিপাহীরাও উদাসীন বা বিদেশীর অনুগত সেখানে কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর গেরিলা লড়াই বিভীষিকা উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পারে না। কলকাতার মসনদও না। আর এলোমেলো সন্ত্রাসবাদ তো কেবল শহীদ সৃষ্টি করতে পারে, তাও সারা দেশে

সহস্রাধিক নয়। শেষ পর্যন্ত জনগণের সুপ্ত শক্তির দ্বারস্থ হতে হবেই। সেই শক্তি যখন সমগ্রভাবে জাগ্রত হবে তখন তার পরিচালনার ভার একমাত্র গান্ধীজীই নিতে পারেন, আর কেউ নয়। আর তাঁর সংগ্রামের ধারা অহিংসই হবে, আর কিছু নয়।"

জুলি উত্তেজিত হয়ে বলে, "মোহ! মোহ! মোহনদাসের মোহ। কোটি কোটি লোক যদি কোনোদিন জাগে তবে অহিংসার বাণী শুনবে না, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে ছুটে আসবে। দা, কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল, শাবল, গাঁইতি, দুরমুস, লাঠি, সড়কি, বল্লম, তীর ধনুক, ছুরি, ছোরা, খাঁড়া। মশাল হাতে যারা আসবে তারা আপিসে আদালতে আগুন ধরাবে। গাঁইতি হাতে যারা আসবে তারা রেল লাইন ওপড়াবে। বাগানের কাঁচি হাতে যারা আসবে তারা টেলিগ্রাফের তার কাটবে। কোথায় এত পুলিশ, কোথায় এত সিপাহী যে সব জায়গায় হাজির হবে, সব্বাইকে ঠেকাবে? ওদের'ও তো দেশপ্রেম আছে। সটুকুও কি এতদিনে জন্মায়নি? জনগণকে যদি ডাক দাও অহিংসার মন্ত্র আওড়াতে যেয়ো না। অহিংসা পরমো ধর্মঃ কে না জানে। তিন হাজার বছর ধরে শুনে এসেছে। মানেও খুব। গোমাতার বেলা। অনেকে আবার মাছমাংসের বেলাও। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের বেলা নয়। বিদ্রোহের বেলা নয়।'

"গান্ধীজী কি তাঁর দেশের লোককে চেনেন না?" সৌম্য নরম স্বরে বলে। "তাঁর চেয়ে বেশী চেনে কে? তিনি যে কেবল আদর্শবাদী তা নয়। তিনি বাস্তববাদীও। অসামরিক হিংসা খড়ের আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিবে যায়। তার পেছনে না থাকে শৃঙ্খলা, না থাকে তালিম। একটা গ্রামে মেশিন গান চললে দশখানা গ্রামের লোক উধাও হয়। কেন সরকারকে মেশিন গান চালানোর প্ররোচনা দেওয়া? তোমাদের বড়ো জোর কয়েকটা হাত বোমা আছে, রিভলবার আছে, রাইফেল আছে। কিন্তু ওদের আছে আকাশ থেকে বর্ষণ করবার মতো বোমা। কামান থেকে নিক্ষেপ করবার মতো গোলা। ঘোড়ার উপর চড়ে চড়াও হওয়ার জন্যে বেয়োনেট। এসব কথা চিন্তা করেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অহিংসার। যেটা তিনি প্রয়োগও করেছেন হাতে কলমে। সাধারণ লোকদের নিয়ে। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। এটা দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিবে যায় না। তুষের আগুনের মতো দীর্ঘকাল জ্বলতে থাকে। একে কেউ

জোর করে নিবিয়ে দিতে পারে না। অধিকাংশের বেলা একটু একটু করে নিবে যায়। কিন্তু সকলের বেলা নয়। সত্যিকারের গান্ধীশিষ্যরা তাঁদের অন্তরের আগুন আহিতাগ্নির মতো সযত্নে রক্ষা করেন। তাঁদের কাছে দশ বিশ বছর কিছু নয়। তাঁরা যেন বীজধান। যা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাকে। প্রয়োজনের সময় বোনা হয়। মার্কসবাদের মতো গান্ধীবাদও একটা তত্ত্ব। তত্ত্ব বিনা বিপ্লব হয় না, সেটা সহিংসই হোক আর অহিংসই হোক। তাত্ত্বিক ভিত্তি পাকা না করে যারা বিপ্লবের আসরে নামে তারা নাটক করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসটা তো নাটক নয়। তারা অ্যাডভেঞ্চার করতে পারে, কিন্তু রেভোলিউশন তো অ্যাডভেঞ্চার নয়। তুমি তোমার জনতাকে নিয়ে যেটা করতে চাইছ সেটা একপ্রকার জাকেরি। সেটারও মূল্য আছে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরিণাম দেখে মার্কসবাদীদের শিক্ষা হয়েছে যে জাকেরি দিয়ে বিপ্লবের ফল পাওয়া যায় না। তোমাদেরও সেই শিক্ষা হবে, জুলি, যদি তোমরা ফরাসী বিপ্লবের পথ ধরো। আমরা কিন্তু আমাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ত্যাগ করতে পারিনে। জনগণকেও জাগাতে হবে, অহিংসাকেও কাজে লাগাতে হবে। এটা একপ্রকার ক্ষুরধার পন্থা। এ পথে ফরাসীরা বা রাশিয়ানরা চলেনি। চলেননি আমাদের পূর্বপুরুষরাও। আমরাই দুর্ভেদ্য অরণ্যে পথ কেটে চলেছি। তুমি কি সঙ্গী হবে আমাদের ?”

“তোমাদের নয়, তোমার। শুধু তোমারই। এর জন্যে আমি কতকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি বলো তো ? তুমি যদি আমাকে আজ এখনি তোমার সঙ্গিনী হতে ডাকো আমি আজ এখনি সাড়া দিতে রাজী। তা কি তুমি করবে ? তোমার সেই ব্রতে বাধবে।” জুলি সতৃষ্ণভাবে তাকায়।

“আমাদের আশ্রমে তোমাকে মানাবে না, জুলি। আর আমাদের জেলার উপর জাপানী আক্রমণের খাঁড়া ঝুলছে। তোমাকে আমি বাঁচাব কী করে ? তোমার প্রাণ আর মান দুই বাঁচাতে হবে। বিশিষ্ট নাগরিকরা তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের পদ্মার এপারে পাঠাচ্ছেন। তোমাকে আমি অযথা সে রকম বিপদের সম্মুখীন হতে দেব না। এটা সংসারধর্মের সময় নয়। ঘোরতর সংঘর্ষের সময়। যতদূর দেখতে পাচ্ছি সংঘর্ষটা ত্রিকোণ। জাপানীদের সঙ্গে ইংরেজদের, ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের, ভারতীয়দের সঙ্গে জাপানীদের। গান্ধীজী চেষ্টা করছেন এটাকে এককোণ করতে। জাপানীদের আক্রমণের পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ শুরু ও শেষ হয়ে যাবে। জাপানী-

দের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ যাতে না বাধে তার জন্যে তিনি প্রাণপণ করবেন। যদি ইংরেজরা আগে থেকে বাধিয়ে না থাকে। বুঝতে পারছি তো, ভারতের ইতিহাসে এমন এক সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। আমরা ইতিহাস রচনা করতে চাই। জীবন্ত ইতিহাস। হঁ্যা, তুমিও করবে আমার সঙ্গে। কিন্তু আপাতত পৃথক থেকে। আগে তো এ পালা সাঙ্গ হোক। পালাবদলের পর মালাবদল। কী বলো, লক্ষ্মিটি? পারবে না সবুর করতে?" সৌম্য জুলির হাতে হাত মেলায়।

"পারব, যদি তোমরা এই পালা এই বছরেই সাঙ্গ করো। হঠাৎ একটা ঝড় তুলতে হবে। তিন চার মাস ধরে ঝড় বয়ে যাবে। ফরাসী বিপ্লবের দিন যাকে জাকেরি (Jacquerie) বলা হতো তা ছাড়া আর কী হতে পারে এদেশে এখন? হতে পারত রুশ বিপ্লবের দিন যা হয়েছিল, যদি বাবলীরা আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু ওরা তো জনযুদ্ধের নেশায় মেতেছে। যার মধ্যে না আছে জন, না আছে যুদ্ধ। আছে শুধু প্রোপাগাণ্ডা। যে দায় আমাদের উপর বর্তেছে ওরা তার দায়িত্ব নেবে না। ওদের মতে এটা নাকি বিপ্লবের উপযুক্ত পরিস্থিতি নয়। আমরা নাকি ভ্রান্ত। ওরাই অভ্রান্ত।" জুলি উপহাস করে।

"ওদের দিক থেকে ওরা অভ্রান্ত বইকি। রাশিয়া যদি হেরে যায় বিপ্লবের উপর প্রতিবিপ্লব জয়ী হবে। বাবলীরা বাঁচবে কিসের আশায়? ওরা যে ইংরেজের পেছনে দাঁড়িয়েছে এর কারণ ইংরেজরা রাশিয়ার পেছনে দাঁড়িয়েছে। তোমার মনে লাগছে, কারণ বাবলীও একজন বিপ্লবী নায়িকা। আমি কিন্তু ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওরা যদি আমাদের সংগ্রামে যোগ দিত তবে এটাকে ওরা শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত করত। আমরাই বোকা বনে যেতুম। আমরা তোমাদের জাকেরি সহ্য করতে পারি। নিন্দুকরা বলবে আমরা অহিংসক হয়ে হিংসার প্রশ্রয় দিচ্ছি। সে নিন্দা আমরা বহন করতে পারব। তাতে তো আমাদের সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তার জাতীয়তাবাদী চরিত্রও অক্ষুন্ন থাকবে। তবে তোমরা যদি বোমা, রিভলভার নিয়ে সংগ্রামে নামো আমরা তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম বন্ধ করে দেব। যে ভায়োলেন্স স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত সে ভায়োলেন্স আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যে ভায়োলেন্স পূর্বকল্পিত, যেটা সুসংগঠিত সে ভায়োলেন্স আময়া সহ্য করব না। সেটাই যদি তোমাদের পছন্দ হয় তবে তোমাদের আলাদা হয়ে যেতেই হবে, জুলি।" সৌম্য কঠোর স্বরে বলে।

"তা হলে তুমি আমাকে জোন অভ্ আর্ক হতে দেবে না? আমার ছেলেবেলার সাধ কোনোকালেই মিটবে না?" জুলি অভিমানে ঠোঁট উলটিয়ে বলে, "এখন বুঝতে পারছি কেন জোন বিয়ে করেননি। বিয়ে করলে তো ওর স্বামী ওকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিশতে দিতেন না। কিন্তু তোমাকে আমি নোটিস দিয়ে রাখছি, সৌম্য, বিয়ের আগে আমি দরকার দেখলে গেরিলা বাহিনী গঠন করব। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই তো কী হয়েছে? ডেভিডের হাতে কী ছিল? গোলিয়াথকে সে মারল কী দিয়ে? গুলতি দিয়ে! তুমি ভাবছ গুলীর সঙ্গে গুলতি পেরে উঠবে কেন? ওদের আমরা গুলী চালাতে বাধ্য করব। এইখানেই আমাদের জিৎ। কাগজে লিখবে, গুলতি বনাম গুলী। দারুণ লড়াই। তুমি হাসছ যে! আমার গেরিলা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হবে? আমি ধরা পড়ব, ধর্ষিতা হব? তা শুনে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? হা অদৃষ্ট!"

"যাক, ওসব বিশ্রী কথা মুখে আনতে নেই। মনে যদি সে রকম শঙ্কা থাকে তবে ও পথে যেয়ো না। জোন অভ্ আর্ককে তো ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বীরাঙ্গনা বলে স্বীকার করতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেল। সন্ত বলে সম্মান করতে আরো কয়েক শতাব্দী। তোমার যদি সন্ত জুলি হবার সাধ থাকে তবে তুমি ও পথে যেতে পারো, কিন্তু তোমার গেরিলা বাহিনীর জওয়ানদের তুমি কী সান্ত্বনা দেবে? তারাও কি বীরপুরুষ বলে স্বীকৃতি পাবে? গেরিলা নামটার একটা মহিমা আছে। কিন্তু অবোধ দেশবাসী ওদের গরিলা ঠাওরাবে। ওরাও যে চাঁদা তুলতে গিয়ে জোর জবরদস্তি করবে না তা নয়। ডাকাতিও করতে পারে। রোজকার খোরাকটি না জুটলে কোনো বাহিনীই যুদ্ধে নামে না। খোরাক ফুরিয়ে গেলে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। তখন ওরা যুদ্ধ-বন্দী বলে খোরাক আশা করতে পারে। তোমার গেরিলা বাহিনীও পেটের জ্বালায় আত্মসমর্পণ করতে পারে। তারপরে বন্দীশিবিরে গিয়ে খোরাক পাবে। কিন্তু খোরাকের বিনিময়ে খাটুনি জোগাতে হবে। খাটুনি থেকে তুমিও যে রেহাই পাবে তা নয়। অন্যান্যবার পেয়েছ। সেটা তোমার বাবা সিভিল সার্জন ছিলেন বলে। আর তাঁর প্রথম মহাযুদ্ধের রেকর্ড প্রশংসনীয় ছিল বলে। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে সে সুবিধাটুকু তুমি হারাবে। আরো ভয়ের কথা তোমার গেরিলা বাহিনীকে জাপানের পঞ্চম বাহিনী বলে চিহ্নিত করা হবে। মিলিটারি ট্রাইবিউনালে তোমাদের

বিচার হবে। সাজা কেমন হবে তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো না? এক যদি ইংরেজরা জাপানীদের কাছে হেরে যায় তবেই তোমাদের রক্ষে। কিন্তু কয়েকটা প্রদেশ থেকে সরে যাওয়াটাই তো আখেরে হেরে যাওয়া নয়। ওরাও তো পাল্টা আক্রমণ করতে পারে। ওদের কাছে জাপানীরা হেরে যেতেও তো পারে। তোমার পক্ষে সব চেয়ে যেটা খারাপ সেটাই ভেবে নিয়ে তোমাকে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে। ঝাঁপ যদি না দিলেই নয়। আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে। এটা আমার পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার নয়। আমার তত্ত্বের প্রয়োগ। আমি অহিংসাবাদী। লোকে যাকে বলে গান্ধীবাদী। তোমার বেলা সে যুক্তি খাটে না। তুমি গান্ধীবাদীও নও, মার্কসবাদীও নও। দেশকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসাই তোমাকে জোনের মতো হতে প্রেরণা দিচ্ছে। তোমার তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল। তোমার সাংগঠনিক শক্তিও অপরীক্ষিত। অর্থবল না থাকলে তুমি দেবী চৌধুরানীর মতো দস্যুরানীও হতে পারো।" বলতে বলতে সৌম্যর কণ্ঠরোধ হয়।

"বিয়ে করে আমি চৌধুরানী হতে পারি, তা বলে দেবী চৌধুরানী হতে যাব কোন দুঃখে? নহি দেবী, নহি আমি সামান্যা মানবী। আমি মঞ্জুলিকা, আমি স্বাধীনা রমণী। খুনখারাপি করব না, চুরিডাকাতি করব না, কিন্তু যদি বিয়ে করো তবে তোমাকে আমি সারাজীবন জ্বালাব। তুমি হবে শিবতুল্য পুরুষ আর আমি হব শ্যামাতুল্য নারী। নৃত্যপরা রণরঙ্গিণী। পতি যার চরণতলে। সীতা সাবিত্রীর মতো ওটাও কি সনাতন ভারতীয় আদর্শ নয়? উমানাথ শঙ্কর কেন, শ্যামানাথ শঙ্কর কেন নয়?" জুলি সকৌতুকে সুধায়।

সৌম্য হো হো করে হেসে ওঠে। "নটরাজ শিব কি শুয়ে শুয়ে তাণ্ডব নাচ নাচেন? শ্যামা তাঁর তাণ্ডব সহচারী হতে পারেন। সেই অর্থে তিনি শ্যামানাথ শঙ্কর। কিন্তু সেটা বোধহয় তোমার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না। তুমি চাও শিবতুল্য নয়, শবতুল্য পুরুষ।"

জুলির জানা ছিল, কিন্তু খেয়াল ছিল না যে নটরাজও শিবের অন্য এক রূপ। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের কাছে আর কার নৃত্য লাগে! কিন্তু সৌম্য হবে নটরাজ শিব! ভাবা যায়!

"তোমার নটরাজ মূর্তি দেখলে তো আমি ধন্য হই, সৌম্য। সামনে যা আসছে তা প্রলয়ের দিন। যুদ্ধ আর বিদ্রোহ আর বিপ্লব যেন তিন মহানদীর

মতো ছুটে আসছে ত্রিবেণীতে একাকার হতে। এমন দুর্যোগও আর আসবে না, এমন সুযোগও আর মিলবে না। তোমরা যদি নটরাজ শিবের মতো আত্মহারা হয়ে তাণ্ডব নাচ নাচো তা হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে কাল-ভৈরবের মতো তাল রেখে নাচব।" জুলি অঙ্গীকার করে।

"না, না, তোমাকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আত্মসংবরণ করতে হবে। আমাদের আসন্ন সংগ্রামে মেয়েদেরও একটা ভূমিকা থাকবে, কিন্তু আমরা চাইনে যে তোমরা নিহত বা ধর্ষিত বা লাঞ্ছিত হও। তেমন কিছু হলে আমা-দের মনের জোর কমে যাবে। শত্রুপক্ষ আমাদের মনের জোর ভাঙবার হাতল পাবে। তবে ইংরেজরা সাধারণত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। ওদের শিভালরিতে বাধে। তোমরা ওদের শিভালরির উপর নির্ভর করতে যাবে কেন? তা হলে তো ওদের মহত্বই জয়ী হবে। ওদের মধ্যে দুর্জনও তো আছে। ওরা যদি তাদের সংযত করতে না পারে তবে অযথা একটা জাতিবৈর সৃষ্টি হবে! ওদের প্রলোভনে ফেলা আমাদের সংগ্রামের অঙ্গ নয়। আর ওদের সৈন্যদলে যেসব ভারতীয় আছে তাদের কাছে যে তোমরা মা বোনের মর্যাদা পাবে সে বিষয়ে কি তোমরা নিশ্চিত? গণ সত্যাগ্রহে নারীদেরও যোগদানের অধিকার আছে। না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। তবু যেখানে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে সতর্কতারও প্রয়োজন। আমি তো কোনো মেয়েকে বলতে পারব না যে সঙ্গে পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখবে। দুঃশাসনের কবলে পড়লে অমনি মুখে পুরবে। আমি বলব তেমন পরিস্থিতি এড়াতে।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

জুলি ক্ষেপে যায়। "এই তোমাদের অহিংসা! তোমরা নরহত্যা করতে বারণ করবে, কিন্তু নারীকে বলবে আত্মহত্যা করতে! সেটা কি নারীহত্যা নয়? জওহর ব্রত করে রাজপুত নারীরা আগুনে ঝাঁপ দিলে তোমরা তাদের বন্দনা গাইবে। আমাদের ভুলিয়ে দেবে যে সেটাও নারীহত্যা। সহমরণ যে নারীহত্যা সেটা বোধহয় রাজা রামমোহনের আগে কারো ঘটে উদয় হয়নি। পণযৌতুক জোগাতে না পেরে কত মেয়ে যে আত্মহত্যা করেছে সেও কি আরেক রকম নারীহত্যা নয়? নারীকে আত্মহত্যার পরামর্শ দেওয়াও আইনের চোখে অপরাধ। এই একটা ভালো আইন করেছে ওরা, ওই ইংরেজরা। সত্যি, এদেশের নারীদের জন্যে ওরা যা করেছে তা আর কে কবে করেছে?

ওরা যদি সহায় না হতো রাজা রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্র একা কী করতে পারতেন? মা যখন আমাকে একথা বোঝান তখন আমি বিনা বাক্যে মেনে নিই। আমার কথা যদি বলো আমি বরং সঙ্গে ছুরি রাখব, তা দিয়ে ধর্ষকের চোখ বিঁধব, তবু পটাসিয়াম সায়ানাইড খাব না। হবে তো কারাদণ্ড। প্রাণদণ্ড তো নয়। ইজ্জৎ বজায় রেখে জেল খাটতে আমি রাজী। নরহত্যায় আপত্তি আছে, বেশ! নরহত্যা নাই বা করলুম। কিন্তু নারী-হত্যাই বা নিজের হাতে নিজে করব কেন? অহিংসা বলতে কি আত্মহিংসাও বোঝায়?"

এ এক দারুণ প্রশ্ন। সৌম্য জুলির চোখে চোখ রেখে বলে, "নহ তুমি সামান্যা মানবী। একদিন মহাত্মার সামনে তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি সেকালের গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো দুরূহ সব প্রশ্ন করে তাঁকে বিষম সঙ্কটে ফেলবে। তোমাকে আমি তোমার নিজের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেব, জুলি। স্বামীগিরি ফলাব না। তুমিও আমাকে আমার শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়ো। না, আমি কোনো অবস্থাতেই নরহত্যা করব না। করলে আমার সমস্ত থীসিসটাই কেঁচে যাবে। আমি কি কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই লড়ছি? আমার লড়াই সব দেশের মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সঙ্গে। স্বাধীন ভারতও যদি সেই ব্যাধিতে ভোগে তার সঙ্গেও আমি লড়ব। বেঁচে থাকলে এইসব লড়াইতেই আমার জীবন কেটে যাবে। আমার কি নির্বিরোধে ঘরসংসার করার জো আছে? তুমি আমাকে ঘর দিতে পারো, সন্তান দিতে পারো, আমার বংশে বাতি জ্বালাতে পারো, কিন্তু আমার বিবেককে শান্তি দেবে কী করে, আমি যদি একটার পর একটা লড়াইতে জড়িয়ে না পড়ি? আমার প্রাত্যহিক জপ হচ্ছে, শান্ দাও আপনার আত্মায়, শান্ দাও, শান্ দাও অবিরাম। দেশের স্বাধীনতাই আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য নয়, যদিও এই লক্ষ্য ভেদ করতে গিয়েই আমার জীবন শেষ হতে পারে। তুমি যার সঙ্গিনী হতে যাচ্ছ সে কি তোমাকে সুখী করতে পারবে? তুমি তাকে সারাজীবন জ্বালাবে, না সে-ই তোমাকে সারাজীবন জ্বালাবে? কে যে কার চরণতলে লুটিয়ে থাকবে তা এক হাস্যকর প্রহেলিকা। তবে আমি তোমাকে লক্ষ্মী দেখতেই ভালোবাসি, কালী দেখতে নয়। এটা বোধহয় পুরুষমাত্রেরই স্বভাব। কস্তুরবা রণরঙ্গিণী হলে গান্ধীজী কি মহাসত্যাগ্রহী হতে পারতেন? কিন্তু তোমাকে আমি কস্তুরবা হতে বলব না। তুমি তুমি।"

জুলি অভিভূত হয়ে বলে, "তুমি তুমি। তুমি নরোত্তম।" সহসা সৌম্যর ধরে থাকা হাতখানি তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়।

তখন সৌম্যকেও জুলির ধরে থাকা হাতখানি তুলে নিয়ে একই মুদ্রায় প্রতিদান দিতে হয়। সে সুদ সমেত শোধ করে। আরেকখানি হাতে আরেকটি চুম্বন।

জুলি হেসে ওঠে। "তা হলে আমিও তোমার অনুসরণ করি।"

তারপর চোখের জল মুছে বলে, "শুধু আজ নয় সারাজীবন।"

নেপথ্যে জুলির মা নজর রেখেছিলেন। তাঁর নীতি হলো, 'দাস্ ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার।' এইপর্যন্ত, এর পর আর নয়। খানাকামরায় একটা ঘণ্টা ছিল। সেটা বাজলে বুঝতে হয় যে খানা তৈরি। সেটা বেজে ওঠে।

খাবার টেবিলে বসে মা বলেন মোলায়েমভাবে, "এখন তো আমি তোমাদের দু'জনের মা। আমার কথা মন দিয়ে শোন।"

শোনবার জন্যে দু'জনেই উৎকর্ণ। আবার এক কার্টেন লেকচার।

"আমি রাজনীতি বুঝিনে। তবে বয়স তো হয়েছে। তোমাদের মতো ছেলেমানুষ তো নই। ইংরেজকে তোমরা যত তুচ্ছ মনে করো সে তত তুচ্ছ নয়। আর জাপানীকে তোমরা যত উচ্চ মনে করো সেও তত উচ্চ নয়। জাপানকে তো আরো একটা ফ্রণ্টে লড়তে হচ্ছে। সেটা আমেরিকান ফ্রণ্ট বা প্যাসিফিক ফ্রণ্ট। তার এত বল কোথায় যে সে ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে কেড়ে নেবে ? আর ওদের দু'পক্ষের কাড়াকাড়ির মাঝখানে ঝাঁপ দিয়ে তোমরাই বা ঘোলা জলে মাছ ধরতে যাচ্ছ কোন্ হিসাবে ? ওদের যেটা দুর্যোগ তোমাদের সেটা সুযোগ। এটা কি একটা সুযুক্তি, না একটা দুর্বুদ্ধি ? সেই যে বলে, চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে!" মা সেটা মনে করিয়ে দেন।

সৌম্য নীরবে শুনে যায়। জুলিই উত্তর দেয়। "চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে, একথা যারা বলে, তারাই আবার একথাও বলে যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। লড়াই করবে ইংরেজ আর জাপানী, প্রাণ যাবে বাঙালীর! কেউ মরবে বিমানের বোমায়, কেউ মরবে কামানের গোলায়, কেউ মরবে খোরাকের বিনাশে, কেউ মরবে ঘরবাড়ীর ধ্বংসে। এতে লাভটা হবে কার ? যুদ্ধে জিতে ইংরেজ তো আরো দু'শো বছর খুঁটি গেড়ে বসবে। কী করে তুমি হটাবে ওদের ? না তুমি চাও ওরা হিমালয়ের মতো অটল হয়ে

বিরাজ করুক অনন্তকাল? আমার জন্মের আগে থেকেই আমাদের দেশের নেতারা দাবী করেছেন যে স্বরাজ আমাদের জন্মস্বত্ব। আমরা তো নতুন কোনো দাবী করছিনে। ইংরেজরা যদি এটা সময় থাকতে মেনে নিত তা হলে তো কেউ বলত না, চাষী, এইবেলা নে ঘর ছেয়ে। জাপানীরা যে বার্মা দখল করেছে এটা কি ইংরেজের দোষে না আমাদের দোষে? ওরা যদি এর পর পূব বাংলা দখল করে নেয় সেটাও কি ইংরেজের দোষে না আমাদের দোষে? আমরা যদি উলুখড়ের মতো মরতে না চাই, সময় থাকতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, করি না হয় মরি, সেটা কি ইংরেজের দুর্যোগের অন্যায় সুযোগ নেওয়া, না আমাদের দুর্যোগের ন্যায্য প্রতিবিধান করা? ওরা বলবে এটা পলিটিকাল অপরচুনিজম। আমরা বলব তোমরা মালয়ীদের মতো, বর্মীদের মতো, আমাদেরকেও নেকড়ের মুখে ফেলে দৌড় দেবে, সেটাও কি মিলিটারি অপরচুনিজম নয়? চাচা, আপনা বাঁচা এই যাদের যুদ্ধের নীতি তারা কোন্ মুখে আমাদের দোষ ধরবে? না, মা, আমরা সুবিধাবাদী নই। আমরা সংগ্রামে নামব না, যদি মিটমাট হয়ে যায়।"

## ॥ পনেরো ॥

একদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার জন্ম মৃত্যু বিবাহের কলমে এন্‌গেজমেণ্টের নিচে চৌধুরী ও সিন্‌হা দেখে মানস কৌতূহলী হয়। তার পর চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে সহর্ষে চিৎকার করে, "জুঁই! জুঁই! অসম্ভব! অলৌকিক! এ কখনো সত্য হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি করো? করো তো এক্ষুনি মিষ্টির অর্ডার দাও।"

যূথিকা কাগজখানা কেড়ে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলে, "ওমা, আমি কোথায় যাব! সৌম্য চৌধুরী আর মঞ্জুলিকা সিন্‌হা। এ রকম মানিক-জোড় কি দুনিয়ার আর একটি আছে? ওরাই। ওরাই। আমার মন বলছে ওরাই। হি হি হি হি! কী আনন্দ! কী আনন্দ! মিষ্টি পরে হবে 'খন। এই মুহূর্তেই একটা গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।"

"একটা নয়, দুটো। দুই ঠিকানায়। সৌম্যদা কি এতদিন কলকাতায় বসে আছে? নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে সংগ্রামের জন্যে-তৈরি হচ্ছে। ওর সামনে আরো একটা এন্‌গেজমেণ্ট। সেটা মৃত্যুর সঙ্গে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

তার মনে পড়ে যায় যে এই পদটি সে তার ছেলেবেলার এক পুরস্কার সভায় উচ্চারণ করেছিল। তার উপর বরাত দেওয়া হয়েছিল টেনিসনের 'চার্জ অভ্‌ দ্য লাইট ব্রিগেড' আবৃত্তি করে শোনানোর।

**"Theirs not to reason why,**

**Theirs but to do or die".**

তা শুনে যুথিকা বলে, "গান্ধীজী দেখছি টেনিসনের কাছ থেকে ওটা পেয়েছেন। তা হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনিসনের দান আছে। কিন্তু ভাবতেই পারা যায় না যে লাইট ব্রিগেডের মতো সৌম্যদার দল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবে না। বেচারি জুলি পথ চেয়ে বসে থাকবে।"

"জুলিও তো একই পথের পথিক। যদিও অহিংসা মানে না। সেও করবে না হয় মরবে। বেঁচে থাকলে তো বিয়ে হবে! ভাবতে গেলে মনটা উদাস হয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করা উচিত, কিন্তু না করলে মরা উচিত নয়। লাইট ব্রিগ্রেডের যা কর্তব্য আর-সব সৈনিকেরও কি তাই কর্তব্য? লাইট ব্রিগেডে তো পাঁচশো না ছ'শো জন মাত্র সৈনিক ছিল। গান্ধীজী বলেছেন সরকারী কর্মচারীদের চাকরি ছাড়তে হবে না। স্বাধীনভাবে যে যার কর্তব্য সম্পাদন করবে, যেমন করতেন মহামতি রাণাডে। তিনিও বিচারপতি ছিলেন। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা।" মানসেরও সেই আদর্শ।

"তোমার কাছে গান্ধীজী সেইটেই প্রত্যাশা করেন। একা একা পদত্যাগ নয়। কিন্তু তোমার যা স্বভাব। তুমি যুদ্ধের ঘোড়া। যুদ্ধ হচ্ছে শুনলে স্থির থাকতে পারবে না। গণ সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধ। এবার পোলাণ্ডে নয়, ফ্রান্সেও নয়, ভারতের পূর্বপ্রান্তে নয়, সব জায়গায়! কী করে, তুমি আপনাকে সামলাবে? আর আমিই বা তোমাকে সামলাতে পারব কী করে? সারা রাত জেগে বারান্দায় পায়চারি করবে। বাইরের লনেও। যুদ্ধের ঘোড়াকে আস্তাবলে বেঁধে রাখলে যা হয়।" যুথিকাও মানসের দশা দেখে মনে কষ্ট পায়।

মানস আত্মস্থ হয়ে বলে, "যুদ্ধের ঘোড়ার প্রাণের মায়া থাকে না। যার থাকে সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ারের ঘোরাফেরার ঘোড়া বা সওদাগরের মালবাহী ঘোড়া বা পশ্চিম দেশের চাষীর লাঙল টানা ঘোড়া। আমার প্রাণের ভয় আছে। আমার মতো লোকের জন্যে টেনিসনের 'ডু অর ডাই' বা মহাত্মার 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নয়। যাদের জন্যে তারা ওই সৌম্যদা আর জুলি। সৌম্যদা তো বিশ বছর ধরে তালিম নিয়েছে। মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে তার পরের ধাপটার জন্যে মনটাকে তৈরি করেছে। ওকেই বরং বলকে পারো যুদ্ধের ঘোড়া।"

"আর জুলি?" যুথিকার চোখে শঙ্কা।

"জুলির স্বামী বেঁচে থাকলে ও তোমারই মতো ঘরসংসার করত। মরণের মুখে পতঙ্গের মতো ছুটে যেত না। কিন্তু এ সংসারে কে আছে ওর, যার জন্যে ও বাঁচতে চাইবে? ওই সৌম্যদাই ওর একমাত্র স্বজন। সৌম্যদার যদি মরণ হয় জুলিরও সহমরণ হবে। ভগবান না করুন।" মানস তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয়।

"ভগবান না করুন।" যুথিকার চোখ ছলছল করে।

"তবে ওদের এন্‌গেজমেন্টটা আশাপ্রদ! মরেঙ্গের আগে ওরা দু'বার ভাববে। করেঙ্গের বেলা ওরাও ভেবে চিন্তে করবে, যাতে মরেঙ্গে অনিবার্য না হয়। সৌম্যদা কখনও মানুষ মারবে না, এটা আমি লিখে দিতে পারি। কিন্তু জুলি যদি গুলী চালায় আমি আশ্চর্য হব না। ওর দাদারা সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী। জওয়ানদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। সেইসূত্রে অস্ত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। জাপানীরাও অস্ত্র জোগাবে। এতদিনে কি আকিয়াব থেকে কক্স বাজারে হাতিয়ার এসে পৌছয়নি? অস্ত্রের জন্যে আজ আর জার্মানীতে বা জাপানে যেতে হয় না। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না। জাপানীরা যদি সত্যি সত্যি চট্টগ্রাম অধিকার করে তো গোটা অস্ত্রাগারটাই জুলির দাদাদের। যদি না জাপানীরা বিরূপ হয়।" মানস সংশয় প্রকাশ করে।

"কেন? বিরূপ হবে কেন?" যুথিকা বিস্মিত হয়।

কারণ জাপানীরা তো ফিলানথ্রোপিস্ট নয়। যে ভুলটা দাদারা করেছেন। যে হাতিয়ার একদিন ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারা যাবে সে হাতিয়ার ওরা কি সহজে হাতছাড়া করবে? তার আগে ভালো করে বাজিয়ে

নেবে কে আন্তরিকভাবে জাপানের শিবিরে, কে তা নয়। ওরাও হাড়ে হাড়ে সাম্রাজ্যবাদী। তাঁবেদার ছাড়া আর কাউকে ওরা অস্ত্র জোগাবে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা জাপানের সৌজন্যে হবার নয়।" মানস নিঃসংশয়।

যুথিকা আশ্চর্য হয়। "জুলিরা কি সেটা বোঝে না?"

"ওদের থীসিস হলো অস্ত্র বিনা স্বাধীনতা হয় না। আর অস্ত্রের জন্যে যদি শয়তানের কাছে যেতে হয় তো তাও সই। শয়তানের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাকেও কিছু দিতে হবে। শয়তান একদিন চেয়ে বসবে আমদানী রফতানীর অবাধ অধিকার। যেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেয়েছিল মীর জাফরের কাছে। তেমনি জাপানও আসবে বণিকের মানদণ্ড হাতে। দাদারা কি এটা বোঝেন না? বোঝেন ঠিকই। কিন্তু কী করবেন? ওঁদের থীসিস তো ওঁরা পাল্টাবেন না। পাল্টালে গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়।" মানস একটু থেমে বলে, "আমি যতদূর বুঝি ওঁরা বসে আছেন জাপানীরা কবে আসবে তারই অপেক্ষায়। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল জাপানীদের সাড়া শব্দ নেই। জাপানীরা কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। সুতরাং দাদারা আপাতত নিষ্কর্মা। করিৎকর্মা তা হলে কে? ওই অহিংসাবাদী গান্ধী বুড়োই। উদ্যোগ যা নেবার উনিই নেবেন। ইনিশিয়েটিভ এখন ওঁরই হাতে। কংগ্রেসের জন্যে সবুর না করে উনি একাই এগিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে নেহেরুকেও ডেকে নিয়ে বুঝিয়েছেন যে রুজভেল্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো ফল নেই। চার্চিলের সুমতি হবে না। নেহরুও এখন একমত। এর পরে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও একমত হবেন। পিছুটান যাঁদের আছে তাঁরা তো নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। তাঁরা পেছনে পড়ে থাকবেন। দুঃখ হয় রাজাজীর জন্যে। তিনি যে জেলকে ভয় করেন তা নয়। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস মুসলমানদের যদি পাকিস্তানের আশ্বাস দেওয়া হয় তবে তারা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে ইংরেজদের উপর চাপ দেবে আর তাদের সেই মিলিত চাপের কাছে চার্চিল মাথা নত করবেন। তার মানে একদল যেমন জাপানীদের অপেক্ষায় নিষ্কর্মা হয়ে থাকবেন আরেকদল তেমনি মুসলমানদের অপেক্ষায়। পাকিস্তানের আশ্বাস পেলেই যে মুসলীম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজের উপর চাপ দেবে তেমন কোনো পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজরাও বলে রেখেছে যে কংগ্রেস লীগ একসঙ্গে চাইলেও তারা যুদ্ধকালে ক্ষমতার হস্তান্তর করবে না। যেখানে ক্ষমতা

হস্তান্তরের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই সেখানে পাকিস্তান মেনে নিয়ে লাভটা কী হবে ? লীগপন্থীরা কি গণ সত্যাগ্রহে যোগ দেবে ? চাপ আর কী ভাবে দিতে পারা যাবে ? মাঝখান থেকে লীগপন্থী মুসলমানদেরকে কংগ্রেসপন্থী মুসলমান-দের উপর জিতিয়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস তার সুপরীক্ষিত মিত্রদের হারাবে। গণ সত্যাগ্রহে একটিও মুসলমান সহযোগী হবে না। গান্ধীজীর পক্ষে কত বড়ো ব্যর্থতা! কংগ্রেসের পক্ষে কত বড়ো দুর্বলতা !"

যূথিকা সব শুনে বলে, "জুলি যদি সশস্ত্র বিদ্রোহের অপেক্ষায় বসে থাকে তবে তাকেও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হবে। বাবলীর সঙ্গে ওর কোনো তফাৎ থাকবে না। এখন দেখা যাক জাপানীরা কী করে। যদি গান্ধীজীর আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে জাপানীদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায় তবে কিন্তু জুলিই সকর্মক, যদিও অহিংসক নয়। জাপানীদের সাড়াশব্দ নেই বলে কি নির্বিকার থাকতে পারি ? কলকাতা থেকে পলাতকের যাত্রা এখনো থামেনি। লোকে পা দিয়ে সরকারের বিপক্ষে ভোট দিচ্ছে। স্বয়ং লাটসাহেব হন্তদন্ত হয়ে জেলায় জেলায় প্রচারকার্য চালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই তো সেদিন আমাদের এখানেও সভা করে সবাইকে অভয় দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন মিস্টার হিটলার উইল বি সাউণ্ডলি ডিফিটেড। ওদিকে চার্চিলও বলছেন হিটলার ফার্স্ট। তার মানে হিটলার হেরে গেলে জাপানও হেরে যেতে বাধ্য। তখন বার্মা, মালয় ইত্যাদি ফিরে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ভারতের একাংশ যদি বেদখল হয়ে থাকে তবে সে অংশও। কথা শুনে গা জ্বলে যায়। ভারতের একাংশ বেদখল হলে তোমরা তো পালিয়ে বাঁচবে, আমরা বাঁচব কী করে ? সৌম্যদা তো কাসাবিয়াঙ্কার মতো মৃত্যুবরণ করবেই। যদি না এক হাতে জাপানীদের ঠেকায়, আরেক হাতে ইংরেজদের। জুলি যদি কলকাতায় বসে না থেকে সৌম্যদার সঙ্গে ওর কর্মস্থানে যেত তা হলেই জানতুম যে ও সত্যিকার সহধর্মিণী। কিন্তু তার জন্যে চাই শুধু এন্‌গেজমেণ্ট নয়, বিয়ে। সেটা তো হচ্ছে না। এই যা দুঃখ।"

ইতিমধ্যে তিনজন মিলিটারি অফিসারও এখানে এসে সভা করে গেছেন। নেভীর প্রতিনিধিটি পশ্চিমা মুসলমান, আর্মিরটি শিখ, এয়ার ফোর্সেরটি পাঞ্জাবী হিন্দু। তাঁর মা বাঙালী। ছেলেমানুষ। তাঁকে দেখে যূথিকা বলে ওঠে, "বাছা রে !" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্বও বোধ করে। 'বাঙালী নহে খর্ব।' তিন মূর্তিও অভয় দিয়ে গেলেন যে ভারত এখন লড়তে প্রস্তুত। বার্মার মতো

অপ্রস্তুত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান শিখ ভেদ নেই। অসামরিক জনগণ যেন পেছনে দাঁড়ান। হোম ফ্রণ্ট মজবুত রাখেন।

ডিফেন্স বলতে এতকাল বুঝিয়েছে মিলিটারি ডিফেন্স। ইদানীং সিভিল ডিফেন্সেরও নাম শোনা যাচ্ছে। বিমান থেকে যখন বোমা পড়বে তখন সাধারণ পথচারীর জন্যে চাই নিরাপদ আশ্রয়। মাটি খুঁড়ে আশ্রয় বানাতে হবে। লণ্ডনের মতো শহরে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে আছে। বহু লোক তার প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। কলকাতায় তেমন কিছু নেই। সেখানে অন্য ব্যবস্থা। সাইরেন বাজলেই গর্তে ঢুকতে হবে। সাইরেন থামলে গর্ত থেকে বেরোনো চলবে। ইতিমধ্যেই কলকাতায় এয়ার রেডস্ প্রিকশনস বিভাগ সংগঠিত হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স বলতে আরো কিছু বোঝা।। চোর ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যেতে পাবে। পথ ঘাট যখন অন্ধকার। ঘরে ঘরে নিষ্প্রদীপ। উৎপাত রোধ করাব জন্যে পুলিশই যথেষ্ট নয়। হোম গার্ডস দরকার। কলকাতায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার বাইরে বোমা বর্ষণের আশঙ্কা ক্ষাণ। তবু বলা তো যায় না। যুদ্ধ বেধে গেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। প্যানিক থেকেও নাগরিকদের রক্ষা করা চাই। সিভিক গার্ডস দরকার।

পুলিশ থেকে জজ সাহেবের কাছে অনুরোধ আসে। তিনি যেন সিভিল ডিফেন্সের জন্যে সভার সভাপতিত্ব কবেন। মানস ভাবনায় পড়ে। নাগরিক হিসাবে এটা তারও কর্তব্য। সরাসরি 'না' বলতে পারে না। কিন্তু দেশের নেতারা যখন দেশের লোককে বলছেন সিভিল ডিস্ওবিয়েন্সের জন্যে তৈরি হতে তখন সরকার থেকে বলা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্সের জন্যে তৎপর হতে। লোকে কার কথা শুনবে?

"উলুখড়কে আত্মরক্ষা করতে বলবে এক বন্ধু। জাপানীদের হাত থেকে। আর উলুখড়কে আত্মসম্মান রক্ষা করতে বলবে আরেক বন্ধু। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে। দুই বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেবে না তো?" মানস সুধায় যুথিকাকে।

"আমি তো তার কোনো কারণ দেখছিনে। এটাও সিভিল ওটাও সিভিল। যারা আত্মরক্ষা করতে শিখবে তারাও একহিসাবে সৈনিক হতে শিখবে। শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। গর্তে ঢুকলেও কয়েক মিনিট পরে গর্ত থেকে বেরিয়েও আসবে। আর যারা সত্যাগ্রহ করবে তারা তো

অহিংসাবাদী সৈনিক ছাড়া আর কিছু নয়। তোমাদের দুই বন্ধুর কাজ পরস্পরবিরোধী হলে তো মনোমালিন্য দেখা দেবে।" যুথিকা আশ্বাস দেয়।

সভায় বেশ লোকসমাগম হয়েছিল। শোনা গেল সিভিল ডিফেন্সের জন্যে সময় দিতে পারেন এমন একদল নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রয়োজন। আগুন লাগলে তাঁরা আগুন নেবাবেন, মানুষ জখম হলে বা মারা গেলে তাঁরা স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন, আত্মীয় স্বজনদের খবর দেবেন, এমনি অনেক রকম কর্মের ভার তাঁদের উপর বর্তাবে। যাঁরা কর্মী হতে পারবেন না তাঁরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। নিষ্প্রদীপের সময় একটি ঘরেও যেন আলো না জ্বলে।

মানসও সভার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর মেলায়। পালিয়ে গিয়ে ক'জন এত বড়ো একটা শহরকে খালি করে দিতে পারবে? বেশীর ভাগই তো নানা জীবিকায় নিযুক্ত। যারা পালিয়ে যাবে তাদের বাড়ীতেও কি আগুন লাগবে না? কে সে আগুন নেবাবে? তাদের সম্পত্তিও কি লুট হবে না? কে তাদের সম্পত্তি আগলাবে? এমনিতেই পুলিশের যথেষ্ট কাজকর্ম। পুলিশের উপর সিভিল ডিফেন্সের ভার চাপালে ওরা ওদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে কখন? পুলিশের থেকে আলাদা করে একটা সংগঠন থাকা উচিত। সেটা পাবলিকের আয়ত্তাধীন হলেই ভালো হয়।

পুলিশ সাহেব তো এতক্ষণ আকারে ইঙ্গিতে তারিফ জানিয়েই যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষের উক্তিটির বেলা তাঁর মুখভাবে আপত্তি ব্যঞ্জিত হয়। মানস তা অনুমান করে ভাষণ সংক্ষেপ করে। সভাভঙ্গের পর পুলিশ সাহেব এসে তার ভাষণের তারিফ করে বলেন, "পাবলিকের আয়ত্তাধীন মানে তো পলিটিসিয়ান-দের আয়ত্তাধীন। আর পলিটিসিয়ান মানে তো কংগ্রেসম্যান। ওদের যা মেজাজ ওরা আমাদের ভারতছাড়া করবে। আমাদের জায়গায় যখন জাপানীরা এসে বসবে তখন নিজেরা কুকুরতাড়া হবে। ওদের ধারণা ওরা নাকি এক নেশন। হা হা হা হা! পেশাওয়ারের পাঠান আর তামিল ব্রাহ্মণ এক আসনে বসে একই রকম খাদ্য খাবে! হো হো হো হো।"

পুলিশ সাহেব গান্ধীজীর মহত্ত্ব মানেন। "তাঁর সব ক'টা আইডিয়াই সঠিক কিন্তু তিনি দু'শো বছর আগে জন্মেছেন। তাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবেন। এ দেশটা তাঁর দেশ হতে পারে, এ যুগটা তাঁর যুগ নয়। এমন মানুষকে নিয়ে কী করা যায়, বলুন তো? ওঁকে জেলে পুরলে উনি অনশনে প্রাণত্যাগ

করবেন। ওঁকে বাইরে রাখলে উনি বিদ্রোহের ডাক দেবেন। আপসের চেষ্টা কি কম হয়েছে? কিন্তু উনি চান পূর্ণ স্বাধীনতা। তাও আজ এক্ষুনি। জাপান ওদিকে ছোঁ মেরে কেড়ে নেবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। তখন কোথায় ইণ্ডিয়ান নেশন, কোথায় তার প্রতিনিধিদের কংগ্রেস!"

মানস নীরবে শুনে যায়। বিদায়কালে জানায়, "আপসের চেষ্টা আরো একবার করতে হবে। আপনাদের আক্ষরিক অর্থে ভারত ছাড়তে কেউ বলছেন না। শুধু ছাড়তে বলছেন রাজক্ষমতা। বড়লাট যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, কিন্তু ব্রিটেনের রাজার মতো তিনি হবেন কন্‌স্টিটিশউনাল হেড। যেমন কানাডায় বা অস্ট্রেলিয়ায়। এটা কি বেনজীর দাবী? জঙ্গীলাটকেও কেউ সরে যেতে বলছেন না, কিন্তু তাঁকে ব্রিটেনের মতো সিভিলিয়ান কণ্ট্রোল মেনে নিতে হবে। কারণ জয়পরাজয়ের জন্যে জবাবদিহির দায় তো সিভিলিয়ান মন্ত্রীমণ্ডলের। তিনি যদি তাঁর বুদ্ধির ভুলে পরাজয় ডেকে আনেন সিভিলিয়ান মন্ত্রীদেরই তো দায়ী করা হবে। মনোনীত কাউনসিলারদের কোনো রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু নির্বাচিত মন্ত্রীদের তো আছে। মনোনীতদের বদলে নির্বাচিতদের নিয়ে সরকার চালাতে হবে। কংগ্রেসের দাবী বলতে এই। এর চেয়ে বেশী নয়, কমও নয়। ওঁরা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। জাপানীদের মোকাবিলা করতে ওঁরা সম্পূর্ণ রাজী। আপস করতে হলে আর কালবিলম্ব করা সমীচীন নয়। বিলম্ব দেখলে গান্ধীজী তাঁর শেষ চালটি চালবেন।"

পুলিশ সাহেব বলেন, "যুদ্ধকালে ব্রিটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। করলে হেরে যেতে পারে। বৃথা আশা! বৃথা আন্দোলন! বৃথা ত্যাগস্বীকার! গান্ধী কি দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দেবেন বলে মনঃস্থ করেছেন? মিছিমিছি কতকগুলো মানুষকে জেলে পুরতে হবে। আমি দুঃখিত।"

"যদি কিছু না মনে করেন, দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দিচ্ছে কে? গান্ধী না ব্রিটিশ সরকার? বার্মায় কী দেখা গেল? জাপানীরা যদি আসে চট্টগ্রামে কী দেখা যাবে? মণিপুরে কী দেখা যাবে? আসামে কী দেখা যাবে? বার্মায় যেমন ক্ষমতার হস্তান্তর হলো ব্রিটিশেতে জাপানীতে, ভারতেও তেমনি ক্ষমতার হস্তান্তর হবে ব্রিটিশেতে জাপানীতে। তারপরে হয়তো পাল্টা আক্রমণ। হয়তো ক্ষমতার আবার হাতবদল, জাপানীতে ব্রিটিশেতে। সমস্তটাই ভারতের লোকের মাথার উপর দিয়ে। সে যা দুঃখ তার তুলনায়

জেলখানার দুঃখ তো বিলাসিতা। সে যা ত্যাগস্বীকার তার তুলনায় এ ত্যাগস্বীকার তো যৎসামান্য। গান্ধীজী যদি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে আপনারা জাপানকে ভারতের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবেন না, ভারতীয়দের একজনকেও জাপানীদের হাতে সঁপে দেবেন না তা হলে তিনি কখনো আপনাদের যুদ্ধকালে বিব্রত করতেন না। শুধু সহযোগিতায় বিরত থাকতেন। সেটা তাঁর যুদ্ধকালীন নীতি। জাপানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারতকে বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করার প্রতিক্রিয়া যুদ্ধে অসহযোগ। ওটুকু তাঁর বিবেকের অনুশাসন।" মানস ব্যাখ্যা করে।

পুলিশ সাহেব আমতা আমতা করে বলেন, "যুদ্ধে অমন কত হাতবদল ঘটে। কোথাও কেউ প্রত্যেকটি ইঞ্চি রক্ষা করতে পারে না। যুদ্ধ জিনিসটাই ওই রকম। এর জন্যে ব্রিটিশকে দায়ী করছেন যাঁরা তাঁরা নিজেরাও দায়ী হতেন, যদি ক্ষমতার আসনে থাকতেন। তাঁরা যে নেই তার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে যুদ্ধের পর তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসবেনই। আমরা নিজেরাই অনুভব করছি যে তাঁদের বাদ দিয়ে ভারত শাসন চলতে পারে না। প্রদেশে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন হয়েছে। কেন্দ্রেও হবে। সেটাই তো লজিকসম্মত পরিণতি। তার জন্যে আমরাও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি।"

মানসও বলতে সাহস পায় না যে, যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। কে জিতবে, কে হারবে তা নেতারাও জানেন না, মানুষ জানবে কী করে? অনিশ্চিতের উপর ভরসা রেখে নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। এটাই গান্ধীজীর আসল যুক্তি। কিন্তু এটা কি মুখ ফুটে বলতে আছে? ইংরেজমাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে আখেরে তার দেশ জিতবেই। মিস্টার হিটলার উইল বি সাউণ্ডলি ডিফিটেড। হিটলার ফার্স্ট। তারপরে মুসোলিনি ও তোজো। ইতিহাসে বরাবর যা হয়েছে এবারেও তাই হবে। ইংরেজরা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র। ঠাট্টা করে বলা হয় "দে উইল ফাইট টু দ্য লাস্ট ফ্রেঞ্চম্যান।" টু দ্য লাস্ট ইণ্ডিয়ান। মানস মনে মনে জুড়ে দেয়।

পাবলিকের উপর আস্থা না থাকলে পাবলিকেরই বা আস্থা থাকবে কেন? সিভিল ডিফেন্স সাধারণের সহযোগিতা পায় না। উমাশঙ্কর সামন্ত বলে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাস করেন। তিনি একাধারে রায় বাহাদুর তথা বিদ্যা-বিনোদ। "মহাভারতে দ্রৌপদীর ভূমিকা" বলে তাঁর এক সন্দর্ভ তিনি

মানসকে উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁকেই করা হয় সিভিল ডিফেন্সের কম্যাণ্ডাণ্ট। খাকি ইউনিফর্ম পরে তিনি প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে কুচকাওয়াজ করেন। বয়স যদিও ষাটের উপরে।

পুলিশ সাহেব তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন যে ভারতীয়রা এক নেশন। অথচ ওদিকে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট গঠনের তোড়জোড় চলেছে। নেশন কি তবে ভারতীয় নেশন নয়? তা হলে ভারতব্যাপী তার প্রসার কেন? হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি সবাইকে তার আহ্বান কেন? পেশাওয়ারের পাঠান আর তামিল ব্রাহ্মণ একই ফ্রন্টের সদস্য হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে সমবেত হয় কেন?

একদিন ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের শাখা সংগঠন করতে কলকাতা থেকে সফরে আসেন মানসের সতীর্থ হিতেশচন্দ্র ভৌমিক। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁদের দেশরক্ষার ব্রতে ব্রতী করতে চান। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না। ইউনিফর্ম পরতে হবে না। মাঝে মাঝে প্রচার অভিযানে যোগ দিতে হবে। নৃত্যে গীতে চিত্রে নাট্যে ভাষণে নানা ভাবে দেশবাসীকে যুদ্ধোন্মুখ করতে হবে। দেশবাসীর মনের জোর বজায় রাখতে হবে। যুদ্ধকালে সিভিলিয়ান মরাল মিলিটারি মরালের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

"ইম্পিরিয়ালিস্ট ওয়ার ফ্রন্ট নয়, ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট।" ভৌমিক লক্ষ করতে বলেন। "এটা ইংরেজদের ব্যাপার নয়, আমাদেরই ব্যাপার। আমি আমার নেশনের কাজই করছি। আমি জাতীয়তাবাদী। সরকার এটা জানেন। জানেন বলেই আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা জাতীয়তাবাদী-দেরই সংগঠন। কিন্তু সাবধানে কাজ করতে হয়। পাছে লীগপন্থী মুসলমানরা বয়কট করে।"

"সাবধানে কাজ করা বলতে কী বোঝায়, ভৌমিক?" মানস প্রশ্ন করে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' নৈব নৈব চ। একটি পঙ্‌ক্তিও না। একটি পদও না। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। জাতীয়তাবাদ থেকে বঙ্কিম বাদ। রবীন্দ্রনাথ নিয়েও যথেষ্ট দ্বিধা। 'জনগণমন অধিনায়ক' চলবে না। তাতে পাঞ্জাব সিন্ধু বঙ্গ থাকলে কী হবে, পাকিস্তান তো নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার' একই কারণে অচল। ভারত শব্দটাই যেন ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া। অতুলপ্রসাদের সেই বিখ্যাত বাণী 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', তাতেও আপত্তি। ভারতের স্বাধীনতাও ওদের

অম্বিষ্ট নয়। যদি না তার সঙ্গে থাকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি। অগত্যা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' আর কাজী নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' দিয়েই সভার কাজ চালাতে হয়। আমাদের নিজস্ব সঙ্গীতও কিছু আছে। নিজেদের লোকের রচনা। শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে নাৎসী ও জাপানী ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে। তবে সেগুলো জাতীয়তাবাদী না আন্তর্জাতিকতাবাদী তা বলা শক্ত। হ্যাঁ, ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে কমিউনিস্টরাও ভিড়ে গেছেন। প্ল্যাটফর্মটা তো যুদ্ধে সহযোগিতা। শয়তানও যদি সহযোগিতা করে তাকেও আমরা সঙ্গে নেব। যুদ্ধজয়ের পর ছাড়াছাড়ি হবে। আপাতত কোলাকুলি।" ভৌমিক উত্তর দেন।

ছাত্রহিসাবে ভৌমিক একদা আদর্শবাদী ছিলেন। কিন্তু চাকুরে হিসাবে উন্নতি করতে হলে কর্তাদের মন বুঝে মত বদলাতে হয়। তাই তিনি ঝালেও আছেন, ঝোলেও আছেন, অম্বলেও আছেন। মুসলিম মন্ত্রীরাও তাঁকে পছন্দ করেন। হিন্দু মন্ত্রীরা তো তাঁর স্বপক্ষে। ইউরোপীয় উপরওয়ালারাও তাঁকে বিশ্বাস করেন। ঝাল ঝোল অম্বল বলতে এই তিনকেই বোঝায়। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা কমিউনিস্ট মহলেও তিনি অপ্রিয় নন। কখনো যদি বিপ্লব ঘটে তাঁর চাকরি যাবে না। চচ্চড়িতেও থাকবেন।

ভৌমিক খুব সহজেই ভাব জমিয়ে নিতে পারেন। দীপক আর মণিকা দু'জনেই ওঁর চিরকালের চেনা হয়ে যায়। 'কাকু' যেন সত্যিকারের কাকু। এতদিন যেন বিদেশে ছিলেন। সবে ফিরেছেন। সুটকেস থেকে বার করেন আরবদেশের বীচিবিহীন খেজুর আর সুইটজারল্যাণ্ডের চকোলেট। যা আজকের বাজারে অদৃশ্য।

সারাদিন সরকারী গাড়ী নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে তিনি সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফেরেন। বিশ্রামের পর যখন আহারে বসেন তখন তাঁর পরণে ধুতী পাঞ্জাবী। বলেন, "আমি দেশী রান্নাই ভালোবাসি। কাঁচা লঙ্কা যেন আমার পাতের এক কোণে থাকে। অবশ্য আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়।"

মানস জানতে চায় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের ডাকে সাড়া পাওয়া গেল কতখানি। এখানকার কর্মকর্তা কারা।

"রায় উমাশঙ্কর সামন্ত বাহাদুর আর তাঁর বন্ধুবান্ধব। খনির মালিক, কলওয়ালা, আড়তদার, ঠিকাদার। যুদ্ধের বাজারে ওঁদেরি তো পৌষমাস। মোটা চাঁদাও উঠেছে। এখানকার শাখা স্বনির্ভর। কলকাতা থেকে আমরা

সিনেমা ফিল্ম পাঠাব। ওঁরা সিনেমা দেখাবেন। গানের দল পাঠাব। ওঁরা জলসা করবেন। একজন দেশবরেণ্য পুরুষকে সম্বর্ধনা দেবার সংকল্পও আছে। তিনি রাজনীতির উর্ধ্বে। তা দেখে রাজনীতিকদের সমালোচনা বন্ধ হবে। আমরা সংস্কৃতি অলম্বন করেই আমাদের কাজ করি। রাজনীতি অবলম্বন নয়। তা হলে অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়া দেন না কেন?" ভৌমিক জিজ্ঞাসা করেন।

"কারণ যুদ্ধের বাজারে তাঁদের পৌষমাস নয়। তাঁদের সর্বনাশ না হোক সর্বনাশের ভয়। মুদ্রাস্ফীতির জলতরঙ্গ রোধ করবে কে? সঞ্চয়ের মূল্য কী থাকবে? এখানে কমিউনিস্টদের তেমন প্রভাব নেই। বেশীর ভাগই কংগ্রেসের সমর্থক। তবে তাও প্রকাশ্যে নয়। পুলিশের ভয়ে নীরব।" মানস যতদূর জানে।

"মল্লিক," ভৌমিক সুধান, "বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করার উপায় কী, বলতে পারেন?"

"খাস বিলেতেরই যুদ্ধকালীন মূলনীতি হচ্ছে ইকুয়াল স্যাক্রিফাইস। সমান ত্যাগস্বীকার। সেইভাবে একপ্রকার শ্রেণীসাম্য বিবর্তিত হচ্ছে। সকলেরই একই রকম খোরাক, সকলেরই একই রকম পোশাক। অবশ্য ধনীরা ধনীই থেকে যাচ্ছেন, তবু তাদের মুনাফা বল্গাহীন নয়। আর দরিদ্ররা সকলেই কাজ পেয়ে যাচ্ছে, রোজগারও মন্দ নয়। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এটা একটা আবশ্যিক পদক্ষেপ। টোরিদের সরকার যুদ্ধকালে অচল। লেবার এসে টোরিদের সরকারকে কোয়ালিশন সরকার করেছে। তাই এই পরিবর্তন। এদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারে গুণগত পরিবর্তন চাই। ইকুয়াল স্যাক্রিফাইস হবে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের যুদ্ধকালীন মূলনীতি। সমান ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখলে বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে আসবেন।" মানস তার অভিমত জানায়।

ভৌমিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। আমার দৌড় নাচ গান নাটক অবধি। মাঝে মাঝে গুণীজন সম্বর্ধনা। এখানে একজন জ্ঞানতপস্বী আছেন শুনেছি। তিনি রাজী হবেন তো?"

"না। তিনি সভাসমিতিতে বা দরবারে যান না। তপস্যায় মগ্ন।" মানস তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে।

## ॥ ষোল ॥

গজদন্তের মিনার না হলেও কিম্ভূত এক ইমারতে বাস করেন আচার্য নরনারাণণ শিকদার। সেটাকে যন্তর মন্তর বলা চলে। তাঁর নিজস্ব ডিজাইন। ত্রিশ বছর সরকারী কলেজে অধ্যাপনার পর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে অবসর ভোগী এই জ্ঞানতপস্বী রাত জেগে আকাশের গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ও দিনভর নানা বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। কোথাও তিনি যান না। কেউ তাঁর কাছে আসে না। তবে যাঁরা শ্রদ্ধাবান জিজ্ঞাসু তাঁদের তিনি মাঝে মাঝে দর্শন দেন। তার জন্যে আগে থেকে তাঁর অনুমতি নিতে হয়। এই শহরে তাঁর মতো জন-অপ্রিয় ব্যক্তি দ্বিতীয় নেই। সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাব দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী অনুষ্ঠানে তিনি অদৃশ্য। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে দেশিকাচার্য উপাধি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি পণ্ডিত সমাবেশেও অনুপস্থিত। বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর দুর্নাম তিনি গজদন্ত মিনার অধিবাসী।

মানস যেবার তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে যায় তিনি বলেন, "যুদ্ধ আবার বেধেছে শুনছি। বাধিয়েছে কে? কায়জার?"

মানস তো অবাক। বলে, "কাইজার নয়, হিটলার।"

"হিটলার?" তিনিও অবাক। "কই, অমন কোনো শব্দ তো লাটিন ভাষায় নেই। সীজার, কায়জার, জার তিনটাই লাটিন নামের রকমফের। হিটলারও কি সীজারের প্রতিশব্দ? ওর ব্যুৎপত্তি কী? ওটা কি হিটাইট ভাষার শব্দ? অনেকের মতে হিটাইট ভাষাও আর্য ভাষা।"

মানস এসব ব্যাপারে পরম অজ্ঞ। বিদ্যে জাহির না করে অজ্ঞতা কবুল করে। "হিটলার যেমন আর্যামির জাঁক করছে তা শুনে মনে হতে পারে ওর পূর্বপুরুষ হিটাইট। তবে চার পাঁচ হাজার বছর পরে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। যেটা সবাই জানে সেটা এই যে লোকটা রাজবংশীয় নয়, রাজমিস্ত্রি, ঘরের দেয়াল জানালা রং করত। এখন সারা জার্মানীর মাথায় চড়ে বসেছে। কায়জার নয়, ফুয়েরার।"

"ফুয়েরার?" আচার্য বার বার উচ্চারণ করেন। "গ্রীক নয়, লাটিন নয়, টিউটনের মতো লাগছে। ব্যুৎপত্তি কী ওর?"

"বুৎপত্তি জানিনে। অর্থ, মহান নেতা।" মানস যতদূর জানে।

এ হেন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করতে হলে কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য থাকা চাই। নইলে আলাপ জমবে কেন? সে ভৌমিককে হুঁশিয়ার করে দেয়।

ভৌমিক ঘুরে এসে বলেন, "না, যতটা ভয়ঙ্কর ভেবেছিলুম ততটা নয়। সামুরাইদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, পরীক্ষায় পাশ করি। কিন্তু জেন বৌদ্ধধর্ম আর জৈনধর্মের পার্থক্য বলতে পারিনে। তিনিই আমাকে বোঝান। অসাধারণ জ্ঞানী, কিন্তু রাজনীতির ধার ধারেন না। খবরের কাগজ পড়েন না। জাপান যে শিয়রে বসে আছে তা শুনে চমকে ওঠেন। সামলে নিয়ে বলেন, ওরা তো আমাদের শত্রু নয়। আমাদের ধর্মভ্রাতা। একই বৌদ্ধধর্ম ওদের আর আমাদের ধর্ম। ওরা এলে লুম্বিনী, কপিলবাস্তু, সারনাথ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, বুদ্ধগয়া, সাঁচী আবার জেগে উঠবে। হিন্দু রিভাইভাল তো ঢের দেখলুম। এবার দেখতে পাব বৌদ্ধ রিভাইভাল। এসব কথা আমি রিপোর্ট করব না, মল্লিক। করলে ভদ্রলোকের রায় বাহাদুরি কেড়ে নেওয়া হবে। পেনসনও বন্ধ হতে পারে। তবে ইংরেজ রাজত্ব থাকলে তো?"

"তুমিও সন্দেহ করো, থাকবে কি থাকবে না? তা হলে অন্যে পরে কা কথা!" মানস রঙ্গ করে।

ভৌমিক ফিস ফিস করে বলেন, "পলাশীর পর অত বড়ো যুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতে ঘটেনি। দু'শো বছর আমরা বাঙালীরা বর্গীর হাঙ্গামার চেয়ে ভীষণ কিছু দেখিনি। আর পলাশীর যুদ্ধও কি একটা যুদ্ধ নাকি? এই প্রথমবার আমরা যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। সবাই তো নার্ভাস হবেই। আমি কি বাঙালী নই, ইংরেজ? আর ইংরেজও যে আদৌ নার্ভাস নয় তাই বা কেমন করে মানি? ওরা বহু যুদ্ধ দেখেছে, ওরা ততটা নার্ভাস নয়। তবে জাপানীদের হাতে বন্দী হতে ও বন্দীশিবিরে বাস করতে কি ওরা প্রস্তুত? না বোধহয়। সিঙ্গাপুরে যা হাল হয়েছে ওদের! অভাবনীয়!"

"সিঙ্গাপুর থেকে পালাবার পথ থাকলে কি ওরা জাপানীদের হাতে বন্দী হতো? এদেশে পালাবার অসংখ্য পথ। বন্দী হওয়ার ভয় নেই। তবে আমরা যারা চাকুরে তাদের চাকরি হারানোর ভয় আছে। জাপানের অধীনে কাজ করলে ইংরেজ তাড়াবে। ইংরেজের অধীনে কাজ করলে জাপান খেদাবে। উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার কবিরাজদের কিসের ভয়?" মানস একান্তে বলে।

"সরকারী চাকরির ওই তো বিপদ। ইংরেজরা যদি বার্মার মতো বাংলাদেশ থেকে পশ্চাদ্ অপসরণ করে আমাকেও তাদের অনুগমন করতে হবে, মল্লিক। এই অনিশ্চিত অবস্থায় ওরাও মন দিয়ে শাসন কর্ম চালাতে পারছে না। রেশন ব্যবস্থা এখনো শুরু হলো না। সময় থাকতে যদি না হয় অনটন দেখা দিতে পারে। খেতে না পেলে যেমন জওয়ানরা লড়তে জোর পায় না তেমনি সাধারণ নাগরিকদেরও মনের জোর চলে যায়। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট ওদের কী করে প্রেরণা জোগাবে? কিন্তু ওটা তো আমার এক্তারে নয়।" ভৌমিক অসহায়।

গণ সত্যাগ্রহের প্রসঙ্গ ওঠে। জাপানীরা এর সুবিধে নেবে না তো? ওদের যারা পক্ষপাতী তারাও কি সুবিধে নেবে না? মানস উদ্বিগ্ন।

"অসম্ভব নয়। জনমত এখন দুই ভাগ বিভক্ত। একভাগের ধারণা ইংরেজ তো যাচ্ছেই, ওদের থাকতে সাহায্য করে কী লাভ? তার চেয়ে নবাগতকে অভ্যর্থনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আরেকভাগের বিশ্বাস জাপানীরা ইংরেজদের হারিয়ে দিলে কী হবে, মার্কিনদের কাছে হেরে যাবেই। তা হলে জাপানীদের অভ্যর্থনা করে কেন ইংরেজদের বিষনজরে পড়া? বুদ্ধিমানের কাজ যে আখেরে জিতবে তাকেই খুশি রাখা। বেশীর ভাগ লোকই বিষনজর এড়াতে চায়।" ভৌমিকের অনুমান।

"কিন্তু গণ সত্যাগ্রহের কী হবে? ওটা কি ব্যর্থ হবে?" মানসের প্রশ্ন।

"অন্যান্য প্রদেশের কথা বলতে পারব না। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে দেখছি তার জন্যে খুব কম লোকই প্রস্তুত। মুসলমানরা তো একেবারেই নয়। ওরা জানতে চায় ব্রিটিশ রাজ চলে গেলে রাজা হবে কে? কংগ্রেস রাজ হিন্দু রাজ ও তো আরো খারাপ। তার জন্যে ওরা লড়তে যাবে কেন? হিন্দুরাও সতর্ক। কায়িক নিরাপত্তার কথাই তো মানুষের প্রধান ভাবনা। জাপান কি তেমন কোনো অঙ্গীকার দিয়েছে? দিলে এত লোক পা দিয়ে ভোট দিত না। একদা যারা কন্যাকুব্জ থেকে এসেছিলেন তাঁদের সন্ততি এখন কন্যাকুব্জেই ফিরে চললেন। সিবলিকাল সত্যাগ্রহ সব সময়েই করা যায়। দশ বিশ হাজার সত্যাগ্রহী পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু গান্ধীজীর এবারকার উদ্দেশ্য সিবলিকাল সত্যাগ্রহ নয়। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলতে জেলযাত্রা বোঝায় না। বোঝায় যুদ্ধযাত্রা। তার জন্যে আরেক রকম ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট চাই। কোথাও কি তার অস্তিত্ব আছে? গড়ে তোলার সময়ই বা কোথায়?" ভৌমিক ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেন।

এর পরে ওঠে সম্বর্ধনার প্রসঙ্গ। মানস জানতে চায় আচার্য রাজী কি না।

"ক্ষেপেছেন? উনি কী বলতে গিয়ে কী বলবেন, তার পর আমার মাথা কাটা যাবে। 'এস হে আর্য, এস অনার্য' দিয়ে আরম্ভ করবেন, বলতে বলতে বলে বসবেন, 'এস হে বৌদ্ধ, এস নিপ্পন'। ওঁর কি কালজ্ঞান আছে? উনি বাস করছেন ত্রিশ বছর আগেকার যুগে। জিজ্ঞেস করছিলেন উড্রো উইলসন কি মিকডোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন? তা কী করে হবে? ওঁরা যে পরস্পরের মিতা। না, ভাই, আমার সম্বর্ধনায় কাজ নেই। উনি রাজী হলেও আমি নারাজ। কথাটা আমি পাড়তে যাবার আগেই তাঁর মনোভাব লক্ষ করে মত পরিবর্তন করেছি। বলেন কিনা মুসলমানদের যেমন তুরস্ক পারস্য হিন্দুদের তেমনি চীন জাপান। ওদের যোগসূত্র যেমন ইসলাম আমাদের যোগসূত্র তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ তো একদিন হবে, না হবে না? সেদিন মুসলমানের পক্ষে যদি তুরস্ক দাঁড়ায় তো হিন্দুর পক্ষে জাপান দাঁড়াবে। মুসলমানের খলিফা আছেন, হিন্দুর কে আছে? হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? ওই জাপান সম্রাট। উনিও বৃহত্তর অর্থে হিন্দু। সম্রাট অশোক যে অর্থে হিন্দু ছিলেন। খেলাফৎ আন্দোলনের মতো আমাদেরও একটা আন্দোলন চাই। মাঞ্চু সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনার জন্যে।" ভৌমিক তাজ্জব বনে গেছেন।

মানস হো হো করে হেসে ওঠে। ওর হাসি আর থামতে চায় না। বলে, "জাপান তো সেই কর্মই করছে। মাঞ্চুকুও তার প্রথম ধাপ। শেষের ধাপটি বোধহয় পালযুগের গৌড়ভূমি। ধর্মপালের দিগ্বিজয়। সাত সমুদ্র তেরো নদীতে ময়ূরপঙ্খী নাও।"

"কী মধুর স্বপ্ন! এই স্বপ্নবিলাসী জাতিটাকে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জাগতে হবে একদিন। জাপানীরা বৌদ্ধ নয়, জাপানী। চীনারা বৌদ্ধ নয়, চীনা। তুর্করা মুসলমান নয়, তুর্ক। ইরানীরা মুসলমাদ নয়, ইরানী। আজকের জগতে ধর্মকে মুখ্য স্থান দেওয়া আর চোখে ঠুলি পরে রাস্তায় চলা একই জিনিস। হিন্দু মুসলমানকে কী করে এটা বোঝাই, বলুন তো? ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কিন্তু এই প্রশ্নটাতে মুসলমানকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা জোর গলায় ঘোষণা করতে পারছিনে যে আগে জাতীয়তা, পরে ধর্ম। ইংরেজরাও খ্রীস্টান, জার্মানরাও খ্রীস্টান, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা তারা

ইংরেজ, তারা জার্মান। তাই যদি হয়ে থাকে পশ্চিমের বেলা সত্য তবে প্রাচ্যের বেলাও সত্য হবে না কেন? প্রাচ্য মানেই কি প্রাচীন? কিন্তু কী করব? আমার হাত পা বাঁধা। আমাকে এমনভাবে কাজ করতে হয় যাতে হিন্দু মুসলমান ইউরোপীয়ান সবাই তুষ্ট হন। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।' এই আমার জীবনদর্শন।" ভৌমিক অকপটে ব্যক্ত করেন।

"তা হলে তুমি হয়তো একদিন জাপানীদেরও তুষ্ট করবে। যদি তারা গৌড়ভূমিতে পাল যুগ ফিরিয়ে আনে। পাল রাজাদের বংশধর কি খোঁজ করলে মিলবেন না? সাকসেসফুল সিভিল সার্ভ্যান্ট তাঁরাই যাঁরা মেরীকেও মানেন, মনসাকেও মানেন, ওলাবিবিকেও মানেন। জাপানীদের কান্ননকে মানতেও সময় লাগবে না। আসলে তিনি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরা না-স্ত্রী, না-পুরুষ। এঞ্জেলদের মতো। কিন্তু জাপানে গিয়ে অবলোকিতেশ্বর স্ত্রী হয়ে গেছেন। আর মঞ্জুশ্রী হয়েছেন পুরুষ। মহাত্মা গান্ধীও তো বোধিসত্ত্ব বা এঞ্জেলদের মতো না-স্ত্রী না-পুরুষ হতে সাধনা করছেন। অতি কঠোর সাধনা।" মানস প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

শুনে ভৌমিক তো হতবাক। "ওটা শুধু কঠোর নয়, নিষ্ফল সাধনা। অমন সাধনার পার্টনার হতে রাজী হবেন কোন্ নারী? রাজী হলে তিনিও তো হবেন না-স্ত্রী, না-পুরুষ। তাঁকে মা বলে ডাকবার জন্যে কেউ জন্মাবে না। কই, কোথাও তো পড়িনি এঞ্জেল বা বোধিসত্ত্বদের কোনো পার্টনার ছিলেন। তবে কি গান্ধীজী এমন এক স্বর্গের কল্পনা করছেন যেখানে সকলেই নিঃসঙ্গ, সকলেই নিঃসন্তান? ভারতকে সেই স্বর্গে করো উপনীত, এটাই কি তাঁর প্রার্থনা?"

"আমার মনে হয় এর একটা সূক্ষ্ম কারণ আছে। এ যুগের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমস্যা হচ্ছে শূদ্রের জাগরণ তথা নারীর জাগরণ। গান্ধীজী শূদ্রের সঙ্গে অর্থাৎ শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে স্বেচ্ছায় কায়িক শ্রম বরণ করে নিয়েছেন। আদালতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার বৃত্তি কী? তিনি উত্তর দেন, আমি একজন চাষী ও তাঁতী। উচ্চশ্রেণীর লোক যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অভিন্ন হয় তা হলে সমসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। গান্ধীই হন শূদ্রজাগরণের হোতা। তাঁর গণজাগরণও মূলত শূদ্র জাগরণ। অধিকাংশ সত্যাগ্রহীই তো শূদ্র বর্ণ থেকে উদ্গত। সত্যাগ্রহ সফল হলে ওরা কি আর ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, ক্ষত্রিয়

প্রাধান্য, বৈশ্য প্রাধান্য সহ্য করবে? একটা সমস্যার সমাধান তো ওই ভাবেই হবে। বাকী থাকবে আর-একটা। নেতার পক্ষে শূদ্র হওয়া যদি-বা সম্ভব হয় নারী হওয়া তো সম্ভব নয়। তা হলে নারীর সঙ্গে তিনি একাত্ম হবেন কী করে? নবদ্বীপের ললিতা দাসীর মতো নারীবেশ ধারণ করে? অবিকল নারীর মতো সাজ। নাকে নথ। নারীর মতো হাবভাব। ছলাকলা। কিন্তু মঠের কর্তাগিরির সময় তিনি প্রবলপ্রতাপ পুরুষ। গান্ধীজী চাষীর বেশ ধরেছেন, নারীর বেশ ধরেননি। কিন্তু নারীর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে তাঁর আত্মা ব্যাকুল। নারী হওয়া যাবে না, কিন্তু নারীর সব চেয়ে কাছাকাছি আসা যাবে, যদি এঞ্জেল বা বোধিসত্ত্বদের একজন হওয়া যায়। তাঁদেরি মতো সেক্স্‌লেস। আক্ষরিক বা কায়িক অর্থে নয়। ভাবার্থে। তাঁর আন্দোলনে যত নারী সাড়া দিয়েছে তত আর কারো আন্দোলনে নয়। গণ সত্যাগ্রহে লক্ষ লক্ষ নারী ঝাঁপ দেবে বলে আশা করা যায়। এরা যখন ঘরে ফিরে যাবে তখন আর বিনা বাক্যে সমাজশাসন মেনে নেবে না। সমাজশাসন মানে তো পুরুষশাসন। পুরুষশাসনেরও অন্ত হবে, যেমন ব্রিটিশ শাসনের। অমনি করে আর-একটা সমস্যারও সমাধান হবে। নেতৃত্ব করতে হবে তাঁকেই। তার জন্যে এই দুশ্চর সাধনা। স্বর্গলাভের জন্যে নয়। ইন্দ্রত্বের উপর তাঁর লোভ নেই। তিনি রাজনীতির জগতে এসেছেন ন্যায়নীতির অনুসরণে। সত্যাগ্রহের জয় হলেই তিনি বিদায় নেবেন। যদি না সত্যাগ্রহকালেই তাঁর দেহান্ত হয়। সামনেই অগ্নিপরীক্ষা।" মানস উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে।

"কে না চায় তার স্বদেশের স্বাধীনতা? লাটসাহেব পর্যন্ত স্বীকার করেন যে ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জাপানকে হটিয়ে না দিলে নয়। আপাতত কংগ্রেসের উচিত বড়লাটের শর্তে রাজী হয়ে যাওয়া। বড়লাটকে সাক্ষীগোপালে পরিণত না করা। কংগ্রেস রাজী হলে মুসলিম লীগও রাজী হবে। না হলে নিজেই কোণঠাসা হবে। আমরাও ভিতর থেকে দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্যে সচেষ্ট। ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম করার জন্যে নয়।" ভৌমিক আন্তরিকভাবে বলেন।

"তা হলে আপনারা ভিতর থেকে চেষ্টা চালিয়ে যান, যেন গণ সত্যাগ্রহের আগেই মিটমাট হয়।" মানসের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

কলকাতা থেকে জাপানী বোমার ভয়ে যাঁরা স্থানান্তরিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রথিতযশা সম্পাদক ভবতোষ আচার্য। মানস একদা তাঁর

পত্রিকায় লিখত। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পাদক হবার স্বপ্ন দেখত। পরে অন্য পথে যায়, অন্য পত্রিকায় লেখে। যোগাযোগ ছিন্ন হয়। সম্প্রতি আবার সেই সম্পর্ক জোড়া লেগেছে। তিনিও মানসের আবাসে এসে বইপত্র ধার করে নিয়ে যান ও দিয়ে যান, মানসও তাঁর নিবাসে গিয়ে তাঁর খবরাখবর নেয়। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তিনি মফঃস্বলে এসেও দুনিয়ার হালচাল রাখেন। কলকাতা থেকে নিয়মিত দেশের বিভিন্ন এলাকার খবরের কাগজ পান, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে সময়মতো কলকাতার আপিসে পাঠান, যাতে নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হয়। বিলম্ব তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। তাই শরীর হাজার অসুস্থ থাকলেও তিনি তাঁর লেখার টেবিলে গিয়ে বসেন। দিনের বেলা কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। সন্ধ্যার দিকে তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গল্প করেন। জমিয়ে রাখেন। একাধারে রাশভারী ও রসিক এই বর্ষীয়ান ঋষিকল্প ভদ্রলোক এখানে অরণ্যবাস করছেন। পরিবারের আর সবাই কলকাতায়।

ভৌমিককে নিয়ে মানস তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যায়। বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বলে, "ইনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট গঠন করে বেড়াচ্ছেন।"

তিনি রসিকতা করে বলেন, "ইংরেজরা সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বার্মায় ব্যাক দেখিয়ে এসেছে। ফ্রণ্ট দেখাবে কোথায়? না ওকাজটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দিতে চায়? আমরাই লড়ে মরব?"

বৈঠকখানায় আরো কয়েকজন দর্শনার্থী ছিলেন। হাসাহাসি করেন।

ভৌমিক বলেন, "ওরা পালিয়ে বাঁচতে পারে, আমরা তো পালিয়ে বাঁচতে পারব না। পালাব কত দূরে আর কোন্ বিদেশে? কাজেই আমরা জাপানীদের কনফ্রণ্ট করব। করব এক নেশন হয়ে।"

"তা হলে শুনুন একটা ছড়া বলি।" সম্পাদক মজা করে আওড়ান।

"শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।"

তার পর টিপ্পনী কাটেন। "একালের শিব ঠাকুর হচ্ছেন ব্রিটিশ রাজ। আর তিন কন্যে হচ্ছেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর রাজন্যমণ্ডলী। কংগ্রেস রাঁধবে বাড়বে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে। মুসলিম লীগ খাবে, অর্থাৎ অন্যের অর্জিত ক্ষমতা ভোগ করবে। আর রাজন্যমণ্ডলী প্রস্তাবিত

ফেডারেশনের সামিল না হয়ে রাগ করে বাইরে থাকবেন। অর্থাৎ একরাশ বলকান রাষ্ট্র সৃষ্টি করবেন। এটাই হলো প্যাটার্ন। এর কস্মিন্ কালে রদবদল হবে না। জাপানকে রুখতে হলে ওই কংগ্রেসই রুখবে, কংগ্রেস না রুখলে আর কে রুখবে? ইংরেজ তো পিছু হটবে। মুসলিম লীগ তো তার পিছু নেবে। রাজন্যরা তো প্রথম সুযোগেই বশ্যতা স্বীকার করবেন। কংগ্রেসের এখনো কিছু মোহ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু গান্ধীজীর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি স্থির করেছেন শিব ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্কই রাখবেন না। শিব ঠাকুরকে বিদায় দেবেন। তার পরে তিন কন্যার মধ্যে একটা সমঝোতা হলেও হতে পারে, কিন্তু শিব ঠাকুর থাকতে হবার নয়। তাই তিনি বলছেন, ভারত ছাড়ো। শ্বশুরবাড়ী ছাড়ো।"

ভৌমিক আর সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেন, কিন্তু সবিনয়ে অনুযোগ করেন, "স্যার, আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে শিবঠাকুরেব সঙ্গে সম্পর্ক কেটে গেলেই তিন কন্যার মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হবে? এক কন্যা না হয় সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, বাকী দুই কন্যা তো একভাবে না একভাবে সম্পর্ক রাখতে পারেন। তার বেলা কী উপায়? এ দেশ কি তা হলে অর্ধ-স্বাধীন ও অর্ধ-পরাধীন হবে?"

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সম্পাদক বলেন, "সেই কথাই তো আজ আমি আমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে ডাকে দিয়েছি। কপি রাখিনি, তাই দেখাতে পারছিনে। কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা পায় তো আধখানা ভারতেই পাবে। বাকী আধখানার ভাগ্য নির্ধারিত হবে গৃহযুদ্ধে। সেটা তো আর অহিংসভাবে হবে না। সুতরাং গান্ধীজীর ভূমিকা শেষ। দেশটা যদি দু'তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মৃত্যু ঘটবে। তা যদি হয় কী নিয়ে আমি বাঁচব? আমারও যে মরতে ইচ্ছে করবে। ট্র্যাজেডী! ট্র্যাজেডী! ট্র্যাজেডী!"

তাঁর মুখে হাসি নেই, কণ্ঠস্বরে কান্নার আমেজ। আর সকলেরও তাই।

মানসের মনে পড়ে লিঙ্কনের প্রসিদ্ধ উক্তি "দিস্ নেশন ক্যান নট লিভ হাফ স্লেভ অ্যাণ্ড হাফ ফ্রী।" সে সম্পাদক মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

"এ দেশটা আমেরিকা নয়, মানসমোহন। এখানকার শতকরা বাইশজন নাগরিক মুসলমান। আর্মিতে মুসলমানের অনুপাত শতকরা চল্লিশ। বোধহয় এই যুদ্ধে পঞ্চাশ। এদের সহযোগিতা না পেলে, এদের বিরোধিতা পেলে

লিঙ্কনের ভূমিকায় অভিনয় করা অসম্ভব। আর তেমন ব্যক্তিত্বই বা কোথায়! তাঁর পেছনে রেপাবলিকান পার্টির মতো একটি রাজনৈতিক দলই বা কোথায়! শুধুমাত্র সৈন্যবলে বলীয়ান হয়ে তিনি গৃহযুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন না। গান্ধীজী যে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন সেটা কংগ্রেসের মতো এক বৃহৎ পার্টি তাঁর পেছনে আছে বলেই।" ভবতোষবাবু যুক্তি দেখান।

মানস স্তব্ধ হয়ে শোনে। তার পর বলে, "তা হলে কি ইংরেজকে ভারত ছাড়তে আলটিমেটাম দেওয়া ভুল?'

"আলটিমেটাম না দিলে ওরা জাপানের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়বে না। আলটিমেটাম মানে আর কিছু নয়, হয় তোমরা জাপানের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ো, নয় আমরা তোমাদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ি। হয় তোমরা জাপানের সামনা-সামনি হয়ে বল, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, নয় আমরা তোমাদের সামনাসামনি হয়ে বলি, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ভারতের ইতিহাসে এমন সঙ্কট আর কখনো দেখা দেয়নি। এই যে অভূতপূর্ব সঙ্কট এ সঙ্কটে ইংরেজ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, রাজন্যমণ্ডলী সকলেরই কর্তব্য একজোট হয়ে জাপানের সম্মুখীন হওয়া। তার জন্যে চাই একটি ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট তার বিকল্প নয়। তার অনুষঙ্গ। আপনি যে কাজ করছেন সে কাজও একটা করবার মতো কাজ, হিতেশচন্দ্র। কিন্তু ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট না হলে সেটা যেন শিবহীন যজ্ঞ।" ভবতোষবাবু ভৌমিকের দিকে তাকান।

এবার সাহসে বুক ঠুকে সম্বর্ধনার প্রস্তাব তোলেন ভৌমিক।

"বলেন কী! সম্বর্ধনা! কাকে। বোমার ভয়ে পলাতককে! আমি যে গ্লানিতে মরে যাচ্ছি। স্ত্রী নেই, কিন্তু ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি তো আছে। কলকাতায় তাদের বোমার মুখে ফেলে রেখে আমি যে পালিয়ে এসেছি এটা কি সম্বর্ধনার যোগ্য কীর্তি? আমি আসতে চাইনি, কিন্তু ওরা আমাকে মোটরে চাপিয়ে জোর করে চালান করে দিয়েছে। বৃদ্ধবয়সে আমি অসহায়।" তিনি সহাস্যে বলেন।

এর পরে তিনি গম্ভীর হয়ে স্মৃতিচারণ করেন। "তরুণ বয়সে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে জীবনে কখনো সরকারী চাকরি করব না। তাই সরকারী চাকরির সুযোগ পেয়েও সুযোগ নিইনি। বেসরকারী চাকরিও চাকরি। তাই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি। স্বাধীনভাবে সম্পাদকতা করেছি। অল্পে সন্তুষ্ট থেকেছি। সরকারের কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি বা পাইনি। আজ

শেষ বয়সে সম্বর্ধনা গ্রহণ করি কোন্ সুবাদে ? সরকারেরই বা এই সুমতি কেন ? এতে করে কি দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করা যাবে ? আমি আজীবন স্বরাজের জন্যে একজন সম্পাদকের পক্ষে যা করবার তা করেছি। স্বরাজের কয়েকটা ধাপ পার হয়ে আসা গেছে। শেষেরটা বাকী আছে। ইংরেজদের কাছ থেকেই আমি সেটা চাই। জাপানীদের কাছ থেকে নয়। ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বরাজ দিয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডকেও। জাপানীরা কবে কাকে স্বরাজ দিয়েছে ? তাদের কাছে স্বরাজ প্রত্যাশা করা মূঢ়তা। স্বরাজ কখনো পূব দিক থেকে আসবে না। একদিন না একদিন পশ্চিম দিক থেকেই আসবে। তার জন্যে গান্ধীজী যা করেছেন তা আমি সব সময় সমর্থন না করলেও মোটের উপর অনুমোদন করেছি। এবারেও আমার মনে কিছু দ্বিধা আছে। আমার বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে একাকী দেশরক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের উপস্থিতি অপরিহার্য। কে জানে জাপানীদের মনে কী আছে ? অকস্মাৎ একদিন একটা পার্ল হারবার ঘটিয়ে বসবে। ইংরেজদের আমি যতটুকু বিশ্বাস করি জাপানীদের ততটুকুও করিনে। লক্ষ করেছেন কি না জানিনে, ইংরেজরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেটাই আন্তর্জাতিক প্রথা। কিন্তু জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে তা করেনি। ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও না। একটা আজব তত্ত্ব শুনছি। জাপানীদের উদ্দেশ্য নাকি ব্রিটিশবিতাড়ন, ভারত অধিকার নয়। তাই ব্রিটিশ বিতাড়নের কাজটা ভারতীয় জনগণকেই আগে ভাগে করে রাখতে হবে। তা হলে আর জাপানীরা ভারত অধিকার করতে পা বাড়াবে না। এটা কি জাপানী মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ? না মহাত্মার মহত্ত্বের উপর ? ভারতের ঘরে ক্ষমতার শূন্যতা দেখলে বাইরে থেকে কেউ না কেউ ছুটে আসবেই। জাপানীরা সব চেয়ে নিকটে। সুতরাং জাপানীদের দ্বারাই ক্ষমতার শূন্যতার পূরণ হবে। আমাদের কর্তব্য আমি যতটুকু বুঝি পাওয়ার ভ্যাকুয়াম আদৌ ঘটতে না দেওয়া। পাওয়ার ভ্যাকুয়াম ঘটলে কংগ্রেস একাকী তা পূরণ করতে পারবে না। সঙ্গে নিতে হবে মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য শরিকদের। কিন্তু তারা যদি দেশের উপরে সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই উচ্চতর স্থান দেয় তবে তো মিলে মিশে শূন্যতা পূরণ করা চলবে না। আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে সীমান্তের ওপারে জাপান থাকতে এপারে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা সমীচীন নয়। স্বরাজের আরো দেরি হয় হোক। 'কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি' শুনে

আমি চমকে উঠি। ওটা হলো বিশ্বাসীর উক্তি, যুক্তিবাদীর নয়। ইংরেজদের অস্তিত্বই জাপানীদের ডেকে এনেছে কি-না তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সীমান্তের ওপারে যতদিন জাপানীদের অস্তিত্ব ততদিন আমাদের আশঙ্কার কারণ রয়েছে। ইংরেজরা ততদিন থাকলে আশঙ্কাটা কমে। তবে তাদের নিরঙ্কুশ হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে কে জানে কী ধ্বংস করবে! সেইজন্যেই তো গোটা ডিফেন্স পোর্টফোলিওটা একজন ভারতীয় পারিষদের হাতে দেওয়া চাই। কংগ্রেসের দাবী অযথা নয়।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। তবে চার্চিলকে বোঝায় কার সাধ্য!

তা শুনে ভৌমিক বলেন, "লাটসাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, মিস্টার চার্চিল ইজ নট ইংল্যাণ্ড।"

"কিন্তু এবারকার মহাযুদ্ধে চার্চিলই তো ইংল্যাণ্ডের ভরসা। সেবার যেমন অ্যাসকুইথকে সরিয়ে দিয়ে লয়েড জর্জ প্রধানমন্ত্রী হন এবার তেমন কেউ নেই যে চার্চিলকে সরিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন।" মানস যতদূর জানে।

"তবে চার্চিলও একেবারে কাস্ট আয়রন নন। দেখছেন না তাঁর পরম শত্রু স্টালিনের সঙ্গেও কোলাকুলি করছেন?" ভৌমিক তর্ক করেন।

সম্পাদক মহাশয়ও তর্কে যোগ দেন। "ইংরেজদের মস্ত বড়ো গুণ ওরা সময় বুঝে ওদের পলিসি বদলায়। চার্চিলও একজন ইংরেজ। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে হিটলারকে হারিয়ে দিতে হলে স্টালিনকে মদত দেওয়া চাই। যদি তা সত্ত্বেও স্টালিন হেরে যান তবে কমিউনিজমও হেরে যাবে। রক্ষণশীলদের হাড় জুড়োবে। সে রকম একটা পরিস্থিতি ভারতেও দেখা দিতে পারে, যদি বামপন্থীরা ভারতীয় জওয়ানদের ভাঙিয়ে নিয়ে বিপ্লব ঘটায়। তখন চার্চিল বাবাজীর টনক নড়বে। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর চির বিরোধ ভুলে যাবেন। তবে মহাত্মা বোধহয় তাঁর সাহায্য নেবেন না। তিনি বরাবর আত্মনির্ভর।"

"কিন্তু বামপন্থীরা তো এখন পরস্পরবিরোধী।" মানস সবিনয়ে বলে। "একদল ঝুঁকেছে ইংরেজদের পক্ষে, যেহেতু ইংরেজ রাশিয়ার পক্ষে। আরেক-দল ইংরেজের বিপক্ষে, যেহেতু ইংরেজ স্বাধীনতার বিপক্ষে। বিপ্লবটা মাঠে মারা যাবে, যদি বামপন্থীরা পরস্পরকে মেরে সাবাড় করে। জওয়ানরাও যে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধাবে না তা নয়। হিন্দুরা হাঁকবে 'দুর্গা মায়াকী জয়।' আর মুসলমানরা হাঁকবে 'আল্লা হো আকবর।' আর শিখেরা

হাঁকবে 'সৎ শ্রী অকাল'! একজনও হাঁকবে না 'ভারতমাতাকী জয়' বা হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ'। আর বিপ্লব? যেখানে যতবার বিপ্লব ঘটেছে কেবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয় পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধেও ঘটেছে। পুরোহিততন্ত্রের জোর যেখানে এত বেশী সেখানে রাজদ্রোহ হতে পারে, বিপ্লব হতে পারে না। রাজদ্রোহকেই আমাদের বামপন্থীরা বিপ্লব বলে ভ্রম করেন। পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে লড়বার মতো সাহস তাঁদের নেই। ঠাকুর দেখলেই গড় করেন। বিবাহের বা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বামুন ঠাকুরকেও তাঁদের চাই।"

সম্পাদক মহাশয় খুশি হয়ে বলেন, "তা হলে ভেবে দেখুন আমাদের যৌবনে পৌত্তলিকতা বর্জন ও উপবীত ত্যাগ কতখানি বৈপ্লবিক ছিল। আমাকে আমার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সঙ্গে কী পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সংগ্রাম বলতে কি কেবল কারাবরণ বা সাহেব নিধন বোঝায়? বিপ্লব হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। আমরা সর্ব ক্ষেত্রে হাত দিতে পারিনি। জনবল আমাদের ছিল না। তা ছাড়া ইংরেজকে আমরা কেবল বিদেশী বা সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ভাবিনি। মিত্রও ভেবেছি তাদের আধুনিকতার জন্যে, প্রগতিশীলতার জন্যে। জুডিসিয়াল সীস্টেমের জন্যে, পার্লামেণ্টারি সীস্টেমের জন্যে। এত বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতা আর কোন্ রাজত্বে ছিল? ইণ্ডিয়ান বলুন, ন্যাশনাল বলুন, কংগ্রেস বলুন তিনটিই তো ওদেরই সৃষ্টি। সম্পর্কটা পরে তিতিয়ে যায়।"

## ॥ সতেরো ॥

ভবতোষবাবুর মফঃস্বলবাস সীতার বনবাস নয়। কলকাতা থেকে তাঁর পুত্রেরা মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যান। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা এই শহরেই বাস করেন। তত্ত্বাবধানের অভাব হয় না। তবু তাঁর মন উড়ু উড়ু। কবে ফিরে যাবেন এই তাঁর ধ্যান।

একদিন তাঁর বড়ো ছেলে পরিতোষ মানসের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। "আপনারা এখানে না থাকলে বাবা এখানে থাকতে চাইতেন না। মিসেস মল্লিকেরও উনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমরা আপনাদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞ।"

তখন যূথিকাকেও তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। সে চায়ের আয়োজন করে। বলে, "কলকাতার অবস্থা জানতে ইচ্ছে করে।"

পরিতোষবাবু বলেন, "আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মানুষ এমন জীব যে সব রকম অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। তা সে যুদ্ধই হোক আর দুর্ভিক্ষই হোক আর ভূমিকম্পই হোক আর মহামারীই হোক। ব্ল্যাক আউট, তবু থিয়েটার সিনেমা একরাত্রিও বন্ধ নেই। ফটকা, জুয়া, ঘোড়দৌড়, ভাগ্যগণনা সমানে চলেছে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা তো জনশূন্য হতে পারে না। পলাতকরা দলে দলে ফিরে আসছে। মাথার উপর বাজ পড়লেও তারা আর পালাবে না। এই নগরেই কর্ম আমার এই নগরেই মরি।"

"তা হলে তো আপনার বাবাকেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কেন তিনি এমন পাণ্ডবের মতো অজ্ঞাতবাস করবেন? অত বড়ো প্রসিদ্ধ জ্ঞানীকে এখানে চিনবে কে? তাঁর রেফারেন্সের বই জোগাবে কে? আমাদের সামান্য সংগ্রহ থেকে বই ধার করতে আসেন। আমরা ধন্য বোধ করি। আপনি এসে ঠিক সময়ে ফিরিয়ে দিয়ে যান। আর কেউ তো ফেরৎ দেবার কথা মনে রাখে না।" যূথিকা বলে।

"সত্যি, দরকারী রেফারেন্সের বই হাতের কাছে না পেলে বাবার মতো সবজান্তা সম্পাদকের চলে না। আমাকে লিখলে আমি নিয়ে আসতে পারতুম, কিন্তু সেটুকু দেরিও তাঁর সইত না। খাবারের মতো খবরও গরম গরম পরিবেশন করতে হয়। তেমনি খবরের উপর মন্তব্যও। তাঁর সময়োচিত মন্তব্য পড়ে গভর্নমেন্টেরও পলিসি বদলে যেতে দেখেছি। আর গান্ধীজীও সম্প্রতি বলতে আরম্ভ করেছেন যে ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের মাটিতে মোতায়েন থাকতে পারে, যদিও ব্রিটিশ শাসনকে অপসরণ করতে হবে। অবিকল বাবার বক্তব্য।" পরিতোষবাবু দাবী করেন।

"আমিও একমত।" মানস সমর্থন করে।

"আমি কিন্তু একমত নই।" পরিতোষবাবু একটা চমক দেন।

"সে কী! আপনার বাবার সঙ্গে আপনার মতের মিল নেই। কী তা হলে আপনার মত?" মানস জানতে উৎসুক।

"দেখুন, মিস্টার মল্লিক, গান্ধীজী আর বাবা প্রায় একবয়সী। তাঁদের চিন্তাধারা মোটামুটি একই খাতে বয়। যদিও মতভেদও মাঝে মাঝে ঘটে। আমি হচ্ছি কিনা জবাহর আর সুভাষের সমবয়সী। আমাদের চিন্তাধারা

আরো একেলে। এর নাম জেনারেশন গ্যাপ। আরো খোলসা করে বলি, ব্রিটিশ সৈন্য এদেশের মাটি অঁাকড়ে থাকতে এ মাটির সন্তানরা কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে না। পূর্ণ ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে নেতারা পুলকিত হতে পারেন, কিন্তু আমরা তো নেতা নই. সাধারণ নাগরিক। আমরা তো ক্ষমতার স্বাদ পেতে পারিনে, স্বাধীনতার স্বাদই পেতে পারি। অরাজকতাকে আমরা ভয় করিনে। তাতেও মেলে স্বাধীনতার স্বাদ। গান্ধীজী গোড়ায় যা বলেছিলেন সেটাই ছিল আমাদের মনের কথা। পরে যেটা বলতে শুরু করে-ছেন সেটা বাবার মতো দরদী সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্যে গোঁজামিল। কেন. ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে কেন? ভারতরক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্যই কি যথেষ্ট নয়? দরকার দেখলে আমরা আরো রিক্রুট করব। জাপানী সৈন্যরা এখন সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারত অভিযানের জন্যে ওরা বড়ো জোর হাজার ত্রিশেক সৈন্য বরাদ্দ করতে পারে। ত্রিশ হাজারকে রুখতে তার দু'গুণ সৈন্য তৈরি। তফাৎটা শুধু এই যে জাপানীরা স্বাধীন দেশের সৈনিক, আর ভারতীয়রা পরাধীন দেশের। স্বাধীনের সঙ্গে পরাধীনের সংঘর্ষে পরাধীনের মনের জোর কম। গান্ধীজী বলেন এখন থেকে আমাদের স্বাধীন বলে ভাবতে হবে, পরাধীন বলে নয়। সৈনিকরা যেদিন অনুভব করবে যে তারাও স্বাধীন সেদিন নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে জাপানী সৈনিকদের সঙ্গে লড়বে। এইজন্যেই না আমরা চাই ব্রিটিশ সৈন্যের অপসরণ। হয় হবে অরাজকতা। নিতে হবে তার ঝুঁকি। নো রিস্ক, নো গেন। বাবাকে এ তত্ত্ব বোঝানো শক্ত।" পরিতোষবাবু চায়ে চুমুক দেন।

"তা এই যদি হয় আপনার চিন্তাধারা তবে তা আপনাদের নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন না কেন?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"সর্বনাশ! যুদ্ধকালে কড়া সেনসরশিপ। সম্পাদককে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। কাগজ বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন দাঁড়াব কোথায়?" পরিতোষ-বাবু কাতর দৃষ্টিতে তাকান।

"তা হলে লিখে কাজ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় অরাজকতা সম্বন্ধে আপনার চেয়ে আমার ধারণা আরো পরিষ্কার। আইন অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর না করে ব্রিটিশ রাজ যদি হঠাৎ উধাও হয় তবে জজ হিসাবে আমার বিচারের অধিকার থাকবে না, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনের অধিকার থাকবে না, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের গ্রেপ্তারের অধিকার থাকবে না, জেলারের বন্দী

আটক করার অধিকার থাকবে না, ট্রেজারি অফিসারের বেতন দেবার অধিকার থাকবে না। চোখের সামনে ট্রেজারি লুট হয়ে যেতেও পারে। লুটেরাদের ধরবে ক? বাঁধবে কে? সাজা দেবে কে? সাজা বলবৎ করবে কে? যে যার খুশিমতো একটা প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট খাড়া করতে পারে, কিন্তু সে গভর্নমেণ্টের প্রতি আনুগত্য স্বতঃসিদ্ধ নয়। নিযুক্তিপত্র আসা চাই, সে নিযুক্তি পত্র সকলের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই। নইলে আমরা হব গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আজকের এই প্রেস্টিজ আর থাকবে না। গান্ধীজী বলেছেন অরাজকতা হয়তো দিন পনেরো স্থায়ী হবে। কিন্তু দিন পনেরোর ব্রেকও তো একটা ব্রেক। সেই পনেরো দিনের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের চাকরিতে ব্রেক হবে। আমরা মাইনে পাব না। পরে হয়তো নতুন শর্তে চাকরি করতে হবে। মিলিটারিতে যারা কাজ করছে তাদের বেলাতেও একথা খাটে। পনেরো দিন যদি তারা বেকার বসে থাকে তো যুদ্ধ করবে কোন্ অধিকারে? সেই যুদ্ধবিরতির ফাঁকে জাপানীরা এগিয়ে এসে জেলার পর জেলা দখল করতে পারে। সেসব জেলার লোক কি স্বাধীনতার স্বাদ পাবে, না দ্বিতীয় পরাধীনতার স্বাদ? কেউ না কেউ গান্ধীজীকে এসব কথা বুঝিয়েছে। তাই তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া' বহাল রাখলেও 'টু গড অর অ্যানার্কি' বাদ দিয়েছেন।" মানস অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

পরিতোষবাবু জানতেন না যে ব্রিটিশ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই অফিসারমাত্রেরই চাকরি খতম হবে। তাঁর আপিস লুট হয়ে গেলেও থানার অফিসার-ইন-চার্জ তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন না, কারণ তিনি আর অফিসার-ইন-চার্জ নন। তিনি কেউ নন। পরিতোষবাবুদের বাড়ী পুড়ে গেলেও দমকল বাহিনী তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না। কারণ সে বাহিনীর কার্যকাল ফুরিয়েছে। তিনি যে রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠতে পারবেন সেটাই বা কেমন করে সম্ভব হবে? যদি ড্রাইভার, গার্ড, লাইনসম্যান কেউ কাজে যোগ না দেয়। তা হলে তিনি তাঁর বাবাকে দেখতে আসবেন কী করে? মোটরে করে? পথে ডাকাত পড়ে মোটরটাই ছিনিয়ে নেবে।

"না, পনেরো দিনের অরাজকতার কথা আমি সমর্থন করিনে। অরাজকতা যদি হয় একদিন কি দু'দিনের জন্যে হবে।" পরিতোষবাবু নেমে আসেন।

"আহা, সেইটেই তো হয়েছিল রেঙ্গুনে। দিন তিনেকের জন্যে। সে ক'টা দিনের বিভীষিকার বৃত্তান্ত কি আপনারা রেঙ্গুনফের্তাদের মুখে শোনেননি?

জেলখানা আর পাগলা গারদ খালি পেয়ে যারা বেরিয়ে আসে তাদের আবার জেলখানায় আর পাগলা গারদে পোরার আগে বিষম কাণ্ড ঘটে যায়। বিপ্লবের দিনেও রাশিয়ায় অরাজকতা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট গঠিত হয়। পরিবর্তনটা অধিকাংশ অফিসার মেনে নেন। মানেন না যাঁরা তাঁদের শূন্যস্থান সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়। আসলে অরাজকতার কথাটা গান্ধীজীর মাথায় আসে এইজন্যেই যে ব্রিটিশ রাজ কাউকেই তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করতে রাজী নন। কংগ্রেসকে তো নয়ই, মুসলিম লীগকেও তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসিয়ে বিদায় নেবেন না। তা হলে তাঁরা কাউকে আসন ছেড়ে না দিয়েই বিদায় হোন। ঘটুক একটা সাময়িক শূন্যতা। পূরণ করবে হয় কংগ্রেস, নয় লীগ, নয় উভয়ে, নয় আর কেউ। কিন্তু তা যদি হয় তবে তো সেটা সেই রেঙ্গুনের মতো পরিস্থিতি। অমন এক অনিশ্চয়তার মুখে সবাইকে ফেলে দিয়ে ইংরেজরা চম্পট দিলে স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদ লাগবে মিস্টার আচার্য। ওয়ার অভ সাকসেসন বেধে যেতে পারে। কংগ্রেসে ও লীগে। হিন্দুতে ও মুসলমানে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে ও বাংলাদেশে। দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নামক তত্ত্ব মুসলমানদের ক'জন মানে? জোর করে চাপাতে গেলে উল্টো বিপত্তি হবে। ওরা ইংরেজকেই আঁকড়ে ধরবে। ইংরেজও ওদের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দেবে।" মানস শিউরে ওঠে।

পরিতোষবাবু অনেকটা শান্ত হয়ে বলেন, "আমরা ইংরেজদের উপর এতদূর ক্ষেপে রয়েছি যে মুসলমানদের দিকে নজর দিতে হেলা করছি। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের একটা অলিখিত চুক্তি ছিল যে ওরা আমাদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সে কাজ ওরা দু'শো বছর ধরে করেছেও। কিন্তু এখন আর পারছে না। সিঙ্গাপুর, মালয় আর বার্মা হলো ভারতের তিন তিনটি গেটওয়ে বা দেউড়ি। তিনটিই ওরা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার ফলে চুক্তির খেলাপ হয়েছে। তেমনি আরো একটা অলিখিত চুক্তি ছিল ওরা হিন্দুরও পক্ষ নেবে না, মুসলমানেরও পক্ষ নেবে না, হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু কার্জনী আমল থেকে আমরা দেখে আসছি ওরা নিরপেক্ষ নয়, ওদের পক্ষপাতটা সুয়োরানীর উপরে। ব্যামফীল্ড ফুলার তো প্রকাশ্যে বলেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ই ওঁর ফেভারিট ওয়াইফ। সুয়োরাণীর দাবী স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী থেকে শুরু করে স্বতন্ত্র বাসভূমি অবধি গড়িয়েছে। প্রথম দাবীর মতো চরম দাবীও একদিন মেনে নেওয়া হবে। তার মানে আরো এক

চুক্তিভঙ্গ। কেন তবে আমরা ঘটনার স্রোতকে ততদূর গড়াতে দিই? কেন তার আগে তৃতীয় পক্ষকে বিদায় না করি? তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই বরং দুই পক্ষে সমঝোতা হতে পারে। তৃতীয় পক্ষ ঘরে থাকতে নয়।"

"সমঝোতা হবে, না গৃহযুদ্ধ হবে, কেমন করে জানলেন? কাগজ খুললেই তো দেখি গালিগালাজ। গালগালি থেকেই একদিন আসবে মারামারি। ফ্রম ওয়ার্ডস দে মে কাম টু ব্লোজ।" মানস আশঙ্কা করে।

"সেটাও তৃতীয় পক্ষ আছে বলেই। ওরাই তলে তলে উস্কে দিচ্ছে। ওরা সরে গেলেই দুই পক্ষে মিটমাট হবে। ঝগড়া তো চিরকাল চলতে পারে না। কিন্তু ওরা যদি দেশটাকে দু'টুকরো করে দিয়ে যায় তবে দুই সমান্তরাল রেখা আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। যেমন লাগেনি আয়ারল্যাণ্ডে। আইরিশদের উচিত ছিল বিগত মহাযুদ্ধের মাঝখানেই ইংরেজদের আয়ারল্যাণ্ড ছাড়তে বাধ্য করা। ডি ভালেরা সেই চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু আইরিশদের অধিকাংশই ছিল জার্মানদের বিপক্ষে ও ইংরেজদের পক্ষে। যেমন ছিল ভারতীয়দেরও অধিকাংশ। সেই ভুলটা আমরা এদেশে করব না এই যুদ্ধে। নইলে যা হবে তা আয়ারল্যাণ্ডের পার্টিশনের পুনরাবৃত্তি। আমরা আগে খেদাব ইংরেজকে, তার পরে জাপানীকে। এইখানেই আমাদের গুরুজনদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ। তাঁরা চান আগে জাপানীদের খেদাতে, তারপরে ইংরেজদের।" পরিতোষবাবু খোলসা করেন।

তর্কটাকে থামিয়ে দেয় যূথিকা। "আমরা আপনার চেয়ে কমবয়সী। আমাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা! কতটুকু জ্ঞান! কে যে কাকে খেদাবে, কাকে আগে আর কাকে পরে, এসব আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। আমরা শুধু এইটুকু চাই যে আমাদের যেন বিহারের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়।"

পরিতোষবাবু প্রথমটা ঠাহর করতে পারেন না। মানস তাকে বুঝিয়ে দেয় যে জাপানীরা এতদূর এলে তাকে বিহারে প্রব্রজ্যা করতে হবে, যদি না সে জাপানী সৈন্যদের তোয়াজ করতে রাজী হয়।

"আরে, না, না! আপনি কেন করবেন তোয়াজ? তবে তার আগেই যা ঘটবার ঘটবে, মিস্টার মল্লিক। একটি ছোট পাখী আমার কানে ফিসফিস করে বলেছে যে বিহারীরা এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শুধু গান্ধীজীর কাছ থেকে সিগনালের অপেক্ষা। ওরা ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেবে। মোটর চলাচলও বাধা পাবে। তখন কোথায় থাকবে

ইংরেজদের পালাবার পথ! তখন বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে। ওদের আমরা ভারত ছাড়াতে চাইনে, গদী ছাড়াতে চাই। হাতীর হাওদার গদীতে বসে আমরাই জাপানীদের তাড়াব! জাপানী এতদূর আসবে না, মিসেস মল্লিক।" অভয় দেন পরিতোষবাবু।

'ওমা, তাই নাকি।" চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা।

"চুপ! চুপ!" পরিতোষবাবু ঠোঁটে আঙুল ঠেকান।

মানস বলে, "কিন্তু ওটা তো গণ সত্যাগ্রহ নয়। যুদ্ধকালে ওর নাম সাবোটাশ।"

পরিতোষবাবু চটে যান। "আরে মশায়, রাখুন আপনার জজিয়তী! কেবল চুলচেরা বিচার। একটা নেশনের লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ স্ট্রাগল কতরকম রূপ নিতে পারে। ওটাও একটা রূপ! যারা পারবে তারা সত্যাগ্রহ করবে। যারা পারবে না তারা সাবোটাশ করবে। যদি নরহত্যা না করে তবে সেটাই হবে যথেষ্ট অহিংসা। দয়া করে বাবার কানে এসব তুলবেন না। তিনি আশা করছেন যে শেষ মুহূর্তে একটা আপস হবে। আরেকটা গান্ধী-বড়লাট চুক্তি।"

বিহারের মতো যুক্তপ্রদেশেও রেল লাইন বন্ধ করার তোড়জোড় চলছে এ রকম একটা গুজবও শোনা গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে বেগম হায়দারের মুখে। তিনি আরো মাস খানেক দেরি করতেন, কিন্তু ট্রেন চলাচল অনিশ্চিত হতে পারে, এই গুজব শুনে ছুটে এসেছেন। যা রটে তা কিছু কিছু বটে।

আলী হায়দার মানসকে ও তাঁর বেগম যূথিকাকে নিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে গিয়ে বসেন। যাতে প্রাণ খুলে কথা বলা সহজ হয়।

"আপনাকে তো গ্রামে গঞ্জে টুরে যেতে হয় না। আমাকে যেতে হয়। আগে তো সবাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যমের মতো ডরাত। কিন্তু ইদানীং কী এক হাওয়া উঠেছে। যেখানেই যাই এগুা বাচ্চা ছেলে ছোকরা এসে চিল্লায়, 'কুইট ইণ্ডিয়া। ইচ্ছে করলে ওদের আমি গ্রেপ্তার করতে পারতুম, কিন্তু করিনে। যুদ্ধে ওদের সহযোগিতা আমাদের দরকার। প্রচারকার্য করতে বেরিয়ে গ্রেপ্তারকার্য করতে পারিনে। করলে প্রচারকার্য বৃথা যাবে। সহ্য করতে হয়। হাসিমুখে বলতে হয়, আমি তো ইংরেজ নই। আমি ভারত ছেড়ে যাব কোন্ দেশে? পাকিস্তানে? অমনি ওদের মুখ চুপ। মল্লিক, গান্ধীজীর এই স্লোগান জিন্না সাহেবকেই সাহায্য করছে। তিনিও বলছেন, 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। ইংরেজরা কুইট করলে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বেই।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিশ, ইণ্ডিয়ান আর্মি—কোনোটাই আস্ত থাকবে না। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে কণ্ট্রোল করবে কারা? কেমন করে ধ্বংস করতে হয় এ বিদ্যা যাঁরা ওদের শেখাচ্ছেন তাঁরা?" হায়দার হেসে উড়িয়ে দেন। রাজনীতিকদের উপর ওঁর বিশ্বাস নেই।

মানস দুঃখ প্রকাশ করে। "আপনি রাজপ্রতিনিধি বলেই আপনাকে ওরা 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলছে। আপনি যদি পদত্যাগ করেন তা হলে আর অমন কথা বলবে না। তেমনি, বড়লাট যদি পদত্যাগ করেন তবে তাঁকেও না। আক্ষরিক বা কায়িক অর্থে একটি ব্যক্তিকেও ভারত ছাড়তে হবে না। ভারতত্যাগ মানে পদত্যাগ। 'ভাগ করো আর ত্যাগ করো' বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু শুধু-মাত্র পদত্যাগ নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্না সাহেবের তফাৎ এইখানেই। জিন্না সাহেব ইংরেজকে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভাগ করিয়ে নেবেন। যে ইংরেজ এমনিতেই রাজ্যরক্ষা করতে অসমর্থ। যার নাকের ডগায় যুক্তপ্রদেশের ও বিহারের জনতা রেল লাইন রোধ করার সাহস পাচ্ছে। যে জাপানীদের রুখতে পারছে না সে জনতাকে রুখবে কিসের জোরে? শেষপর্যন্ত দেখা যাবে জনতাই জাপানীদের রুখছে। একই উপায়ে।"

"তার পর সেই উন্মত্ত জনতার উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে কে? না সে নিরঙ্কুশ হয়ে লুটপাট খুনখারাপি ঘর জ্বালানো চালিয়ে যেতে থাকবে? অবশেষে বহুভাগ হয়ে গিয়ে এক অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? ইংরেজদের কিসের দায়? ওরা তো পালিয়ে বাঁচবে। জাপানীদেরই বা দায় কিসের? ওরাও ফিরে যাবে। দায় তো আমাদেরই। আমরা যদি যে যার পদে থাকি। না আমরাও পদত্যাগ করে প্রাণে বাঁচব? অরাজকতার দিনে আমাদের কর্তব্য কি 'চাচা, আপনা বাঁচা'? আমি তো মনে করি তার বিপরীত।" হায়দার শক্ত হয়ে বলেন।

"গান্ধীজীও আমাদের পদত্যাগ করতে বলছেন না। যে যার পদে অধিষ্ঠিত থেকে যে যার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতেই বলছেন।" মানস জানায়।

"গান্ধীজী তো সেইসঙ্গে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাও বলছেন। গ্রামে গ্রামে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট বা রেপাবলিক গঠনের নির্দেশও দিয়েছেন। এর মানে কী, মল্লিক? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা কি গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়? জেলা জজের ক্ষমতা কি গ্রাম্য মোড়লের হাতে তুলে দেওয়া যায়? পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্টের ক্ষমতা কি মহল্লার সর্দারের

উপর ন্যাস্ত করা যায়? ক্ষমতা আর দায়িত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দায়িত্ব পালন করতে কি এরা সক্ষম? কোনোদিন কি হবে? ভোটের অধিকার সবাইকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শাসনের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, গ্রেপ্তারের অধিকারও কি সবাইকে দেওয়া যায়? ইংরেজদের জায়গায় ভারতীয়দের বসানো যায়, কিন্তু জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের জায়গায় যাকে তাকে বসানো স্বরাজও নয়, সুরাজও নয়, চরম অব্যবস্থা। ভারতীয়করণ ভালো। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ বলতে যদি এই বোঝায় তবে এটা ভালো নয়। আংশিক ক্ষমতা তো ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন বার্ডের মেম্বারদের উপরে। আরো কিছুর কথা ভাবা যাবে, কিন্তু আপাতত নয়।" হায়দার অভিমত দেন।

মানস চিন্তা করে বলে, "কয়েকটি অফিসারের সর্বময় কর্তৃত্ব সুশাসন হতে পারে, স্বশাসন নয়। স্বশাসনের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার তথা দায়িত্বের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এইপর্যন্ত আমি বুঝি। কিন্তু খুঁটিনাটি বুঝিনে। ব্রিটিশ আমলে ক্ষমতা নেমেছে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে। স্বাধীন আমলে ক্ষমতা উঠবে নিচের থেকে উপরে। নিচের স্তরের নাগরিকরা যদি হৃদয়ঙ্গম করে যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের দায়িত্ব তারা পালন করতে অক্ষম তা হলে সেসব ক্ষমতা তারা জেলা স্তরে অর্পণ করবে। গান্ধীজীর স্বপ্ন এমন এক রাষ্ট্র যার চতুরঙ্গ নয় আর্মি, পুলিশ, কোর্ট ও জেল। এ স্বপ্ন স্বরাজের পরেও স্বপ্নই থেকে যাবে। তিনিও আপাতত ততদূর যেতে বলছেন না। দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়।"

ওদিকে বেগম হায়দার বলছিলেন যুথিকাকে, "বর্তানিয়ার সঙ্গে জাপানের লড়াই তো থমকে রয়েছে। ওরাও আসছে না, এরাও যাচ্ছে না। ভাবছিলুম আরো কিছুদিন দেখি না কী হয়। বেঙ্গল যখন নিরাপদ হবে তখন ওঁর সঙ্গে মিলিত হব। কিন্তু শুনলুম সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই শুরু হয়ে গেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। কে জানে কতকাল আটকা পড়তে হবে। কংগ্রেসীরা নাকি বলছে এবার ওরা জেলে যাবে না। উল্টে ওরাই জেলে পাঠাবে। কী ভয়ঙ্কর কথা! তা হলে তো মিস্টার মল্লিকও নিরাপদ নন, মিস্টার হায়দারও না। জানিনে এখানে কংগ্রেসের জোর কত। ওখানে বড়ো কম নয়। সামনে একটা এসপার কি ওসপার। ওখানেও ভয় এখানেও ভয়। ভেবে দেখলুম আমার স্থান আমার সাহেবের পাশেই। তাই আর দেরি না করে চলেই এলুম।"

"ভালোই করেছেন। তবে আমি তো ভয়ের তেমন কোনো আভাস পাচ্ছিনে। না জাপানের দিক থেকে, না কংগ্রেসের দিক থেকে। যাই ঘটুক না কেন আমি আমার কর্তাকে ফেলে আর কোথাও যাব না। তবে বলতে পারছিনে সরকার তাঁকে আর কোথাও বদলী করবে কি না, আর কোনো পদে নিযুক্ত করবে কি না। ফ্রন্টে পাঠাতেও পারে। পাঠালে উনি যাবার জন্যে লাফাবেন। আজকের জগতে উনি নীরব দর্শক থাকতে চান না। ভয়ের কারণ আছে বইকি। ভয়কে জয় করতে হবে।" যূথিকা সাহস দেয়।

"আমিও কি আমার সাহেবকে বেশীদিন ছেড়ে থাকতে চাই? ওঁকে একলা ছেড়ে দিতে চাই? কিন্তু ওঁর স্বপ্ন যদি কখনো সফল হয়, পাকিস্তান সম্ভব হয়, তবে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। পাঞ্জাবীদের শিকড় পাকিস্তানেই, তাদের তো শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে নতুন করে মাটিতে পুঁততে হবে না। তাদের অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিচ্ছেদ ঘটবে। তারা পাকিস্তান চাইতেও পারে, পেতেও পারে। কিন্তু ওদের বেলা যেটা সুখের আমাদের বেলা সেটা দুঃখের। পরম দুঃখের। সাতশো বছরের একটা বটগাছকে তার ঝুরিসমেত শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় পুঁততে পারো, কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। আমাদের বংশ যুক্তপ্রদেশের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। ঘরবাড়ী জমিজমা মসজিদ গোরস্থান মক্তব মাদ্রাসা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব কিছু ফেলে চলে যাব? শহরে গ্রামে আমাদের নাম গাঁথা। রাস্তায় ঘাটে আমাদের পরিচয় আঁকা। ভাষায় সাহিত্যে সঙ্গীতে নৃত্যে আমাদের ছাপ, আমাদের প্রভাব। সব মুছে যাবে? সাতশো বছরের কালচার বিলকুল সাফ? আর পাঞ্জাবীদের কি কালচার বলে কোনো পদার্থ আছে? কালচার বলতে ওরা বোঝে এগ্রিকালচার। আর মিলিটারি সার্ভিস। মনের দিক থেকে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব, যদি পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করি। ওঁর কাছে যেটা হোমল্যাণ্ড আমার কাছে সেটা ওয়েস্টল্যাণ্ড।" দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বেগম হায়দার। তাঁর গলা ভারী হয়ে আসে।

"ওঁরা তো বাংলাদেশকেও পাকিস্তানের সামিল করতে চান। সেটা সম্ভব হলে কলকাতায় এসে নতুন করে শিকড় গাড়বেন। তা যদি হয় তবে কালচারের অভাব হবে না। আপনি নিশ্চয় মানবেন যে বাঙালীদের কালচার আছে। বাংলার কবি এখন বিশ্বকবি।" যূথিকা সগর্বে বলে।

"হ্যাঁ, বাঙালীদের কালচার আছে তা ঠিক। কিন্তু সেটাতে মুসলমানের

দান কতটুকু? আমরা যদি আসি আমরা কি ওতে আমাদের দান মিশিয়ে দিতে পারব? যেমন গঙ্গার সঙ্গে যমুনার স্রোত? বাংলার মুসলমান তো আমাদের বাঙালী না বানিয়ে ছাড়বে না। আর আমরা যদি ওদের হিন্দুস্থানী—না, না, পাকিস্তানী—বানাতে যাই তবে আমাদের মেরে তাড়াবে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আলমগীর বাদশা কী বলে গেছেন, জানেন? ওটা একটা নরক, যেখানে সবরকম সুখাদ্য পাওয়া যায়।" বেগম সহাস্যে বলেন।

"তা হলে এই নরকটাকে পাকিস্তানের সামিল করে স্বর্গে পরিণত করা যাবে না। অমন একটা বিদ্‌ঘুটে প্রস্তাব প্রত্যাহার করাই ভালো। আপনারা আসুন, থাকুন, দান করতে চান করুন। আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু এটা যদি আপনাদের হোমল্যাণ্ড হয় তো আমাদের কী হবে? ফরেন ল্যাণ্ড? না আমাদের শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে যুক্তপ্রদেশের মাটিতে নতুন করে পোঁতা হবে? বাঙালীকে বানাতে হবে হিন্দুস্থানী? হিন্দুয়ানী আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। হিন্দীভাষা তো পাইনি। আমরাই বা হিন্দীতে কী দান করতে পারি? হিন্দীতে লিখে কি আমাদের একজন নোবেল প্রাইজ পেতে পারবেন? বাংলাদেশ আমরা ছাড়ব না, কলকাতা তো নয়ই, তার আগে মারব ও মরব।" যূথিকা গভীরভাবে শুনিয়ে দেয়।

"আপনার সেন্টিমেণ্ট আমারও সেন্টিমেণ্ট। শিকড় তুলে নিতেও কষ্ট, শিকড় নতুন করে পুঁততেও কষ্ট। অকারণ এই কষ্ট!" বেগম হাতে হাত মেলান।

ওদিকে আলী হায়দার বলছিলেন মানসকে, "ইয়ে ক্রান্তিকারী জমানা হ্যায়।" জবাহরলালের হিন্দী উর্দু মেশানো ভাষায়। "এ জমানায় সব কিছুই সম্ভব। ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা, হিন্দুদের হাত থেকে পাকিস্তান, বুর্জোয়াদের হাত থেকে বিপ্লবী রাষ্ট্র। কিন্তু তার আগে জাপানকে রুখতে হবে, হটাতে হবে, হারিয়ে দিতে হবে। তাকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অথচ সেই জিনিসটিই প্রকারান্তরে হতে যাচ্ছে। গণ সত্যাগ্রহ যদি যুদ্ধকালে না হয়ে শান্তিকালে হতো আমার তাতে আপত্তি থাকত না। কিন্তু যুদ্ধকালে গণ সত্যাগ্রহ মানে জাপানকে প্রশ্রয়দান। জাপান এই ক্রান্তিকারী জার্মনার সুযোগ নিয়ে আরো এক কদম এগিয়ে আসবে। গান্ধীজী অবশ্য বলে রেখেছেন যে তিনি তেমন কিছু ঘটতে দেখলে গণ সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বোতলে বন্দী দৈত্যকে একবার বোতল থেকে মুক্তি দেওয়া যত সহজ আবার

যোতলে বন্দী করা তত সহজ নয়। গান্ধীজী ডাক দিলে যত লোক সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে পরে তিনি তত লোককে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। তারা তখন উন্মাদ। তখন তাদের উপর গুলী চালাতে হবে। সেই অপ্রিয় কর্তব্যটা আমার। কিংবা তাদের ফাঁসী দিতে হবে। সেই অপ্রিয় কর্তব্যটা আপনার। গান্ধীজী তো নিজেই স্বীকার করছেন যে জনগণ এখন অহিংসার জন্যে প্রস্তুত নয়। তাই যদি হয়ে থাকে তবে কংগ্রেসের আন্দোলন অহিংস থাকতে পারে না। দিকে দিকে চৌরী চৌরার পুনরাবৃত্তি হবে। তিনি থামতে বললে কেউ থামবে না। সংগ্রামমাত্রেরই একটা মোমেণ্টাম আছে। সেই মোমেণ্টাম কারো হুকুমে থামবে না। রাজা ক্যানিউটের মতো অবস্থা হবে গান্ধীজীর। সমুদ্রকে-তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, এইপর্যন্ত। এর বেশী নয়। সমুদ্র তাঁর সে হুকুম মানেনি। তাঁকে তাঁর চেয়ারসুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এযাত্রা গান্ধীজীর প্রাণসংশয়।" হায়দার করুণস্বরে বলেন।

মানস অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। সে ভালো করেই জানে যে বামপন্থীরা ওৎ পেতে বসে আছে। গান্ধীজী যেই সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন অমনি ওরাও সেই সংগ্রামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তাদের সহিংস কার্যকলাপ শুরু করে দেবে। জেলে যাওয়া ওদের মতলব নয়। জেলে গেলে ওরা জেলকেই ভাঙবে। জেল কর্মচারীদের ভাঙিয়ে নেবে। পুলিশ কর্মচারীদেরও। জওয়ানদেরও। দক্ষিণপন্থীরা ভালোমানুষের মতো জেলে গিয়ে দায়িত্ব এড়াবেন। গান্ধীজীকে অনশন করতে হবেই। তার আভাসও তিনি দিয়ে রেখেছেন। তাঁর পক্ষে জীবন মরণ সমস্যা। তাঁকে বারণ করতে পারেন একমাত্র বড়লাট লিনলিথগো। তাঁর বন্ধুপ্রতিম। কিন্তু বারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করাও দরকার। সেটা তাঁর সঙ্গে সমঝোতা। সমঝোতা যদি না হয় তো সংগ্রাম অনিবার্য। জাপান তার সুযোগ নিতেও পারে, না নিতেও পারে। ইংরেজকে বিতাড়ন করা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তো কংগ্রেসই সে কাজ করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। জাপানী সৈন্যকে মরতে পাঠিয়ে কেন তারা অনর্থক বলক্ষয় করবে?

"আমি গভীরভাবে চিন্তিত।" মানস মৌনভঙ্গ করে। "হ্যামলেটের মতো আমার জিজ্ঞাসা, টু বি অর নট টু বি। দুই দিকেই যথেষ্ট যুক্তি আছে। জোরালো যুক্তি। দুই দিকের পাল্লা যেখানে সমান সেখানে যুক্তির চেয়ে বলবান হয় বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসও বলতে পারেন। গান্ধীজী একজন ম্যান অভ ফেথ।"

"আমিও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যুক্তপ্রদেশে আমার আত্মীয়স্বজনের দশা ভেবে। আমার দশা তো দেখছেনই।" হায়দার বিলাপ করেন।

## ॥ আঠারো ॥

রায় বাহাদুর মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আসেন, সকালবেলা কখনো নয়। জানেন যে তখন মানস ব্যস্ত থাকে। সেদিন সকাল সাড়ে আটটায় তাঁকে আসতে দেখে মানস সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে ওঠে।

"শুনেছেন? খবরটা শুনেছেন?" রায় বাহাদুর ফ্যাকাশে মুখে বলেন।

"খবর। কী খবর!" মানস চমকে ওঠে।

"বোম্বাইয়ের খবর। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গ্রেপ্তার। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য গ্রেপ্তার, অন্যেরা ফেরার। সারা ভারত জুড়ে ধরপাকড়। কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীকে আরম্ভই করতে দেওয়া হলো না। আরম্ভের পূর্বেই ইতি। উদয়ের পূর্বেই অস্ত। বড়লাট গান্ধীজীর অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন।" রায় বাহাদুর বিচলিত।

মানস তো শুনে থ। তার বাক্‌স্ফূর্তি হয় না। আবেগে তার কণ্ঠরোধ হয়।

রায় বাহাদুর বলে যান, "গণ সত্যাগ্রহও তো একপ্রকার যুদ্ধ। একটা যুদ্ধের মাঝখানে তো আরেকটা যুদ্ধ বাধাতে দেওয়া যায় না। গণ সত্যাগ্রহ চলতে থাকলে যুদ্ধের কী হাল হতো? জওয়ানরা একাগ্র হয়ে লড়ত কী করে? যুদ্ধে হার হোক কোন্ ইংরেজ এটা চায়? ক'জন ভারতীয় একটা চায়? কাজেই বড়লাটকে আমি দোষ দিতে পারছিনে।"

মানস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। "আপনি কি বুঝতে পারছেন না যিনি স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে যাচ্ছিলেন তাঁকে তাঁর বক্তব্য বলতে না দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা হরণ করা কত বড়ো স্বেচ্ছাচারিতা? কে জানে শেষমুহূর্তে একটা সমঝোতাও হয়ে যেতে পারত। তা হলে আর গণ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হতো না।"

"আপনি, মশায়, ভিতরের লোক হয়েও ভিতরের খবর রাখেন না। পুলিশ সাহেবের মুখে শুনেছি গান্ধীজীকে মিস্টার চার্চিল উগাণ্ডায় চালান করতে চেয়েছিলেন। সেখানে না হলে এডেনে। বড়লাটই তাঁকে নিবৃত্ত করেন। জল ইতিমধ্যে অনেকদূর গড়িয়েছে, মিস্টার মল্লিক। বোম্বাই থেকে কোন্‌খানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জানিনে, কিন্তু যেখানেই হোক এদেশেই তিনি থাকছেন। তাঁকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে না। বড়লাট তাঁর বন্ধু। বন্ধুকে বন্ধু ভারত ছাড়তে দিলেন না। যদিও নিজে ভারত ছাড়ার নোটিশ পেয়েছিলেন।" রায় বাহাদুর কটাক্ষ করেন।

"আহা, সেটা তো আক্ষরিক অর্থে নয়।" মানস বুঝাতে চেষ্টা করে। তার প্রাণে অসহ্য বেদনা। বুকে শেল বিঁধেছে।

"দেখুন মল্লিক সাহেব, যারা বার্মা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা বাধ্য হলে ভারতও ছাড়তে পারে। বাধ্য করলে জাপান করবে, গান্ধীজী নয়। তার আগে ওরা গান্ধীকেই ভারতছাড়া করবে। খাঁচাছাড়াও করতে পারে, যদি গণ সত্যাগ্রহ হয় গণ হত্যাগ্রহ।" রায় বাহাদুর হুঁশিয়ারি দেন।

"সেটা কার দোষে? ওঁরা যদি অহিংসাবাদীর অহিংস অস্ত্র কেড়ে নেন তবে হিংসাবাদীর সহিংস অস্ত্রই তার একমাত্র বিকল্প। অহিংসাকে দুর্বল হতে দিলে হিংসাই প্রবল হয়।" মানস যুক্তি দেখায়।

"মল্লিক সাহেব, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এটা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্ব। গান্ধীজীর ইচ্ছা বনাম বড়লাটের ইচ্ছা। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সমঝোতা অসম্ভব।" রায় বাহাদুর উড়িয়ে দেন।

তিনি বসতে আসেননি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেন ও বিদায়ের জন্যে পা বাড়ান। মানস তাঁকে এগিয়ে দেয়।

"আপনি আমাকে আলটিমেটাম দেবেন আর আমি আপনাকে বন্ধুভাবে রিসিভ করব! তা হয় না, মিস্টার মল্লিক। আমি রাজপ্রতিনিধি। রাজা-স্থানীয়। আমারও তো প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে। আলটিমেটামটা অহিংসার মোড়কে মোড়া হলেও ওটা রাজশক্তিকে কুইট নোটিস। আপনি আমাকে কুইট নোটিস দিলে আমি কি আমার দরজা বন্ধ করতে পারিনে? গান্ধাজীকে সদলবলে গ্রেপ্তার করে বড়লাট যা করেছেন তাকে ইংরেজীতে বলে টেবিল ওলটানো। বড়লাট গান্ধীজীর উপর টেবিল উলটিয়েছেন। খুব খারাপ লাগছে ভাবতে। মনে করবেন না যে আমি একটুও খুশি। গান্ধাজীর একটা

কেস আছে। গত মহাযুদ্ধে ইংরেজকে তিনি জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন। স্বয়ং বড়লাট চেমসফোর্ড সভাস্থলে নিজের প্রস্তাব সমর্থনের জন্যে আর কাউকে না ডেকে গান্ধীজীকেই ডেকেছিলেন। সেটা সমর্থন করার মতো শিভালরি গান্ধীজীর ছিল। তিনি স্বরাজের শর্তে নয়, বিনা শর্তে যুদ্ধকালে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন। কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী। কোথায় স্বরাজ! তার বদলে রাউলাট অ্যাক্‌ট। সেই যে বেইমানী গান্ধীজী সেটা ভোলেননি। তাই এবারকার যুদ্ধে সহযোগিতা করছেন না। জানেন যে ইংরেজ এর পরিবর্তে স্বরাজ দেবে না। কাজ ফুরোলে পাজী বলবে। এবারকার ফরমুলা 'আগে তো তুমি স্বরাজ দাও, তার পর আমি তোমাকে আমার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমার সৈন্যদল নিয়ে লড়াই করতে দেব। কিন্তু আমার সৈন্যদের লড়তে দেব না।' আমার মতে গান্ধীজীর এটা বাড়াবাড়ি। আমাদের জওয়ানরা অহিংস নয়। তারা বলে, মারেঙ্গে অওর মরেঙ্গে। তাদেরকে লড়তে না দিলেই বরং তারা অসুখী হবে। লড়তে দিলে ওদের কেউ কেউ ভিক্‌টোরিয়া ক্রসপর্যন্ত অর্জন করবে। কতরকম মেডেল তো পাবেই। র‍্যাঙ্কও উচ্চতর হবে। এবার বহু ভারতীয়কে কমিশন দেওয়া হয়েছে। কিংস কমিশন। ভাইসরস কমিশন। মিলিটারি অফিসাররাও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। পুলিশ সাহেব পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধটা একটা গোয়িং কনসার্ন। তুমি যদি ক্ষমতাসীন হও তোমাকেও এই গোয়িং কনসার্নকে গোয়িং রাখতে হবে। যতদিন না একপক্ষ জেতে, অপরপক্ষ হারে বা খেলায় দুই পক্ষের ড্র হয়। আমার মনে হয় গান্ধীজীর ইচ্ছা নয় যে ভারতীয় সৈন্যরা জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে মারামারি করে।" রায় বাহাদুর দুই পক্ষের কেস বিশ্লেষণ করে রায় দেন। যেন তিনিই এ মামলার বিচারক।

মানস তাঁকে বিদায় দেয়। বলে, "আমার তো রেডিও নেই। আপনার কাছেই তরতাজা খবর জানতে চাইব। আমিই আসব।"

কিন্তু খবর কোথায় যে কেউ জানবে বা জানাবে? 'স্টেটসম্যান' ভিন্ন আর সব কাগজ বন্ধ। রেডিওতে সামান্যই বলে। মোটের উপর নিউজ ব্ল্যাক আউট। কংগ্রেস কী করছে, জাপান কী করছে কেউ জানতে চাইলে দেখে চারদিক অন্ধকার। মানসের মনে দারুণ উদ্বেগ। গান্ধীজী বেঁচে আছেন কি না কে জানে! তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের কোর্ট মার্শাল করা হচ্ছে, না

সাধারণ আদালতে হাজির করা হচ্ছে? না আদৌ বিচারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? তাঁরা বিনা বিচারে বন্দী? বিদেশের কাগজে ও রেডিওতে তাঁদের বিরুদ্ধে জোর অপপ্রচার চলেছে। যেন তাঁরা জাপানের পঞ্চম বাহিনী। অপবাদের বিরুদ্ধে তিনি অনশন করছেন না তো?

সংবাদের সন্ধানে মানস ও যুথিকা যায় সাংবাদিক শিরোমণি ভবতোষ বাবুর সকাশে। তিনি বিমর্ষভাবে বলেন, "আমিও অন্ধকারে। এমনতর নিউজ ব্ল্যাক-আউট আমি জীবনে দেখিনি। লিখব কী, যদি লেখার মালমশলা না থাকে? ভাবনায় পড়েছি। পুরোনো কথা মনে পড়ছে। ভাবছি তারই উল্লেখ করব। আপনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অকালে বিদায় নেবার চিন্তা করছেন, আপনার পূর্বসূরী অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অকালে অবসর নিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পত্তন করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হন সেকালের যত নামকরা ব্যারিস্টার বা অধ্যাপক বা অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বা জজ, ভারতভক্ত ইউরোপীয়, দেশভক্ত মুসলমান বা পার্শী। হিউম স্বয়ং ছিলেন সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারি। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল কম। তাঁদের সবাইকে তিনি ১৮৯২ সালে একখানি চিঠি লেখেন। সে চিঠির বয়ান এখনো আমার স্মরণ আছে। কারণ তার বিষয়বস্তু অবিস্মরণীয়। এখন দেখছি হিউম সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে।"

মানস কৌতূহল প্রকাশ করে। যুথিকাও। দু'জনেই উৎকর্ণ।

"তাঁরই ভাষার তর্জমা করে যতটা মনে আছে বলছি। সদস্যদের সম্বোধন করে তিনি লেখেন, আপনারা বিশেষত যাঁরা ধনী ও অবস্থাপন্ন, তাঁরা বুঝতে পারছেন যে বর্তমান শাসনব্যবস্থা কেবল যে দেশের চাহিদা পূরণের অনুপযোগী তাই নয়, এ ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে তৈরি করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভয়াবহ বিপর্যয়। এদেশের মানুষ খুবই ধৈর্যশীল, খুবই শান্তশিষ্ট। কিন্তু ফ্রান্সের মানুষও তো তাই ছিল ফ্রান্সের রাজা ও অভিজাতদের নিপাত করার মাত্র বিশ বছর—না, মাত্র দশ বছর—পূর্বেও। বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য শেষপর্যন্ত সেই ভেড়ার পালকে প্রায় রাতারাতি পরিণত করে একদল নেকড়েবাঘে। মনে করবেন না সরকার সেদিন আপনাদের অথবা নিজেকে বাঁচাতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হবার মতো হয়তো কোনো শত্রু পাওয়া যাবে না। কিন্তু রেলপথে বা সড়কে যাতায়াত অসম্ভব হবে, টেলিগ্রাফ থাকবে না, সাঁকো চুরমার হবে,

সরবরাহ বন্ধ হবে। হাজার হাজার দুষ্কৃতকারী হয়তো মারা যাবে, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? আর নেতা? সময় হলে কি নেতার অভাব হবে?' এসব কথা আমার নয়, তাঁর।" সম্পাদকপ্রবর স্মরণ করেন।

মানস যূথিকার দিকে চেয়ে বলে, "পঞ্চাশ বছর পরে প্রায় সবটাই মিলে যাচ্ছে। কী অসাধারণ দূরদৃষ্টি!"

ভবতোষবাবু বিষন্ন মুখে বলেন, "সেইসঙ্গে মনে পড়ছে মহামতি রাণাডের একটি উক্তি। এদেশে আমরা কোনো কাজই করতে পারব না, আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না, যদি না হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়। আজকের পরিস্থিতিতে হিন্দুর পাশে মুসলমান কোথায়? হয়তো দু'চার জায়গায় আছে। সেটা ব্যতিক্রম। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে এই বিপর্যয়ের বিসমিল্লায় গরমিল। এ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কংগ্রেস সেইসব অংশই পাবে, যেসব অংশে সে প্রবল। বাকীটা যাবে পাকিস্তানে। ইংরেজরা যদি যায়। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় কংগ্রেস তার নেতাকে মানেনি, অহিংস থাকেনি। তার আন্দোলন হিংসার দিকে বাঁক নিয়েছে। ইংরেজরা জানে কেমন করে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। জানে না শুধু অহিংসার সঙ্গে মোকাবলার উপায়।"

এর পরে যুদ্ধের কথা। চার্চিলের মতিগতি থেকে মালুম হয় তিনি বরং জাপানীকে ভারতে ঢুকতে দেবেন, তবু ভারতীয়দের হাতে ভারতকে ছেড়ে দেবেন না। জাপানীরা নিলে তাদের হাত থেকে পরে ফেরৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতীয়দের হাতে সম্প্রদান করলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

"কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু আরো একটা কথা আছে, সেটা না ইংরেজ না কংগ্রেস কেউ গণনার মধ্যে আনছেন না।" ভবতোষবাবু তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "চট্টগ্রামে বা মণিপুরে জাপানী ফৌজের সামনে দাঁড়াতে না পারলে ইংরেজ সৈন্য আরেকটা ডানকার্ক করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের আরো একটা অপশন আছে। তারা তাদের মাতৃভূমির রক্ষক। অন্তত তাদের অফিসারদের মধ্যে এ চেতনা জেগেছে। ভারতীয় ফৌজ জাপানীদের সঙ্গে সমানে লড়ে যাবে ও সফল হলে ইংরেজদের সঙ্গেও। মিউটিনির জন্যে আরো পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তখন কোথায় তোমার ইংরেজ আর কোথায় তোমার কংগ্রেস! ভারতীয় ফৌজের যিনি অধিনায়ক তিনিই হবেন দেশের সর্বময় কর্তা।"

মানস কখনো এ লাইনে চিন্তা করেনি। এ তো সাংঘাতিক কথা। ইংরেজও থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না, গান্ধীজীও থাকবেন না, কর্তা হয়ে বসবেন অচেনা অজানা এক সামরিক নেতা। দেশ শাসন করবে তাঁর মিলিটারি জাণ্টা। অবশ্য ইংরেজ যদি আরেকটা ডানকার্ক করে ও যেখানে খুশি পোড়ামাটি করে দেশের লোকের হাড় জ্বালায়।

"দ্য ব্যাটল অভ্ ইণ্ডিয়া উইল বি ফট অ্যাট চিটাগং অর মণিপুর।" সে ইংরেজীতে বলে। "কিন্তু ভারতীয়রা যদি বীরত্ব না দেখায় তবে ভারতরক্ষা তাদের কর্ম নয়। দেশ শাসনও তাদের অধিনায়কের সাধ্য নয়। সুতরাং আমাদের সেকেণ্ড লাইন অভ ডিফেন্স হবে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র বা ভিলেজ রেপাবলিক। অঞ্চলে অঞ্চলে জাতীয় সরকার। যার নির্দেশ গান্ধীজী দিয়ে গেছেন। প্রত্যেক নাগরিককেই ভাবতে হবে যে সে স্বাধীন। সে পরাধীনতামুক্ত। কোথায় ক'টা ট্রেন অচল করে দেওয়া গেল সেটা তার স্বাধীনতার পরিমাপক নয়। কোথায় ক'টা পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠল আর সচল হলো সেটাই পরিমাপক। স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা খুন জখম দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। করতে হয় গড়ার কাজ দিয়ে।"

"শুনছি তমলুকে না কোথায় যেন জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু কাজ কেমন করছে জানিনে।" ভবতোষবাবু বলেন, "বাঙালীর যা স্বভাব। দু'দিন পরেই শুরু হবে দলাদলি। ক্ষমতার লড়াই। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত এই আমাদের জাতীয় প্রকৃতি। ইংরেজ গেলেই বা জাপানী না এলেই যে আমরা দলাদলি বা ক্ষমতার লড়াই ছেড়ে মিলে মিশে কাজ করব আমি তো মনে করি এটা একটা সুখস্বপ্ন। তবে একজন ডিকটেটর যদি মাথায় চড়ে বসেন সেকথা আলাদা। সেটা জাতীয় স্বাধীনতা হতে পারে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়। তেমন রাজত্বে বাস করতে আমার রুচি হবে না। যে পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরা ইংরেজ আমলে পেয়েছি তার নজীর ভারতের ইতিহাসে নেই, বাংলার ইতিহাসেও না। সেটা যদি হারিয়ে যায় তো জাতীয় স্বাধীনতাও সে ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। চেয়ে দেখুন ইটালীর দিকে। ইটালীও পরাধীন দেশ ছিল। আমাদের যৌবনে আমরা মাৎসিনি, গারিবাল্‌দির ভক্ত ছিলুম। ইটালী তখন সদ্য স্বাধীন। কত আশা ছিল তার উপরে! সেই দেশ কিনা দেখতে দেখতে উপনিবেশের জন্যে পরের দেশ আক্রমণ করে। শেষে ফাসিস্ট বনে যায়। কে জানে কী আছে ভারতের কপালে।"

কলকাতা থেকে আসেন ভবতোষবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে তাঁর পুত্র পরিতোষবাবু। সঙ্গে একরাশ পত্র পত্রিকা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তথা বিদেশের। ফিরে যাবার সময় নিয়ে যান পিতার সম্পাদকীয় রচনা। পরিতোষ যেবার স্বয়ং আসতে পারেন না সেবার তাঁর স্ত্রীকে পাঠান। আরতি দেবীকে।

একদিন পরিতোষবাবু ও আরতি দেবী দু'জনেই এসে হাজির হন মানসের কুঠিতে। মানস একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, "এবার দেখছি আপনারা জোড়ে এসেছেন। ব্যাপার কী?"

"আমরা ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। জাপানী বোমার ভয় কেটে গেছে। জাপানীরা এখন ভারতীয়দের মিত্ররূপে পেতে চায়। মিত্র কে? যে আমার শত্রুর শত্রু। শত্রু কে? ইংরেজ। শত্রুর শত্রু কারা, যারা রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ স্টেশন দখল করেছে বা করতে গিয়ে গুলী খেয়েছে। যেখানে পেরেছে সেখানে প্যারারেল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছে। না, মিস্টার মল্লিক, কলকাতার উপর জাপানী বোমা আর পড়বে না। তা হলে বাবার এখানে পড়ে থাকার কী দরকার? আমরাই বা কতবার তাঁকে দেখতে আসব?" পরিতোষবাবু উত্তর দেন।

মানস শুনে দুঃখিত হয় যে ভাবতোষবাবুর সঙ্গ থেকে সে অচিরে বঞ্চিত হবে। "আপনার বাবা কি যেতে রাজী হয়েছেন?"

"না, মিস্টার মল্লিক। তাঁর একটা চেঞ্জের দরকার ছিল। এই শহরে আগেকার দিনে কলকাতার লোক চেঞ্জে আসত। আজকাল আর আসে না। তিনি স্বজনবৎসল ও স্বজেলাভক্ত। বাড়ীটাও পৈত্রিক সম্পত্তি। এখানে এসে তিনি তাঁর বাল্যকালে ফিরে গেছেন। খোলামেলায় চেঞ্জও হচ্ছে। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাস করেন না যে এই আন্দোলন বেশীদিন চলবে। এটা থেমে গেলে জাপান আবার বোমা ফেলবে। অতএব সাবধানের মার নেই।" পরিতোষ-বাবু হাসেন।

"আমরা তো এখনো অন্ধকারে রয়েছি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে তা জানবার একমাত্র মাধ্যম সরকারী রেডিও। কিংবা ইংরেজদের 'স্টেটসম্যান'। আপনারা কী করে অতটা নির্ভয় হলেন যে জাপানী বোমা আর কখনো পড়বে না? কলকাতা যখন গোরা সৈনিকে ভরে গেছে।" মানস প্রশ্ন করে।

পরিতোষবাবু একটু খাটো গলায় জবাব দেন, "অন্ধকারের ভিতর দিয়েও

আমরা অনেকদূর দেখতে পাচ্ছি। বিহারে এখন গর্ভনর বলতে কেউ নেই। যিনি আছেন তাঁর রাজত্ব পাটনা দানাপুরের বাইরে নয়। মেদিনীপুরের অভ্যন্তরেও ব্রিটিশ রাজত্ব বলে কিছু আছে নাকি? রামনগর থানায় এখন কংগ্রেস রাজত্ব। জাপানীরা কি এসব খবর রাখে না? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট ভারতীয় আছে। ওদের বিশ্বাস দেশকে স্বাধীন করতে হলে বিদেশীদের সাহায্য চাই! কংগ্রেসের একার সাধ্য নয়। কিন্তু কংগ্রেস আর কারো সাহায্য না নিয়ে একাকী যা করেছে তা সারা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের মাঝখানে বোলশেভিকরা যা করেছিল তা নিয়ে বই লেখা হয়েছে 'টেন ডেইজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড'। এই মহাযুদ্ধের মাঝখানে কংগ্রেস যা করেছে তা নিয়েও পরে হয়তো বই লেখা হবে, 'টোয়েন্টি ডেইজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের আক্ষেপ কেবল এই যে বড়লাট গান্ধীজীকে আরো তিন সপ্তাহ সময় দিলেন না। সেই তিন সপ্তাহে কংগ্রেসের প্রস্তুতি তিনগুণ ব্যাপক হতো। মহকুমাকে মহকুমা, জেলাকে জেলা জনতার দখলে আসত। বড়লাট সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই আর একটা দিনও সময় দিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এযাত্রা বর্তে গেল।"

"তা এখনো তো আন্দোলন থামেনি।" মানস যতদূর জানে।

"থামবেও না। যতদিন না লোকে দেখতে পায় যে রাশিয়া থেকে জার্মানরা হটছে, বার্মা থেকে জাপানীরা হটছে, রাশিয়ানরা এগোচ্ছে, ইংরেজরা এগোচ্ছে। তবে এই আন্দোলনের গতিবেগ কমে আসছে। যেমন ঝড়ের গতিবেগ। সেটা তো মানুষের হাতে নয়। তেমনি এটাও। গান্ধীজী নিমিত্তমাত্র। ইতিহাসের ইঙ্গিতে তিনি একটা স্টার্ট দিলেন। মহাদেব দেশাই হঠাৎ বন্দিশালায় মারা না গেলে গান্ধীজী বোধ হয় অনশন করতেন। তাতে আন্দোলনটা হয়তো তাঁর শাসন মানত। কিন্তু তাঁকে অনুমতি না দিলে তিনি সারথির মতো চালিয়ে যেতেন কী করে?" পরিতোষবাবু সুধান।

"অনশনের আমি পক্ষপাতী নই। কিন্তু তিনি যেমন মানুষ বিবেকের তাড়নায় তাঁকে অনশন করতেই হতো। যাতে কেউ না বলে যে তিনি হিংসার সমর্থন করেন। এই আন্দোলনকে অহিংস বলা শক্ত।" মানস কুণ্ঠিত।

"আরে, রেখে দিন আপনার অহিংসা! স্বাধীনতা আগে না অহিংসা

আগে? এতকাল পরে অহিংসার মোহ ভেঙেছে। আমার আফসোস কেবল এই যে আরো তিন সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়নি। নইলে দেখিয়ে দেওয়া যেত বিদেশী সরকার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জনশক্তিকে কেমন করে দাবিয়ে রাখে। শেকসপীয়ারের নাটকের রাজা হেনরির মতো আমারও ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, 'আ হর্স! আ হর্স! মাই কিংডম ফর আ হর্স!' একটি অশ্ব! একটি অশ্ব! আমার রাজ্যের পরিবর্তে একটি অশ্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব মারা না গেলেই তিনি যুদ্ধ জয় করতেন। তেমনি, তিনটি হপ্তা। তিনটি হপ্তা। আগস্ট মাসে আরো তিনটি হপ্তা সময় পেলেই আমরা সংগ্রামে জয়ী হতে পারতুম। সংগ্রাম অবশ্য বন্ধ হবে না। এতে জয় না হোক পরাজয়ও হবে না। যেটা হবে সেটা যেন ফুটবল খেলার ড্র।" পরিতোষবাবু মনে করেন।

"তাই যদি হয় তবে স্বাধীনতার জন্যে অহিংসা গেল, অথচ স্বাধীনতাও এল না। জগৎকে ভারত নতুন পথ দেখাতে পারল না। শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পথ। তবে এটা গণ সত্যাগ্রহ নয়। মহাত্মাজী এটার সিগনাল দেননি। এটা জনতার রোষের অভিব্যক্তি। নেতাদের ধরপাকড়ে রোষ।" মানস বিশ্বাস করে।

"কিন্তু এটাও তো মিথ্যা নয় যে আগে থেকে প্রস্তুতি চলছিল। সেটা গণ সত্যাগ্রহের না হোক, গণ সংগ্রামের।" পরিতোষবাবু তর্ক করেন।

আরতি দেবী এইবার মুখ খোলেন। "গণ সত্যাগ্রহের উপযুক্ত মানসিকতা ছিল না। গণ সংগ্রামের ছিল। সেটা যে সহিংস হবে কে না জানত? গান্ধীজী অবশ্য চিরকালই বলে এসেছেন যে একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং অহিংস। এটা সহিংস ও অহিংস মিশ্র সংগ্রাম। প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। বলে, "এটা তাঁর দু'বছর আগেকার ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বল্পকালীন বিরতির পর সমষ্টিগত আকারে পূর্বানুবৃত্তি। একই মোমেণ্টামের ক্রমান্বয়। শুধু এর অহিংস অংশটার জন্যেই তাঁকে দায়ী করা যায়, সহিংস অংশটার জন্যে নয়। সেটা যে কোনো গণ অভ্যুত্থানের অপরিহার্য পরিণতি।"

যূথিকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আরতি দেবীকে মুখ খুলতে দেখে সেও মুখ খোলে। "আচ্ছা, দিদি, আপনি কি বিনীতা সিন্হার নাম শুনেছেন? যাঁর স্বামী ছিলেন সিভিল সার্জন। যুদ্ধফেরৎ।"

আরতি দেবী টিপে টিপে হাসেন। "তার চেয়ে বলো না কেন, আপনি কি আপনার মামাতো ভাইয়ের খুড়শ্বশুরের মেয়ের নাম শুনেছেন? বিনীতা সিন্‌হা হবার আগে থেকেই তিনি আমার বিনু মাসী। আহা, বেচারির কী দুঃখ! জামাইটি মারা গেল বিলেতে পড়তে গিয়ে। মেয়েটা তখন থেকেই দিশেহারা। অমন অস্থিরপ্রকৃতির মেয়েকে নিয়ে বিনু মাসী নাজেহাল। সেদিন আমাদের বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করেন, জুলি এখানে আছে? আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। জুলি তো বছরে একবারও আমার খোঁজ নেয় না। হঠাৎ জুলি কেন আসবে ও থাকবে? তারপর থেকে যা শুনছি তা ভয়াবহ ব্যাপার। ওদের নাকি একটা গুপ্ত প্রেস আছে। যারা পাঁজি ছাপে তাদের প্রেস নয়। সেই চোরা প্রেস থেকে চোরা বুলেটিন ছেপে বা সাইক্লোস্টাইল করে ওরা সাহেবপাড়ার জমাদারদের দিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করায়। তাতে গোরা সৈন্যদের উদ্দেশ করে লেখা: কুইট ইণ্ডিয়া। গো হোম অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড ইয়োর ওন পীপল। তোমাদের লজ্জা করে না? পারলে তোমরা বেলজিয়ামকে রক্ষা করতে? ফ্রান্সকে বাঁচাতে? সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বার্মায় তোমাদের ভূমিকাটা কী? কেন তোমরা আমাদের অন্নে ভাগ বসাতে এসেছ? আমরা কি না খেয়ে মরব? তোমরাই এর জন্যে দায়ী হবে।—এমনি কত কথা।"

যূথিকা ভয় পেয়ে বলে, 'ধরা পড়লে আর রক্ষে আছে! সরাসরি কোর্ট মার্শাল। যুদ্ধকালে আইন আদালত ঠুঁটো জগন্নাথ।"

মানসের মনে লাগে। সে বলে, "হেবীয়াস কর্পাস এখনো উঠে যায়নি। তবে যুদ্ধকালে মিলিটারির গায়ে হাত দেওয়া অসম্ভব।"

আরতিদি যূথিকাকে বলেন, "বেচারি বিনু মাসী! মেয়ে তাঁকে ধরাছোঁয়া দেয় না। রোজ ঠিকানা বদল করে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে দিনের বেলা বোরকা পরে বেরোয়। উর্দুতে বাতচিৎ করে। যত সব এঁদো গলিতে বা বড়লোকের অন্দরমহলে ওদের আস্তানা। রাতের বেলা তো ব্ল্যাক আউট। তখন ওরা নির্ভয়ে ফর ফর করে ঘুরে বেড়ায়। অঙ্গে বিভিন্ন সাজ। মুখে বিভিন্ন বুলি। বহুরূপী আর হরবোলা। সিনেমায় ঢুকে প্রচারপত্র ফেলে আসে। জওয়ানদের উদ্দেশ করে লেখা, হিন্দীতে বা উর্দুতে: তোমাদের দেশ এখন একটা আগ্নেয়গিরি। লাভাবর্ষণ আসন্ন। জাপানীদের বোমাবর্ষণও এর কাছে কিছু নয়। ওদের গোলাবর্ষণও এর কাছে তুচ্ছ। তোমাদের লয়্যালটি

রাজার প্রতি নয়, জন্মভূমির প্রতি। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।—এসব প্রচারপত্র যদিও বেনামী তবু পুলিশ জানে কারা এসব ইস্যু করেছে। জুলির সন্ধানে ঘুরছে। যে-কোনো দিন গ্রেপ্তার করে কোথায় চালান দেবে কে জানে!"

যূথিকা শিউরে ওঠে। "কী সর্বনাশ!"

গান্ধীজীর 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' এখন কোন্ মাটির তলায় ঢুকেছে জানলে তিনি নির্ঘাত অনশন করতেন। কিন্তু তাঁকে তো কোনো কিছুই পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। শুনতে দেওয়া হচ্ছে না। স্বদেশবাসীর থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। উগাণ্ডায় বা এডেনে থাকলে আরো বেশী খবর পেতেন। আগা খান্ প্রাসাদ এক অন্ধকূপ।

খবরের কাগজ পনেরো ষোল দিন বন্ধ থাকার পর আবার খুলেছে। কিন্তু কড়া সেনসরশিপ। অধিকাংশ খবরই ধামা চাপা। সেইজন্যে কারা সব একটা গুপ্ত নিউজ সার্ভিস সৃষ্টি করেছে। ফ্রী ইণ্ডিয়া নিউজ সার্ভিস। গুপ্ত সংবাদপত্র প্রতি সপ্তাহেই বেরোয়। সাইক্লোস্টাইল করা। তাতে অনেক গোপনীয় সংবাদ থাকে। সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই। কয়েক সংখ্যা মানসের নামেও পাঠিয়েছে। চিঠির খামের ভিতরে। বাংলা ভাষায় লেখা।

মেদিনীপুরের এক থানায় জাতীয় পতাকা ওড়াতে গিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরা বলে এক মহিলা পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছেন। মরেছেন, তবু পতাকা ছাড়েননি। গ্রেপ্তার করলেই চলত। গুলী করার কী দরকার ছিল? মানস মনে মনে প্রশ্ন করে। তার নিজের জেলায় তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এই যা সান্ত্বনা।

"আমরা যথেষ্ট প্রিকশনস্ নিয়েছি, মল্লিক।" আলী হায়দার বলেন। "মেয়েদের উপর যাতে কিছুতেই কোনো অত্যাচার না হয়। পতাকা ওড়াতে চায় ওড়াক। আমরাই পরে নামিয়ে দেব। থানা দখল করে থানার কাজ চালানো কি মুখের কথা? পারবে ওরা দাগী অপরাধীদের চুরি ডাকাতী বন্ধ করতে? খুনের এজাহার লিখে নিতে। অকুস্থলে সুরতহাল করতে, লাশ মর্গে পাঠাতে? পুলিশ যদি সাতদিন অসহযোগ করে তো বাবুরা নিজেরাই আমার কাছে এসে নালিশ করবেন যে তাঁদের যথাসর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। মায় ঘরের বৌঝি!"

"রেঙ্গুনে যেমন হয়েছিল।" মানস মন্তব্য করে।

"কাগজওয়ালারা সে খবরটা চেপে যায়। লোকে ভাবে লড়াই একটা তামাশা। তার সঙ্গে লুটপাট নারীধর্ষণ ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি গণসংগ্রাম একটা তামাশা। তার সঙ্গে সমাজবিরোধী ক্রিমিনালদের কোনো সম্পর্ক নেই। জেল ভাঙার খবর শুনেছেন? আমাদের জেলায় নয়, যুক্ত প্রদেশের বলীয়া জেলায়। ট্রেজারি লুটের খবর শুনেছেন? সেটাও বলীয়া জেলায়। আমরা যদি প্রিকশনস্ না নিই সরকারী ট্রেজারি খালি হয়ে যাবে, মাসের শেষে আমরা কেউ মাইনে পাব না। জেল খালি হয়ে যাবে। ফেরারী কয়েদীরা ঘরে ঘরে হানা দেবে। পুলিশ যদি গুলী না চালায় তো নিরীহ নাগরিকের সর্বস্ব যাবে। যদি চালায় তো কেউ না কেউ মরবে। তখন যত দোষ আমার।" আলী হায়দার দুই কাঁধ তুলে বিমূঢ়ভাব প্রকাশ করেন।

মানসের জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না। আইন অমান্য করে মিছিল বেরোয়। তাতে মেয়েদেরই প্রাধান্য। "ভারত ছাড়ো" ইত্যাদি স্লোগানও দেওয়া হয়। পুলিশ তফাতে থাকে। ইংরেজ পুলিশ সাহেব ইচ্ছে করেই অদৃশ্য হন। নইলে জনতা হয়তো মারমুখো হবে। ফলে পুলিশও মারমুখো।

রায় উমাশঙ্কর সামন্ত বাহাদুর কিছুদিনের জন্যে পর্দার আড়ালে যান। শহরের ছেলেরা রাজভক্তদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ করে। তিনিই পরে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলেন, "ভয় নেই, আমরাই আপনাকে প্রোটেকশন দেব।"

সাহেব অট্টহাস্য করেন। বলেন, "আমরা যদি ভারত ছাড়ি তো আপনাদের প্রোটেকশন দেবে কে? উত্তরাধিকারী রেখে না গেলে সারা দেশ জুড়ে ওয়ার অভ্ সাকসেসন। দিল্লীর মসনদ নিয়ে আবার এক পানিপথের যুদ্ধ।"

## ॥ উনিশ ॥

জার্মান সেনা অতর্কিতে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে রুশদেশের বহু অঞ্চল অধিকার করলেও মস্কো এখনো দূর অস্ত্। লেনিনগ্রাড হাতের নাগালে এসেও নাগালের বাইরে। আর স্টালিনগ্রাডের লড়াই এই বাধে কি ওই

বাধে। ভল্‌গা নদীর তীরেই দু'পক্ষের ভাগ্য নির্ধারণ হতে যাচ্ছে। স্টালিনগ্রাডের পতন প্রকারান্তরে স্টালিনেরই পতন। স্টালিনগ্রাডের হার প্রকারান্তরে হিটলারেরই হার। এ খেলা চড়া স্টেক রেখে খেলা। সারা দুনিয়া উৎসুক বা উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ভল্‌গাতটের বলপরীক্ষার দিকে।

বাবলীর তো রাত্রে ঘুম নেই। সে স্বপনদার কাছে গিয়ে একটুখানি আশ্বাস আশা করে। "কী হবে, দাদা? আমরা কি হেরে যাব?"

স্বপনদা তাঁর হাতের কাজ তুলে রেখে বলেন, "আমরা হেরে যাব মানে? ও বুঝেছি। 'আমরা কমিউনিস্টরা'। কিন্তু খোদ স্টালিনই তো তাঁর দেশের সর্বজনের কাছে আবেদন করে জানিয়েছেন যে এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। জার আমলের মহাবীর সুভোরোভকে মার্কসের উপরে বসিয়েছেন। তবে এটাও ঠিক যে রাশিয়া হেরে গেলে তোমরাও হেরে যাবে।"

"সেইজন্যেই তো ভেবে আকুল হচ্ছি। তোমার কী মনে হয়? তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ। টুর্গেনিভের মতো দরদী।" বাবলী শুনতে উন্মুখ।

"রাশিয়া হারবে না। রাশিয়া হারতে পারে না। যুদ্ধ তো কেবল বাহুবলের পরীক্ষা নয়। সেইসঙ্গে আত্মিক শক্তিরও। রাশিয়াকে শক্তি জোগাচ্ছেন পুশকিন, লারমণ্টোভ, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, চেকভ, গোর্কি। সাহিত্যের মতো সঙ্গীতও অন্তরকে অনুপ্রাণিত করে। রাশিয়াকে প্রাণ জোগাচ্ছেন চাইকোভস্কি, রিমস্কি-কোরসাকোভ, মুসোর্গস্কি, বোরোডিন, গ্লিঙ্কা। এঁরা সবাই ছিলেন পেট্রিয়ট। পেট্রিয়টিক ওয়ার যদি লড়তে হয় তো এরাই লড়তে সাহায্য করবেন। এঁরা অমর। তোমাকে আজ আমি 'ভল্‌গা বোটম্যান' বাজিয়ে শোনাব। লোকসঙ্গীত। গেয়েছেন কে, জানো? শালিয়াপিন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" স্বপনদা উদ্দীপনা বোধ করেন। যেন কানে লেগে আছে তার রেশ।

"ভল্‌গা বোটম্যান? সত্যি?" বাবলীও উদ্দীপ্ত হয়। "শুনব। নিশ্চয় শুনব। ভল্‌গার তীরে স্টালিনগ্রাড। কী বিচিত্র যোগাযোগ! কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও, দাদা। জার্মানীতেও তো কত মহান সাহিত্যিক, মহান সঙ্গীতকার জন্মেছেন। তাঁদের প্রেরণা কি জার্মানদের জিতিয়ে দিতে পারবে না? গ্যেটে, শিলার, বাখ, বেঠোভেন?"

"আরো দশজনের নাম করতে পারতে। কিন্তু নাৎসীরা কি তাঁদের কারো মহিমা বোঝে? হাইনের মতো প্রেমের কবি বিশ্বসাহিত্যে ক'জন আছেন?

তিনি জাতে ইহুদী। তাই নাৎসীদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। যীশুখ্রীস্ট আর তাঁর দ্বাদশ শিষ্যও তো জাতে ইহুদী ছিলেন। তাঁরাও বাতিল। গোটা ইহুদী খ্রীস্টান ধারাটাই বাদ। তা হলে কি গ্রীক রোমান ধারা ওদের গ্রহণীয়? না, আর্য হলেও গ্রীক রোমানরাও বিজাতীয়। বাকী থাকে টিউটন ঐতিহ্য। সে ধারা কবে থেকে লুপ্ত। ভাগনার তাকে উদ্ধার করেছেন। সেটাই ওদের সর্বস্ব। সেইটুকু প্রেরণা পেয়ে রাশিয়ানদের বা ইংরেজদের হারিয়ে দেওয়া যায় না। নাৎসীরা ওদের আদিম ধারাকেই সার করেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রবাহ তো সেইখানেই থেমে থাকেনি। রাইন নদ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ডানিউব নদ দিয়েও। 'ব্লু ডানিউব ওয়ালটজ' কি ওই বেরসিকরা শুনবে? স্ট্রাউস যে ইহুদী। শুনলে তোমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে। তুমি নাচতে চাইবে। আমি যে তোমার সঙ্গে নাচতে পারব না, বোন চকোলেট।" স্বপনদা আফসোস করেন।

বাবলীর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে বলে, "ওটা বৌদির জন্যে তুলে রেখো। আমার জন্যে 'ভল্‌গা বোটম্যান'।"

বৌদির নাম করতে না করতেই বৌদি এসে হাজির। তাঁর আগে আগে তাঁর আদরের এল্‌ফ। সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাবলীর দিকে এগোয়। তার কোলে হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে।

"এই যে, বাবলী! কখন এলে? তোমাদের কমিউনের কী খবর?" দীপিকা বৌদি খোঁজ নেন।

"খবর খুব মুখরোচক নয়। কমিউনে ভাঙন ধরেছে। একটি কমরেডের বিয়ে হয়ে গেছে। সে আমাদের ছেড়ে তার বরের সঙ্গে ঘর করছে। এমনি করে যদি কমিউন খালি হয়ে যায় তো কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ কী?" বাবলী হাসে।

"তোমরা কি মনে করেছ তোমরাই কমিউনগঠনের পথিকৃৎ? সেই বৌদ্ধযুগ থেকেই ভারতে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে এসেছে। ইহুদীদের দেশে যীশুখ্রীস্টেরও আগে এসেনীদের কমিউন ছিল। খ্রীস্টানরা তাদের কাছ থেকে শেখে। দেখা গেল সারাজীবনের মতো সন্ন্যাসব্রত না নিলে কমিউন গঠন করা বৃথা। মার্ক্‌স মুনির শিষ্যরা তো সন্ন্যাসে বিশ্বাস করেন না। তা হলে তাঁদের কমিউন টিকবে কী করে? শ্রী অরবিন্দ এর একটা সমাধান বার করে-ছেন। ওঁর আশ্রমে বিবাহিত দম্পতীরাও বাস করছেন। কিন্তু কারো

কোনো সম্পত্তি নেই। সব সম্পত্তি আশ্রমের। দেখা যাক কত দিন টেকে। কেউ কেউ এর মধ্যেই পালিয়ে এসেছেন। পালিয়ে এসে বিষয় সম্পত্তি অর্জন করছেন। মেয়ের বিয়ের যাতে একটা কিনারা হয়। ছেলের পেশার ভাবনাও ভাবতে হবে। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী মাদার কি এসব জানেন না? তাঁকেই বার করতে হবে এর সমাধান। শ্রী অরবিন্দ এখন বহু ঊর্ধ্বে।" দীপিকা বৌদি মনে করেন।

"শ্রী অরবিন্দের কথা যখন উঠল তখন শোন," স্বপনদা বলেন, "পণ্ডিচেরী থেকে আমার বন্ধু মুকুল লিখেছে শ্রী অরবিন্দ প্রতিদিন রেডিও থেকে যুদ্ধের খবর শোনেন। বাহুবল ও মনোবলের মতো আরো একটা বল আছে, সেটা যোগবল। শ্রী অরবিন্দ তাঁর যোগবল প্রয়োগ করছেন রাশিয়া যাতে জয়ী হয়। এ যুদ্ধ অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভশক্তির যুদ্ধ। রাশিয়া যদিও কমিউনিস্ট তবু সেও ইংরেজ ফরাসীর মতো শুভশক্তির মিত্র। সুতরাং শুভশক্তির শরিক।"

"দাদা, তুমিও কি যোগবলে বিশ্বাস কর?" বাবলী বিস্মিত হয়ে সুধায়।

"না, বোন। মুকুলকে আমি লিখি, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। তুমি পণ্ডিচেরীতে বাস কর। পণ্ডিচেরী ফ্রান্সের অধীন। যোগবল প্রয়োগ করে শ্রী অরবিন্দ কেন ফ্রান্সকে ত্রাণ করলেন না? সে কেন নাৎসীদের অধীন হলো? ফলে পণ্ডিচেরী এখন অধীনের অধীন।" স্বপনদা সংশয় প্রকাশ করেন।

"সত্যিই তো!" দীপিকা বৌদি সায় দেন।

'ভল্‌গা বোটম্যান' বাজিয়ে শোনাবার পর স্বপনদা লক্ষ করেন চকোলেটের চোখে জল। সে বার বার চোখের জল মোছে আর হাসির ভান করে। বলে, "আরেকবার বাজাও।

তিনবার বাজানোর পর স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন, "বল, তোমার চোখে জল কেন? কী তোমার দুঃখ?"

"আমার হৃদয় এখন ভল্‌গা নদীর তীরে স্টালিনগ্রাডে। নেকড়েবাঘের দলকে আমরা কি রুখতে পারব? আমিও আমার সোল ফোর্স খাটাচ্ছি। যদিও ওটা গান্ধীবাদীর মতো কাজ। ওতে কোনো ফল হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ও ছাড়া আর কী আছে আমার? এত দূরে রয়েছি যে বোমা রিভলভার কোনো কাজে লাগবে না। তবে কি কেবল মাঠে মাঠে স্লোগান দিয়ে বেড়াব? আমরাও একহিসাবে নিষ্ক্রিয় দর্শক। যা হবার তা যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। জয় কিংবা পরাজয়। পরাজয় অভাবনীয়। রাশিয়ার আত্মা অপরাজেয়। চাই

শুধু আত্মার বিশ্বাস। সেটা কি আমাদের আছে?" বাবলী আত্মগত হয়ে বলে।

"তত্ত্বে নেই, কিন্তু সত্যে আছে।" স্বপনদা রহস্য করেন। "বাড়ীতে কেউ মরণাপন্ন হলে ডাক্তারকে ডাকা হয়, মা কালীকেও। রাশিয়ানরাও নিশ্চয়ই মা মেরীকেও ডাকছে। এটা তো রেভোলিউশনারি ওয়ার নয়, এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। এতে ননকমিউনিস্টরাও আছে। ওরা গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করছে নিশ্চয়।"

"কী জানি, দাদা!" বাবলী শোকোলায় চুমুক দিয়ে বলে, "আমার হৃদয় এখন পড়ে আছে ভল্‌গা নদীর তীরে। পাখী হয়ে থাকলে উড়ে যেতে পারতুম। মানুষ হয়ে শুধু রেডিওর খবর শুনছি।" শোকোলা হচ্ছে ফরাসীদের তরল চকোলেট।

দীপিকা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার মুখ খোলেন, "ওটা তো দূরের খবর। কাছের খবর কিছু শুনেছ?"

"কোন্ খবর, বৌদি?" বাবলী শশব্যস্ত হয়ে সুধায়।

"তোমার বান্ধবী জুলির খবর কী?" বৌদি জানতে চান।

"শুনেছি স্টেটসম্যান পত্রিকায় নাকি ছাপা হয়েছে সৌম্য চৌধুরীর সঙ্গে ওর বিয়ের এন্‌গেজমেণ্ট। সে তো অতি আনন্দের কথা। কিন্তু মেয়ে নাকি মায়ের উপর গোসা করে বাড়ী ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেছে। কে ওঁকে ফাঁস করতে বলেছিল? ছাপতে দিলেন যদি তো সাহেবদের কাগজে কেন? জানেন না ওরা এ দেশের শত্রু? বামপন্থীদের কাছে ও মুখ দেখাবে কী করে? তাই কোথায় উধাও হয়ে গেছে। ওর মা একদিন আমাদের কমিউনে এসে খানাতল্লাসী করেন। ওঁর ধারণা আমিই আমার সখীকে লুকিয়ে রেখেছি। আমি ওঁর পায়ে পড়ে বলি, মাসিমা, আপনি কি জানেন না ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? আমি এখন ওর চোখে দুশমন। আমি নাকি ইংরেজের গুপ্তচর। আমার অপরাধ আমি বলেছি, আগে তো জাপানীদের তাড়াও, তার পরে ইংরেজদের তাড়াবে। তোজো ফার্স্ট। ও বলেছে, না, আগে ইংরেজদের তাড়াতে হবে, তার পরে জাপানীদের। চার্চিল ফার্স্ট। তোজো ফার্স্ট, চার্চিল ফার্স্ট, তোজো ফার্স্ট, চার্চিল ফার্স্ট, বিশ একুশবার এইরকম কথাকাটাকাটির পর ও আমার চুলের মুঠি ধরে, আমিও ওর চুলের মুঠি ধরি। এরপরে কি আমাদের মুখ দেখাদেখি হতে পারে? ও কেন আমাদের

কমিউনে আসবে? অন্য কোথাও গেছে। হয়তো ওর ভাবী বরের কাছে। উনি বলেন, সৌম্যকে উনি টেলিগ্রাম করে জবাব পেয়েছেন. সৌম্যও নিখোঁজ। তা হলে গেল কোথায়? একে একে প্রত্যেকটি বন্ধুর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করেছেন। আমি তোমাদের এখানেও খোঁজ নিতে বলেছি। উনি কি এসেছিলেন?"

"এসেছিলেন বইকি। কিন্তু আমরাও তো অন্ধকারে। তা না হলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতুম কেন? মিসেস সিন্‌হা বুঝতে পারছেন না স্টেটস-ম্যানে নোটিশ ছাপিয়ে তিনি এমন কী অপকর্ম করেছেন যার নজীর নেই? ওঁদের বাড়ীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নোটিস তো ওই কাগজেই ছাপা হয়ে থাকে। জুলির আগের বারের বিয়ের নোটিসও তো ছাপা হয়েছিল ওই কাগজেই। ওর বাবার মৃত্যুর নোটিসও। তাঁর জামাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে। যদি কোনো অঘটন ঘটে থাকে। পুলিশ অফিসার নাকি মুচকি হেসে বলেছেন, অঘটনটা আর কিছু নয়। সামনে আসছে গান্ধীজীর গণ সত্যাগ্রহ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে গ্রীন সিগনাল দিয়েছে। এবার দেবে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি। ওঁরা বম্বেতে মীটিং ডেকেছেন। কে জানে জুলি হয়তো বম্বেতে গিয়ে ওর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে মিশে প্রোগ্রাম ছকছে। নোটিসের জন্যে গোসা করে মাকে ধোঁকা দিয়েছে। উনি বম্বেতেও ওঁর চেনাজানা সবাইকে চিঠি লিখেছেন। উত্তর আসার সময় হয়নি। আমরাও দারুণ চিন্তিত।" বৌদির মুখে উদ্বেগ।

স্বপনদা হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, "ক্যারামেল ওর মাকে ধোঁকা দিতে পারে কখনো? ও কি তেমনি মেয়ে? ও এই কলকাতা শহরেই আছে। পুলিশও যে না জানে তা নয়। অন্তত পুলিশের একটা সেকশন। ওদের এখন হ্যামলেটের মতো দোটানা। ধরবে কি ধরবে না? বাঁধবে কি বাঁধবে না? কে জানে যদি গণেশ ওলটায়। তখন ওই জুলিরাই তো মালিক হবে? চাকরি রাখতে হলে জুলিদেরই তোয়াজ করতে হবে। পুলিশের লোক ধরতে এলে পুলিশের লোকই আগে ভাগে হুঁশিয়ার করে দেবে। পাখী উড়ে যাবে। না, ভল্‌গা নদীর তীরে নয়। ভারতের ভাগ্য সেখানে নির্ধারিত হচ্ছে না। হচ্ছে গঙ্গানদীর তীরে, পঞ্চনদের তীরে, কাবেরী নদীর তীরে। আমি দুই নাটকেরই নীরব দর্শক। আমার সহানুভূতি আমার দুই বোনেরই দিকে। চকোলেটেরও দিকে, ক্যারামেলেরও দিকে। ওরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়।

ওটা ওদের ভুল বোঝাবুঝির ফল। আমি তো ওদের মেলাবার চেষ্টাই করেছি। সুযোগ পেলে আবার করব।"

বাবলী সভয়ে বলে, "দাদা, এটা কি কখনো সম্ভব যে ক্ষমতা কিছুদিন বাদে জুলিদের হাতে পড়বে?"

"আজকের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এটাও সম্ভব, সেটাও সম্ভব, ওটাও সম্ভব। কোনোটাই অসম্ভব নয়। এই কথাই গান্ধীজী তাঁর প্রবন্ধে লিখে-ছেন। তবে যেটা সম্ভবপর সেটা হচ্ছে তৃতীয়পক্ষ বিদায় হলে হিন্দু মুসলমানের মিতালি, কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। আমার মতে এ রকম একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। সমস্তক্ষণ মিতালির প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। সেই বুনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠতে পারে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। নইলে সেটাও হবে একটা তাসের কেল্লা। ব্রিটিশরাজের পতনের পর হিন্দু মুসলিম রাজেরও পতন হবে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এটাও তো একটা মহাদেশ। প্রাদেশিকতাই আমাদের পক্ষে স্বাদেশিকতা।" স্বপনদা রায় দেন।

বৌদি এবার দাদার দিকে ফিরে বলেন, "তোমার সোনার বাংলা তো এখন একটা হার্টব্রেক হাউস। এটা কি একটা সুখী পরিবার। ইংরেজ আছে বলেই ঠাট বজায় আছে। সে যেদিন যাবে সেদিন হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি নয়, ওই বাবলী জুলির মতো চুলোচুলি। পারবে কি তুমি ওদের চকোলেট আর ক্যারামেল দিয়ে ভাব করাতে? আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। তা বলে আমি বলব না যে ইংরেজ আরো পনেরো বছর রাজত্ব করুক। বা জাপানীরা এসে চামর ধরুক। যা আজও হলো না তা পনেরো বছর বাদেও হবে না। কারণ বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হৃদয় এক নয়। ওদের সম্পর্কটা হচ্ছে একই কালে প্রেমের আর ঘৃণার। ইংরেজীতে যাকে বলে লাভ-হেট রিলেশনশিপ। তুমি আমি হাজার চেষ্টা করেও এটাকে বিশুদ্ধ প্রেমের সম্পর্কে পরিণত করতে পারব না। আমাদের প্রিয় বন্ধু মীর সাহেবও না। পনেরো বছরের চেষ্টাও যথেষ্ট নয়। আমাদের জীবন যত দীর্ঘ হোক না কেন আমাদের জীবনেও নয়। ইংরেজরা ভেদবুদ্ধির বীজ বুনেছে বলে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো বৃথা। বিষবৃক্ষ ছেদ করার সাধ্য আমাদেরও নেই। গোড়ায় আমাদেরও হাত ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহনকে কেউ আমল দেন নি। তিনি নাকি

যবন পরিবৃত হয়ে থাকতেন। হিন্দু কলেজে কোনো মুসলমান ছাত্রকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হিন্দুকলেজ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন ইংরেজদের সে প্রস্তাবে হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েকজন প্রতিনিধি বাধা দেন। তবে সকলে নয়। তার থেকে প্রমাণ হয় প্রেমও সক্রিয় ছিল। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে হিন্দু ন্যাশনালিজম মুসলমানদের দূরে ঠেলেছে আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম তাদের কাছে টেনেছে। তার জের এখনো চলেছে। মাঝখানে উদ্ভব হয়েছে যার, তার নাম বেঙ্গলী ন্যাশনালিজম। ইংরেজ এতে বাদ সেধেছে। ইংরেজকে এরা হাতে মেরেছে, ভাতে মেরেছে। কিন্তু ইংরেজও এর মাজা ভেঙে দিয়েছে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে। সেদিন যে সর্বনাশটা হলো সেটা বাঙালীমাত্রেরই। শুধু হিন্দুর বা শুধু মুসলমানের নয়। তখনি বোঝা গেল বাঙালীর যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তার কারণ সারা ভারতের রাজস্ব এসে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে ভারতের রাজধানী আর কখনো পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হয়নি। হবেও না। ইতিহাসে ওটি একটি অদ্বিতীয় অধ্যায়। বাঙালীর যদি দূরদৃষ্টি থাকত তা হলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে সে আন্দোলনে নামত না। বেঙ্গলী ন্যাশনালিজমই দ্বিধাবিভক্ত প্রদেশের মেলবন্ধন করত। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা ভারতের রাজধানী হারিয়েছি। তা বলে আমরা প্রাদেশিকতাকেই স্বাদেশিকতা ভাবব কোন্ বুদ্ধিতে? এটা সেদিনের সেই স্বদেশী আমলের রোমন্থন। সে আমল আর কখনো ফিরবে না। ইংরেজ বিদায় হলেও না। এখনকার ভাবনা হলো ভারতীয় স্বাদেশিকতাকে ভারতীয় মুসলমানের গ্রহণ-যোগ্য করা! বাঙালী মুসলমানকে ভারতীয় মুসলমানের আওতার মধ্যে রাখা। পাকিস্তানের বীজ বুনে মুসলিম লীগ যা করেছে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করেছিল তার চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। এর থেকে যে বিষবৃক্ষ গজাবে তা মুসলমানদেরও কম ক্ষতি করবে না। ওরা এখন স্বপ্ন দেখছে কলকাতা হবে পাকিস্তানের সামিল। এই নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ না বাধে।"

স্বপনদা অভয় দিয়ে বলেন, "গৃহযুদ্ধ পাঞ্জাবে বাধতে পারে। কিন্তু বাংলা-দেশে কখনো নয়। এখানে ঘৃণার চেয়ে প্রেমই প্রবল।"

বৌদি কী বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বেল বেজে ওঠে। বাবলীর কোল থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় এল্ফ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ। যত বড়ো কুকুর নয় তত বড়ো গলা।

"আমি চানু লাহিড়ী। বাবলী সেন কি এ বাড়ীতে এসেছে? ওকে একটা জরুরি খবর দিতে চাই।" আগন্তুক দীপিকা বৌদিকে জানায়।

"চলুন, ভিতরে চলুন। বাবলী এই বাড়ীতেই আছে।" বৌদি ওকে দোতালায় নিয়ে যান।

"ও কে, চানু? কী ব্যাপার? 'ভল্‌গা বোটম্যান' শুনতে শুনতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে।" বাবলী ওর বন্ধুর পরিচয় দেয়।

"তোমাকে আমি কোথায় না খুঁজেছি? শোন, লণ্ডন থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে, স্টালিনগ্রাড—"বলতে বলতে চানু ভেঙে পড়ে।

"বল, বল, বাকীটুকু বল। ঝুলিয়ে রেখো না।" বাবলী উৎকণ্ঠিত।

"ইনভেডেড।" চানু দুই হাতে মুখ ঢাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবলী। "তাই বল। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। নাৎসীদের আমরা ফিরে যেতে দেব না। ওখানেই কবর দেব। যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।"

"মোগল তো নয়, হায়েনা। যাক, আজ আমাদের জরুরি বৈঠক বসছে। তোমার থাকা দরকার। গান শোনবার সময় এটা নয়। কর্তব্য স্থির করার সময়। ওরা ওদিকে প্রাণ দিচ্ছে, আর আমরা এদিকে গান শুনছি!" চানু টিটকারী দেয়।

স্বপনদা যা খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন তা তৈরি হয়ে আসে। গরম গরম বেগুনী, ফুলুরী, পেঁয়াজী। তার সঙ্গে জিলিপী। বাবলীর খিদে পেয়েছিল। সে বিনা বাক্যে খায়। চানুকে অনুরোধ উপরোধ করতে হয়।

"তা একটু দেরি হয়ে গেলে 'ডাস কাপিটাল' অশুদ্ধ হবে না, কমরেড লাহিড়ী। খান আর খেতে দিন। লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ।" স্বপনদা বলেন।

"ওদিকে ওরা লড়ে মরছে আর এদিকে আমরা খেয়ে বাঁচছি। এর পরে কে আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবে?" চানু খেতে খেতে বলে। আর বলতে বলতে খায়।

"ওরা বলছ কেন? বল আমরা।" বাবলী শুধরে দেয়। "আমরাই লড়ছি স্টালিনগ্রাডে হায়েনাদের সঙ্গে। ওরা বলতে বোঝায় নাৎসীরা।"

থিয়োরেটিসিয়ান চানু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু ও বেচারা সত্যি ঘাবড়ে গেছে। ওর ধারণা ছিল নাৎসীরা অতদূর এগোতে পারবে না, মাঝপথে আটকা পড়বে। স্টালিনগ্রাড! এ যে প্রেস্টিজের ইস্যু। এখানে হার হলে স্টালিনের প্রেস্টিজ!

কোথায় থাকবে? কিন্তু তার বদলে জয়ের জন্যে প্রস্তুতি কোথায়? যুদ্ধবিগ্রহ তো থিয়োরি অনুসারে চলে না। ইতিমধ্যেই ক্লাস ওয়ারকে পীপলস ওয়ার করতে হয়েছে। বুর্জোয়ারাও এখন পীপলের সামিল। তার উপর এটা পেট্রিয়টিক ওয়ার। রাশিয়ানদের পক্ষে। কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষে এটাকে পেট্রিয়টিক ওয়ার বলে চালানো যায় কী করে?" এ নিয়ে চানু চিন্তান্বিত।

স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "চকোলেট আর চানু, তোমাদের বেদনা আমারও বেদনা। হাজার হাজার যুবা ঘরবাড়ী ছেড়ে, বাপ মা ভাই বোন বৌ বা বান্ধবী ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে মর্তভূমি ছেড়ে কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হতে যাচ্ছে ভাবতে গেলে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। মুখে খাবার রোচে না। আবার এমনি স্ববিরোধ যে ওরা যদি জান বাঁচানোর বা শহর বাঁচানোর জন্যে রণছোড় হয় তা হলেও খাবার বিস্বাদ লাগে। ওদের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ভালো জিনিস নয়, আবার 'চাচা, আপনা বাঁচা' ও ভালো জিনিস নয়। তবে আমার নীতি হচ্ছে সৃষ্টির জন্যে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। যেমন চাষী আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে সবাইকে খাদ্য জোগানোর জন্যে। সে যেমন কাপুরুষ নয় আমিও তেমনি কাপুরুষ নই।"

'আমরা কি বলেছি আপনি কাপুরুষ?" চানু প্রতিবাদ করে।

"না, না, তোমরা বলনি। কিন্তু কথাটা উঠেছে। তাই আমি সাফাই দিয়ে রাখছি। তারপর শোন। তোমরা যাদের নেকড়ে বা হায়েনা বলছ তারাও তোমাদেরি মতো মানুষ। তাদেরও মা আছে বোন আছে বান্ধবী আছে। তাদের দিকটাও আমাকে দেখতে হয়। আমি একদেশদর্শী নই। বহুদেশদর্শী। জার্মানীতে আমি আমার যৌবনের দুটি বছর কাটিয়েছি। জার্মানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। ওদের সবাই কিছু নাৎসী নয়। অনেকেই কমিউনিস্ট। আরো অনেকে সোশিয়াল ডেমোক্রাট। হিটলারের দাপটে ওদেশের চানু আর বাবলীরাও আত্মরক্ষার জন্যে হয় পালিয়েছে, নয় ভোল বদল করেছে। এখানেও তাই হবে, যদি জাপানীরা কর্তা হয়ে বসে। তোমরা হয়তো পালাবে, কিন্তু থেকেও যাবে তোমাদের বিস্তর সাথী, তারা কোর্তা বদলাবে। নয়তো মরবে। সেটা ক'জন পছন্দ করবে, বল? তা বলে কি তারা কাপুরুষ? না, কাপুরুষ নয়। সাহস ফিরে পেলে তারাও প্রতিরোধের পন্থা খুঁজবে। যেমন ফ্রান্সে এখন কতক লোক রেজিস্টান্স গড়ে তুলছে।" স্বপনদা তন্ময় হয়ে বলে যান।

"শুনেছি, দাদা।" বাবলী সমর্থন করে।

"চিনি আমি ওদের দু'চারজনকে। কেউ কমিউনিস্ট, কেউ-বা তা নয়। দেশ যেখানে পরাধীন সেখানে দেশপ্রেমও মানুষকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে। হোক না সে উচ্চ মধ্যবিত্ত। এই যেমন আমাদের গান্ধী, জবাহরলাল। এঁরাও প্রতিরোধ করতে যাচ্ছেন। আপাতত ব্রিটিশ অকুপেশন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। অতঃপর প্রয়োজন হলে জাপানীজ কুইজলিং গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। এঁদের দিক্‌টাও আমি দেখি। তবে আপনাকে সরিয়ে রাখি, যাতে বাইরে থেকে ভালো দেখতে পাই। জড়িয়ে পড়লে তো সেটা সম্ভব হবে না। তোমরা এখন রুশ জার্মান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছ, নইলে দেখতে জার্মান পক্ষেও কমিউনিস্ট ও সোশিয়াল ডেমোক্রাটরাও লডছে, লড়তে বাধ্য হচ্ছে। হিটলার সবাইকে কন্সক্রিপ্ট করেছে। যারা নারাজ তাদের গুলী করে মেরেছে। আইন আদালতের তোয়াক্কা রাখেনি। জার্মান শিবিরেও তোমরা আছো। তোমাদের কমরেডরা আছে। তাদের জন্যেও চোখের জল ফেলতে ভুলো না। তারা নেকড়েও নয়, হায়েনাও নয়, তারা অবস্থাচক্রে বিপরীত শিবিরে অবস্থিত। তাদের জন্যে আমিও সমবেদনা অনুভব করি। তবে এটাও জানি যে তারা জিতবে না। এ যুদ্ধে হিটলারের হার হবে। রুশদেশ আক্রমণ করে নেপোলিয়নও পার পাননি। হিটলার তো কোন্ ছার! রাশিয়া এমন এক দেশ যা মহাদেশতুল্য। পিছু হটে যাওয়াটা হেরে যাওয়া নয়। রুশ ফৌজ বার বার পিছু হটবে, কিন্তু কখনো কোণঠাসা হবে না। পাল্টা আক্রমণ করবে ও জয়ী হবে।' স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বাবলী তা শুনে বেজায় খুশি। "এক কথায় স্পেস আমাদের পক্ষে, টাইম আমাদের পক্ষে। ওদের বিপক্ষে।"

"তার উপর ব্রিটেন তোমাদের পক্ষে, আমেরিকা তোমাদের পক্ষে। কিন্তু একটা ফ্যাকড়া আছে। তোমরা কারা? তোমরা কি রাশিয়ান না ইণ্ডিয়ান? কাল যদি ট্রাঙ্ককল আসে 'চিটাগং ইনভেডেড' তোমরা কোন্ পক্ষে ঝাঁপ দেবে? ব্রিটিশ পক্ষে, তার মানে ইণ্ডিয়ান পক্ষে, না জাপানী পক্ষে?" স্বপনদা সুধান।

বাবলী ধাঁ করে জবাব দেয়, "অবশ্যই ইণ্ডিয়ান পক্ষে।"

"এইবার পথে এস।" স্বপনদা হেসে বলেন. "জাপান তো রাশিয়ার বিপক্ষে লড়ছে না, রাশিয়াও লড়ছে না জাপানের বিপক্ষে। কিন্তু তোমরা

কমিউনিস্টার যদি জাপানের বিপক্ষে রাইফেল হাতে নিয়ে চাটগাঁ যাও আর জাপানী বধ কর তা হলে জাপান কি তোমাদের কমিউনিস্ট বলে চিনতে পারবে না? তোমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার কাছে নালিশ করবে না? তার ফলে তোমরা কি মস্কো থেকে লণ্ডন হয়ে নির্দেশ পাবে না, রাইফেল নামাও, কোলাকুলি করো? নয়তো জাপান প্রতিশোধ নেবে ভ্লাডিভস্টক আক্রমণ করে। ট্রাঙ্ককল আসবে, ভ্লাডিভস্টক ইনভেডেড। তখন তোমাদের ইণ্ডিয়ান মুখোশটি খসে পড়বে, রাশিয়ান স্বরূপটি বেরিয়ে পড়বে। বুঝলে, চকোলেট, ব্যাপারটা অত সরল নয়। তোমার মতো সরলা অবলার রাইফেল না ধরাই ভালো। কমিউন ছাড়ো, বিয়ে করো।"

বাবলী চানুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। তখন চানু তাকে একটা দাবড়ি দিয়ে বলে, "তুমি তো থিয়োরেটিয়ান নও, তুমি এসব কুটিল প্রশ্নের জবাব দিতে যাও কেন? তোমার বলা উচিত ছিল, পার্টির সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দেব। আর পার্টি পরামর্শ করত লণ্ডনের পার্টির সঙ্গে, লণ্ডনের পার্টি মস্কোর পার্টির সঙ্গে। শেষপর্যন্ত কী নির্দেশ আসত জানিনে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত সোভিয়েট ইউনিয়নকে একই কালে স্টালিনগ্রাড আর ভ্লাডিভস্টক দুই জায়গায় লড়তে বাধ্য না করা। জাপানকে ভ্লাডি-ভস্টকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচনা না দেওয়া। অতএব চট্টগ্রাম থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকা।"

"চমৎকার!" বৌদি বলে ওঠেন, "এ ছেলে অনেকদূর যাবে, অনেক উচ্চে উঠবে। এর হাতে গভর্নমেণ্ট পড়লে আর একটা ব্রেস্ট্-লিটোভ্স্ক। এবার আধখানা বাংলাদেশ ছেড়ে দিয়ে।"

"কেন, আপনাদের শাস্ত্রেই তো লিখেছে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। লেনিনের অপরাধ কী? পরে তো তিনি ছেড়ে দেওয়া জায়গা ফেরৎ পেয়েছিলেন। জার্মানীর পরাজয়ের পরে। জাপান কি আখেরে হারবে না, বৌদি? স্বপনদা কী বলেন?" চানু বাবলীর মতো 'দাদা' ও 'বৌদি' পাতায়।

বৌদি গলে গিয়ে ওদের ডিনারের নিমন্ত্রণ জানান। সেইদিনই। কিন্তু ওদের তাড়া ছিল। পার্টি অফিসে জরুরি বৈঠক। ডিনার আরেকদিন হবে। আগে তো ভালো খবর আসুক। তারপরে ভালো খাবার।

"জুলির জন্যে মনটা কেমন করছে, বৌদি।" বাবলী বলে তাঁর হাতে হাত রেখে। "যেখানেই থাকুক সে বেঁচে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত হব।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মরেঙ্গে তো বিয়ের এনগেজমেণ্ট করে লাভ কী হলো? গান্ধীজী যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছেন তাতে ঝাঁপ দিলে করেঙ্গের চেয়ে মরেঙ্গের সম্ভাবনাই বেশী।"

স্বপনদা ফোড়ন কাটেন, "শাদী করেঙ্গের সম্ভাবনাও কম নয়।"

## ॥ বিশ ॥

স্টালিনগ্রাডে তখন ঘোরতর সংগ্রাম চলেছে। হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফাইট। রাস্তায় রাস্তায়। কে জিতবে, কে হারবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। মুকুলদা পণ্ডিচেরী থেকে স্বপনদাকে জানিয়েছেন যে শ্রী অরবিন্দ দু'বেলা রেডিও খুলে খবর শুনছেন। যুদ্ধের ধারাবিবরণী।

স্বপনদার মনে পড়ে যায় একটা ইংরেজী ছড়া। দীপিকাদিকে শোনান।

"See-saw,
Margery Daw !"

দীপিকাদি সুধান, "হঠাৎ তোমার তক্তা খেলার শখ হলো কেন? আমি কি মার্জরি ড? আমি একবার উঠব, একবার নামব। তুমি একবার নামবে, একবার উঠবে? তেমন খেলার কি শেষ আছে?"

"আরে, সেই কথাই তো আমি বোঝাতে চাইছি। একবার জার্মানরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ানদের, একবার রাশিয়ানরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জার্মানদের। এ খেলার শেষ কোথায়? আমার চিত্তও তেমনি দোলনায় চেপে দুলছে। রাশিয়ানরা সমাজে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে, তারা হেরে যাক এটা আমার কাম্য নয়। আবার জার্মানরা কত দিক দিয়ে অসামান্য। ওরা হেরে গেলেও আমি দুঃখ পাব। তা হলে কি ওরা দুই পক্ষই জিতবে? তা কী করে সম্ভব? এমন কোনো সমাধান কি হয় না যাতে দু'পক্ষেরই মান রক্ষা হয়, প্রাণ রক্ষা হয়, স্বার্থ রক্ষা হয়? মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটমাট করতে পারে এমন কি কেউ নেই? ভারত যদি স্বাধীন হয়ে থাকত গান্ধীজীই হয়তো সেটা পারতেন।" স্বপনদা মনে করেন।

"আগে তো ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে জয় হোক। আপনি খেতে

পায় না শঙ্করাকে ডাকে। বাইরের জগতে কে মানে গান্ধীজীকে? নিজের দেশেই তাঁর ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে ক'জন? আর-সব প্রদেশের খবর রাখিনে, এই বাংলাদেশে মেদিনীপুর ছাড়া আর কোন্ জেলা সাড়া দিয়েছে? সাড়া বলতে আমি বুঝি জনগণের সাড়া।" দীপিকাদি কেমন যেন নিরাশ।

এমন সময় এল্‌ফ লাফ দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে। তারপর চুপ করে ফিরে আসে। পেছনে বাবলী।

"এই যে, চকোলেট।" স্বপনদা আদর করে পাশে বসান। "তারপর কী খবর? কাগজে আর কতটুকু লেখে, রেডিওতে কতটুকু শোনায়?"

বাবলী কাতর কণ্ঠে বলে, "জুলিরা আমার পিঠে ছোরা মেরেছে, দাদা, বৌদি। স্টালিনগ্রাডে আমরা জিতব কী করে?"

"ও: সেইজন্যে তুমি এতদিন দর্শন দাওনি। হাসপাতালে ছিলে। তা একটা খবর দিতে হয়। গিয়ে দেখে আসতুম।" স্বপনদা রঙ্গ করেন।

"না, না, তামাশা নয়, দাদা। বিষম সীরিয়াস ব্যাপার। কংগ্রেস যদি সত্যি সত্যি ইংরেজকে ভারতছাড়া করে তবে সে কি রাশিয়ার এই দারুণ দুর্দিনে মদত দিতে পারবে? মদত না পেলে রাশিয়া কি একহাতে লড়ে হারানো এলাকা উদ্ধার করতে পারবে? আবার সেই ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্ক! না, না, আমাদের জায়গা আমরা হাতছাড়া করব না। করলে আমাদের বিপ্লব ব্যর্থ হবে। ওখানে ব্যর্থ হওয়া মানে এখানেও ব্যর্থ হওয়া। কংগ্রেসই এর জন্যে দায়ী হবে, যদি এই আন্দোলন সফল হয়।" বাবলী নালিশ করে।

"কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! ইংরেজরা বলছে কংগ্রেসওয়ালারা ওদের পিঠে ছোরা মেরেছে। তোমরাও বলছ ওরা তোমাদের পিঠে ছোরা মেরেছে। ওরা যদি সফল হয় তা হলে শুধু যে ইংরেজরা ভারতছাড়া হবে তা নয়, তোমরাও দেশছাড়া হবে। যদি দেশটা তোমাদের হয়ে থাকে। তোমাদের কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে তোমরা মস্কো থেকে এসেছ, যেমন মুসলিম লীগপন্থীরা মক্কা থেকে এসেছেন। এ দেশের মুক্তি কি তোমাদের কাম্য নয়? এই পরিস্থিতিতে অনুচিত হতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্যে সংগ্রাম কি তাই বলে একটা অপরাধ?" স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন।

"কাকে তুমি শোনাচ্ছ একথা?" বাবলী জ্বলে ওঠে। "যে দেশের জন্যে জীবনপণ করেছিল। আর একটু হলে ফাঁসীকাঠে ঝুলত। সাহেবটা বেঁচে যায়, সেও বেঁচে যায়। দীর্ঘকাল জেলখানায় বসে সে আরো পড়াশুনা

করেছে। তাই বুঝতে পেরেছে যে ভারতের স্বাধীনতা হচ্ছে উপরতলার দশ-ভাগের নয়, নিচের তলার নব্বইভাগের স্বাধীনতা। সেটা কংগ্রেসের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসনেতারা চান নিজেদের শ্রেণীর আধিপত্য। একদল গোরা ইংরেজকে তাড়িয়ে একদল কালা ইংরেজ সব ক্ষমতা ও সব ধন আত্মসাৎ করবে। যাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে তারা যেমন শোষিত ছিল তেমনি শোষিত থাকবে। গান্ধীজীর মূল স্বরাজ কল্পনা তো ভালোই ছিল। কিন্তু জমিদার, মহাজন ও পুঁজিপতিদের টাকায় কংগ্রেস চালাতে গিয়ে তিনি পড়ে গেছেন তাদেরই শ্রেণীস্বার্থের ফাঁদে। সফল যদি হন তবে সে সাফল্য উপর-তলার দশভাগের লভ্য ডিভিডেণ্ড। নিচের তলার নব্বইভাগের প্রাপ্য মজুরি নয়। এর জন্যে কেন আমি জীবনপণ করব? কেনই বা করেঙ্গে, মরেঙ্গেই বা কেন? আমার রেকর্ড কি তোমার অজানা? তুমি হাইকোর্টের পেপারবুক যদি পড়ে না থাকো তবে ল রিপোর্ট নিশ্চয়ই পড়েছ। আমাকে দেশছাড়া করবে এত বড়ো স্পর্ধা কার। সময় যখন আসবে তখন আমিই তাদের লিকুইডেট করব। তোমার এই ব্রিটিশ আইন তাদের বাঁচাতে পারবে না।"

"যদিও এই ব্রিটিশ আইনই তোমাকে বাঁচিয়েছে।" স্বপনদা হাসেন। "ত্থাখ, চকোলেট, ইংরেজরা চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী ছিল না। ধনতন্ত্রবাদীও ছিল না। এমন কি বুর্জোয়াও ছিল না। তাদের আইনের সূত্রপাত অতি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছিল। প্রচণ্ড সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সে আইন প্রজা-শক্তিকে রাজশক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর করেছে, সিভিল পাওয়ারকে মিলিটারি পাওয়ারের থেকে উচ্চতর করেছে, আইনের শাসনকে মাৎস্যন্যায়ের উর্ধ্বতর করেছে। ওদের দেশের অভিজাতরা বা ধনপতিরাও আইনের উর্ধ্বে নন। বিপ্লব যদি হয় লেনিন স্টালিনকেও বিচারপতিদের রায় মানতে হবে। লিকুই-ডেট করতে হলে তার আগে আইন পাশ করিয়ে নিতে হবে। দীনতম ও হীনতম ইংরেজও এর মূল্য বোঝে। কোর্টের উপর তাদের অগাধ শ্রদ্ধা, কোর্টও তাদের রক্ষক। সরকারটাতে যে উপরতলার লোকের মৌরসী পাট্টা তা নয়। লেবার পার্টিও গদীতে বসতে পারে, বার দুয়েক বসেওছে। সেই-জন্যেই তো ওরা ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। ফাসিস্টরা যাতে জিতে না যায়, জিতে গিয়ে তাদের অধিকার কেড়ে না নেয়, সেইজন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অস্ত্র জোগাচ্ছে। ইংরেজ যাক, কিন্তু তার দেওয়া আইন আদালত, আইনসভা, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক মন্ত্রিত্ব

থাকুক। কংগ্রেস যা চায় তা কেন্দ্রীয় স্তরে তার সম্প্রসারণ। ওই কাঠামোটা পরে তোমাদেরও কাজে লাগবে, যদি জনগণের ভোট পাও।"

দীপিকাদি এবার কণ্ঠক্ষেপ করেন। "তোমার ওসব কথা কংগ্রেসের বামপন্থীরা স্বীকার করবেন না। ওঁরা চান ইংরেজকে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ করতে। ইংরেজশাসনের ভালোমন্দ সব একসঙ্গে মুছে ফেলবেন। বাথ টাবের ময়লা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটিকেও নর্দমায় ফেলে দেওয়া হবে। বাবলীদের সঙ্গে জুলিদের ফারাক খুব বেশী নয়। ওরা এক পালকের পাখী। তবে প্রোলিটারিয়ান একাধিপত্য জুলিরা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। প্রাইভেট প্রপার্টি ওদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ওরা বামপন্থী হলেও মার্কসবাদী নয়। সুতরাং বাবলীদের সঙ্গে গোড়ায় অমিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা এক জিনিস। তার অন্তর্ধানের পরে তার পরবর্তী মতবাদ নিয়ে একমত হওয়া অন্য জিনিস। বিপ্লবেরও দুই দলের কাছে দুই অর্থ ও দুই রূপ। একদল হয়তো আরেক দলকে উৎখাত করবে।"

বাবলী একটু ইতস্তত করে বলে, "কিন্তু ওরা যে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, বৌদি। ওরাই যদি আমাদের আগে বিপ্লব ঘটায় তো আমরা ঘটাব কী? প্রতিবিপ্লব না অতিবিপ্লব? ওরা যদি সফল হয় তবে আমাদের আর মাথা তুলতে দেবে না। ব্রিটিশ আইন তো তখন থাকবে না। আমাদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দিলে আমরা কোন্ আদালতের দ্বারস্থ হব? আমাদের একমাত্র ভরসা স্টালিনের হস্তক্ষেপ, যদি তাঁর জয় হয়। জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে। আমরা এখন মহা উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন গুনছি, প্রহর গুনছি, ঘণ্টা গুনছি। তার জন্যে যদি শয়তানের সাহায্য নিতে হয় তো তাও নেব। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রবাদীরা সাক্ষাৎ শয়তান। তবু তাদের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। সেইজন্যেই তো কংগ্রেসের এই আন্দোলন আমাদের পিঠে ছুরি। নইলে জুলির সঙ্গে তো আমার ভালোবাসার সম্পর্ক। তার অমঙ্গল কে চায়! মেয়েটা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ জানে না। তার মা পর্যন্ত না। ও যে কী করে বেড়াচ্ছে, তাই বা কে জানে? যদি মারাত্মক কিছু করে থাকে তবে মিলিটারি ট্রাইবিউনালে নির্ঘাত প্রাণদণ্ড। তার চেয়েও ভয়ানক কথা—"

"থাক, মুখে আনতে হবে না।" বৌদি ধমক দেন।

স্বপনদা অনুমান করেন। "না, না, ইংরেজরা তত খারাপ নয়।"

বৌদি আবার ধমক দেন ! "তুমি তো সব জানো। ওরা এককালে কীই বা না করেছে ! আজকাল সহজেই ঢি ঢি পড়ে যায় বলে সাবধান হয়েছে। তুমি কি জালিয়ানওয়ালাবাগের ভিতরের কারণ জানো ?"

"তুমি জানো ?" স্বপনদা কৌতহলী হন।

'মিউটিনির পর থেকে ইংরেজদের সর্বক্ষণ আতঙ্ক কখন না জানি ওদের মেমসাহেবরা ধর্ষিতা হন। অমৃতসরে একজন মেমসাহেবের উপর উপদ্রব হয়, সেটা ধর্ষণ না হলেও সব চেয়ে খারাপটাই ওদের মাথায় আসে। নেটিভদের নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে জেনারল ডায়ারের অতর্কিত গুলীবর্ষণ। যারা নিরপরাধ তাদেরই প্রাণদণ্ড হলো। ওটার জন্যে ভালো ইংরাজরা সকলেই লজ্জিত। অথচ প্রাণ খুলে ডায়ারকে অভিশাপ দিতেও পরাঙ্‌মুখ। তিনি নাকি ইংরেজ মহিলামাত্রেরই মানরক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই জালিয়ানওয়ালাবাগ ম্যাসাকার করেছিলেন। এসব কথা তুমি ইতিহাসে পাবে না। এটা অলিখিত এক অধ্যায়। আমিও লিখব না। ইংরেজরা ভয় পেয়েছিল ও তার সঙ্গত কারণ ছিল এটা সত্য।" বৌদি একথা মানেন।

"ওরা সাক্ষাৎ শয়তান। তবু আমাদের দুর্দিনের মিতা।" বাবলী বলে।

"নারী ! নারী !" স্বপনদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন। "নারীর জন্যেই লঙ্কাকাণ্ড। নারীর জন্যেই কুরুক্ষেত্র। নারীর জন্যেই ট্রয়ের যুদ্ধ। নারীর জন্যেই জালিয়ানওয়ালা বাগ ম্যাসাকার। তার থেকে অসহযোগ আন্দোলন। যার চরম পরিণতি এই 'ভারত ছাড়ো' অভ্যুত্থান। এখন ক্যারামেলের গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। দিলে এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই নিয়ে পরে এক মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস লেখা হবে। ক্যারামেল হবে তার নায়িকা।"

"তুমিও যেমন !" বৌদি পরিহাস করেন। "কেউ জানতে পেলে তো ধ্বংসলীলা শুরু করবে ? যা কড়া সেন্সরশিপ ! কাগজে কতটুকু বেরোয় ! তুমি কি জানো যে জুলির সঙ্গে যার বিয়ে হবে সেই সৌম্য চৌধুরীর মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা ? যে ধরিয়ে দেবে সে পাবে।"

"ও কী ! সৌম্য তো কট্টর অহিংসাবাদী। ও কোথায় কবে কী করেছে যে ওর মাথার দাম হবে পাঁচ হাজার টাকা ?" স্বপনদা হকচকিয়ে যান।

"তা তো জানিনে। খবরটা আমার কানে এসেছে চুম্বক আকারে। বোধ হয় পুলিশ গেজেটে বেরিয়েছে।" বৌদি যতদূর জানেন।

"তা হলে জুলির বরও নিখোঁজ।" বাবলী দুঃখিত হয়ে বলে।

স্বপনদা সংশোধন করেন, "ভাবী বর।"

"বেচারি জুলি! কবে যে ওর বিয়ের ফুল ফুটবে তা কে বলতে পারে? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ব্রত নিয়ে বেঁচে থাকাই দায়। আমার ভয়ানক মন কেমন করছে ওর জন্যে। ঝগড়া করেছি বলে কি আমি ওকে কম ভালোবাসি? মেয়েটা গেল কোথায়? ও তো সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোস যেমন নিরুদ্দেশ জুলিও তেমনি নিরুদ্দেশ। দেশের বাইরে চলে গেছে কি না কে জানে! না যাওয়াই সম্ভব। বরের টানে দেশে থেকে যেতেও পারে।" বাবলী গবেষণা করে।

"বরটাও যদি দেশান্তরী হয়ে থাকে? পাঁচ হাজার টাকা যার মাথার দাম সে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু করেছে। নইলে ফেরার হবে কেন! নেপাল। নেপাল! আমার মনে হয় নেপালে গিয়ে ওখান থেকে বিহারে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে। শুনেছি বিহারেই ওর আসল বাড়ী।" স্বপনদার ভাষ্য।

"যত সব বাজে ভাবনা।" বৌদি এককথায় খারিজ করেন। আত্মগোপন করার পক্ষে কলকাতার মতো জায়গা আর নেই। এমন সব গলি খুঁজি আছে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না। দিনের বেলাও ব্ল্যাক আউট। এক বাড়ীর ছাদ থেকে আরেক বাড়ীর ছাদে লাফ দেওয়া যায়। পাঁচ হাজার টাকার লোভে পুলিশ কি নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে? যদি ওদের হাতে রিভলভার থাকে! এই যুদ্ধের মরসুমে বিস্তর রিভলভার আমদানী হয়েছে, কালো বাজারে কেনা যায়। জুলির তাতে কোনো অনীহা নেই। ওর ভাবী বরের কথা আলাদা। গান্ধীবাদী বলে শুনেছি। গান্ধীবাদীরা তো আত্মগোপন করে না। এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।" বৌদি নিশ্চিত নন।

"পুলিশও আজকাল তেমন তৎপর নয়। ওরাও বোঝে ক্ষমতা একদিন কংগ্রেসের হাতেই পড়বে। আর নয়তো বার্মার মতো জাপান পসন্দ দলের হাতে। যুদ্ধের যতদিন না একটা এসপার কি ওসপার হচ্ছে ওদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি না দলের লোকেরা কেউ ধরিয়ে দেয়। এই পোড়া দেশে সেটার সম্ভাবনাই বেশী। বকধার্মিকের মতো বকস্বদেশীতে দেশ ভরে গেছে। খদ্দরের ভেক পরে ঘুরে বেড়ায়।" স্বপনদা সীনিকের মতো বলেন।

বৌদি প্রতিবাদ করেন। "বকস্বদেশী তুমি কাদের বলছ? ওরা যে

মহাত্মা গান্ধীর পদাতিক সেনা। খাদি ওদের ইউনিফর্ম। লক্ষ লক্ষ বিধবা চরকায় সুতো কেটে দুটো পয়সা পাচ্ছে, হাজার হাজার তাঁতী কাপড় বুনে দু'মুঠো ভাত পাচ্ছে। লোকে কম টাকায় মিলের ধুতী শাড়ী না কিনে খাদির ধুতী শাড়ী কিনছে। সেইভাবে দেশের জন্যে যে যেটুকু পারে ত্যাগস্বীকার করছে। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। বিনা ত্যাগসে না মিলে স্বরাজ। এত অধিকসংখ্যক ভারতবাসী এত বেশী ত্যাগস্বীকার কি এর আগে কখনো করেছে? সুবিধাবাদী আর বিশ্বাসঘাতক কোন্ সৈন্যদলে নেই? তা বলে ওদের দিয়ে দেশ ভরে গেছে এটা তোমার অত্যুক্তি।"

স্বপনদা বলেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি একটা মস্ত বড়ো গুণ হচ্ছে ওরা নির্মমভাবে পার্জ করে। পার্জ করতে গিয়ে এমন কড়া পার্গেটিভ দেয় যে ময়লার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বেরিয়ে যায়। সেটা অবশ্য মস্ত বড়ো একটা দোষ। আর আমাদের এখানে কংগ্রেসের রীতি হচ্ছে আদৌ পার্জ না করা। পাছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়।"

বৌদি মেনে নিতে পারেন না। "তুমি যাকে পার্জ বলছ তার নামে মধ্যযুগে ছিল ইনকুইজিশন আর উইচ হাণ্ট। সেইসব জিনিস অন্য নামে ফিরে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টি রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতোই অসহিষ্ণু। কংগ্রেসও যদি তাই হয় তবে এদেশেও ইনকুইজিশন ও উইচ হাণ্ট শুরু হবে। এরা অবশ্য মানুষকে পুড়িয়ে মারবে না বা ফায়ারিং স্কোয়াডের সাহায্যে হত্যা করবে না। কিন্তু তার ধোপানাপিত বন্ধ করবে, দানাপানি রোধ করবে। সে গ্রামে টিকতে পারবে না। শহরে পালিয়ে আসবে। সেখানেও আশ্রয় পাবে না। দেশান্তরী হবে। কংগ্রেসকে টোটালিটারিয়ান পার্টি না করে ডেমোক্রাটিক পার্টি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। থাক না কিছু দলাদলি। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। সিদ্ধান্ত যেটা হবে সেটা মেজরিটি ভোটেই হবে। কিন্তু মাইনরিটিও থাকবে। তাকেও সুযোগ দিতে হবে মেজরিটি হয়ে ওঠার। পার্জ করবে কে কাকে? কার সে অধিকার আছে? গায়ের জোরে পার্জ করলে সেটা হবে ন্যায় নয়, অন্যায়। যারা সামাজিক ন্যায়ের জন্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে তারা কী করে বলবে যে এটা অন্যায় নয়, ন্যায়?"

"শোন, বৌদি," বাবলী এর উত্তর দেয়, "তোমার যুক্তি নির্ভুল। কিন্তু যাদের ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, যাদের রাষ্ট্র এখনো মজবুত হয়নি, তারা যদি টের পায় যে তাদের পার্টির ভিতরেই শত্রু, তা হলে তারা প্রতিবিপ্লবের বা অতি-

বিপ্লবের ভয়ে কাঁটা বেছে ফেলবেই। যাতে নিষ্কণ্টক হতে পারে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। মহান স্টালিন একান্ত সহনশীল। কিন্তু তাঁর সহনশীলতারও সীমা আছে। হত্যার আদেশ যখন তিনি অনুমোদন করেন তখনকার ফোটো দেখেছ? কী করুণাঘন মুখ! ওটা আপনাকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে নয়, পার্টিকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, সেইসূত্রে বিপ্লবকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র রাষ্ট্রকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে, আমাদের পিতৃভূমিকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে। হাসছ যে!"

"তোমাদের পিতৃভূমি শুনে।" বৌদি উপহাস করেন।

"আক্ষরিক অর্থে নয়। প্রতীকী অর্থে।" বাবলী ব্যাখ্যা করে।

"তারপর তোমাদের জনযুদ্ধ কতদূর?" স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

"রাইফেল হাতে না পেলে জনযুদ্ধ চলবে কী করে? যোদ্ধারা প্রস্তুত, কিন্তু অস্ত্র কোথায়? ইংরেজদের ধারণা হাতিয়ার হাতে পেলে আমরা জাপানের সঙ্গে না লড়ে ওদের সঙ্গেই লড়ব।" বাবলী আক্ষেপ করে।

"সে ধারণা নেহাৎ ভুল নয়, চকোলেট। তোমরা প্রায় সবাই পুরাতন সন্ত্রাসবাদী। ইংরেজরা তোমাদের বিশ্বাস করবে কেন? আর জাপান তো রাশিয়ার শত্রু নয়। তার বিরুদ্ধে তো লড়ছে না। তোমরাই বা জাপানের সঙ্গে লড়বে কার স্বার্থে? তোমাদের পিতৃভূমির স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়। তা হলে কি রাশিয়ার মিতা ইংলণ্ডের স্বার্থে? না, তাও তো নয়। যদি বলো মাতৃভূমির স্বার্থে তবে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘোড়া হাসবে।" স্বপনদা কৌতুক করেন।

"কিন্তু জাপানীরা যে ফাসিস্ট এটা তো সত্য। হিটলার, মুসোলিনী, তোজো এই তিন ফাসিস্ট ডিকটেটরই আমাদের দুশমন। হিটলার ফার্স্ট। হিটলারকে ঢিট করার পর তোজোর পালা আসবে। ইতিমধ্যে আমাদেরও সক্রিয় হতে হবে। আমরা প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্টিফাসিস্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে। প্রত্যেকটি শহরে, প্রত্যেকটি গ্রামে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি। সাম্যবাদী সুসমাচার প্রচার করছি। পুঁথিপত্র বিতরণ করছি। মিশনারিদের মতো নামমাত্র দাম নিই। শান্তির সময় হলে ইংরেজ সরকার আমাদের কর্মীদের জেলে পুরত, পুঁথিপত্র বাজেয়াপ্ত করত। যুদ্ধকালে আমরা নিরঙ্কুশ। তুমি যদি চাও তো বলো, তোমাকে একসেট মার্কসীয় সাহিত্য এনে দেব। মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, স্টালিন সকলের বই পাবে। কিন্তু ট্রটস্কির নয়, বুখারিনের নয়।" বাবলী মাথা নাড়ে।

"কেন, ওঁরা কি মার্কসবাদী ছিলেন না?" স্বপনদা জেরা করেন।

"ছিলেন, কিন্তু পার্টি লাইন মেনে চলেননি। লাইনচ্যুত হয়েছেন। মার্কসবাদ ইণ্টারপ্রেট করবার একমাত্র অধিকারী হচ্ছে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি। যার ফার্স্ট সেক্রেটারি কমরেড স্টালিন।" বাবলী জবাব দেয়।

বৌদি টিপ্পনী কাটেন, "যেমন গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ, যার প্যাট্রিয়ার্ক বাস করতেন মস্কোতে। অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত চার্চ, অভ্রান্ত প্যাট্রিয়ার্ক। সব ঘুরে ফিরে এসেছে। মানতেই হবে। না মানলে কোতল।"

"আমি হিউমানিস্ট। সব রকম মানবিক ব্যাপারে আমার আগ্রহ। মার্কসবাদী চিন্তাধারাও মানবিক। রোজা লুকসেমবুর্গের বই তোমার কাছে থাকলে দিয়ো। জার্মানীতে তাঁর সেই বিপ্লব সফল হলে সেখানকার পার্টি লাইন অন্যরকম হতো।" স্বপনদা মনে করেন।

"যেমন মার্টিন লুথারের প্রটেস্টাণ্ট চার্চের সাম্প্রদায়িক বিধান।" বৌদি তুলনা দেন। তাঁর মুখে বাঁকা হাসি।

"রোজা লুকসেমবুর্গকে আমি অশেষ শ্রদ্ধা করি। ওঁর বই তো এদেশে নিষিদ্ধ। আমরা যেসব বই আনাই সেসব তো রাশিয়া থেকে। রোজার বই রাশিয়া পাঠাবে না।" বাবলী অক্ষমতা জানায়।

"তার মানে মার্কসবাদীরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মতো। বৌদ্ধ ও জৈনদের মতো। আমরা লিবারল হিউমানিস্টরা গোঁড়া নই। সব সম্প্রদায়েরই বক্তব্য প্রণিধান করি।" স্বপনদা বলেন।

"ভালো কথা, তোমাদের লিবারল হিউমানিস্ট ম্যানিফেস্টোর কী হলো? মিটিং তো বসল কয়েকবার।" বৌদি জানতে চান।

"মিটিং মানে তো ইটিং। নানা মুনির নানা মত। লিবারলদের যত মত তত পথ। প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। যেখানে এত বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেখানে একমত হওয়া অসম্ভব। কমিউনিস্টরা গুরুবাদী। মার্কস তাঁদের গুরু। র‍্যাডিকাল হিউমানিস্টরাও গুরুবাদী। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁদের গুরু। আমাদের তেমন কোনো গুরু নেই। আমরা গুরুবাদী নই। তর্কাতর্কি করেই আমরা একমত হতে চেষ্টা করি। কোনো কোনো পয়েণ্টে একমত হইও। কিন্তু মোটের উপর নয়।" স্বপনদা জানান।

এবার বাবলী প্রতিবাদ করে। "ওই যে বললে কমিউনিস্টরা গুরুবাদী ওটা তোমার ভুল ধারণা, দাদা। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন

করে মার্কস এমন একটি পন্থার নিশানা দিয়ে গেলেন যা অনুসরণ করে রুশ-দেশের কমিউনিস্টরা প্রমাণ করলেন যে মার্কসবাদী বিপ্লব অব্যর্থ। এর মধ্যে গুরুবাদ কোথায়? এ তো কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো যুগান্তকারী পর্যায়। আমেরিকা পাঁচশো বছর পরে যে স্তরে উপনীত হয়েছে রাশিয়া পঁচিশ বছরের মধ্যেই সেই স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মার্কস স্বয়ং এতটা প্রত্যাশা করেননি। মার্কসকে যদি গুরু বলতে চাও তো লেনিন হচ্ছেন তাঁর গুরুমারা চেলা। আর স্টালিন লেনিনের চেয়েও এক কাটি সরেশ।"

বৌদি হেসে ফেলেন। "তা তো হবেনই। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ। স্টালিন তো শত সহস্রমারী। তিনি ধন্বন্তরি।"

"ফরাসী বিপ্লবের ও তার পরবর্তী নেপোলিয়নী আমলের হিসাব নিকাশ করলে দেখবে যে শত সহস্রকেও ছাড়িয়ে যায়। নীট ফল ব্যর্থতা। অপর পক্ষে নীট ফল সার্থকতা। অন্তত এখনপর্যন্ত তাই। রোমানভরা আর কখনো ফিরে আসবেন না, অভিজাতরাও না। বুর্জোয়ারা ফিরে এলে কৃষক শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে দেখবেন ওদেরই ভোটের জোর বেশী। ফাসিজম প্রবর্তন করলে গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হবেন। পৃথিবীর অন্তত একটা অংশে চিরকালের মতো বুর্জোয়াদের যুগ অস্ত গেল। সেখানে এখন নবযুগের সূর্যোদয়। এক এক করে অন্যান্য অংশেও সূর্যোদয় হবে। চীনদেশে তার পূর্বাভাষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মহান লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন বিপ্লব যাবে পিকিং আর কলকাতার পথ দিয়ে প্যারিসে। পিকিং পর্ব সারা হলেই কলকাতা পর্ব। আমরা তার জন্যে কোদাল দিয়ে মাটি কাটছি।" সবিনয়ে নিবেদন করে বাবলী।

স্বপনদা ব্যথিত হয়ে বলেন, "ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন। ওরা জানে না ওরা কী করছে। যে যুগটাকে ওরা শেষ করে দিচ্ছে সেটা লিবারল হিউমানিজমের যুগ। এখনো সে যুগের কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিক দেশান্তরে গিয়ে বেঁচে আছেন ও সৃষ্টি করে চলেছেন। রাশিয়াতে বনস্পতি বলতে কেউ নেই, থাকলেও নীরব। সেখানে এরণ্ড হয়েছেন দ্রুম। লেনিনের তবু শিল্পবোধ সাহিত্যবোধ ছিল। স্টালিন তো সে রসে বঞ্চিত। বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্ব শিল্প থেকে রাশিয়ার নাম মুছে গেল। টলস্টয় ডস্টয়েভস্কি টুর্গেনিভ চেকভের উত্তরসূরী রইল না। তোমরা যদি এদেশে সফল হও তবে আমরাই হব লাস্ট জেনারেশন। তা হলে এখন থেকেই সোয়ান সং লিখতে হয়।"

"সোয়ান সং মানে কী, বৌদি ?" বাবলী জিজ্ঞাসা করে।

"ওদেশে একটা প্রবাদ আছে, রাজহংসের মরণ আসন্ন হলে সে তার অন্তিম গীতি শুনিয়ে দিয়ে মরে। সোয়ান সং মানে বিদায় সঙ্গীত। বড়োই করুণ!" বৌদি বুঝিয়ে দেন।

"না, দাদা, তোমাকে আমরা মরতে দেব না, বাঁচিয়ে রাখব। তবে ওই বুর্জোয়াপসন্দ উপন্যাস লেখা আর চলবে না। শ্রমিকপসন্দ কৃষকপসন্দ লিখতে হবে। তাতে তোমার লাভও হবে বিস্তর।" বাবলী অভয় দেয়।

"যাদের জীবনের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় নেই, যাদের ভাষাও আমি শিখিনি তাদের মনের মতো উপন্যাস লেখা কি আমার কর্ম ? যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। পাঠকরা আমাকে লাঠিপেটা করবে। মরতে আমাকে হবেই, আক্ষরিক অর্থে না হোক সাহিত্যিক অর্থে। স্ত্রীপাঠ্য বা শিশুপাঠ্য কাহিনীর মতো শ্রমিকপাঠ্য বা কৃষকপাঠ্য কাহিনী লিখে আমি হয়তো জনপ্রিয় হব, পুরস্কৃতও হতে পারি, কিন্তু সেটা দু'দিনেই বাসি হয়ে যাবে। তোমরাই মুখ ফিরিয়ে নেবে। তার চেয়ে মানে মানে অপসরণই ভালো। তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, বোন! মস্কোর পরে পিকিং তার পরে কলকাতা, তার পরে প্যারিস। তা হলে এখন থেকেই লণ্ডন যাত্রা নয় কেন ? আরো কিছু দিন সময় পাওয়া যাবে।" স্বপনদা দীপিকাদির দিকে তাকান।

"তুমি তো ওদেশে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছ। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও প্রস্থান করবে, সে আমি জানি। কিন্তু আমি আমার এল্‌ফকে নিয়ে এই দেশেই থেকে যাব।" বৌদি এল্‌ফকে কাছে টেনে নেন।

সেও ল্যাজ নেড়ে সম্মতি জানায়। বাবলীর কোল ছাড়ে।

বাবলী অপ্রতিভ হয়ে বলে, "তোমাদের সুখের সংসার ভেঙে দিতে আমি আসিনি, বৌদি। এদেশে বিপ্লব কি এখনি হচ্ছে ? আগে তো চীনদেশে হোক। তার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে মাওৎসে-তুংয়ের নেতৃত্বে। পিকিং এখনো দূর অস্তু। দাদা, তুমি যা লিখতে চাও লিখে যাও। আমরা বাধাও দেব না, ফরমায়েসও করব না। তবে আশা করব যে তোমার মতো শক্তিশালী লেখক বুর্জোয়াদের অবক্ষয়ী সমাজের বর্ণনার বদলে মহৎ কিছু লিখবেন, যেটা সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণী সানন্দে গ্রহণ করবে। টুর্গেনিভকে তো আমরা খারিজ করিনি। টলস্টয়কে তো নয়ই। বাতিল করেছি ডস্টয়েভ্‌স্কিকে।

পাক্কা প্রতিক্রিয়াশীল। আর চেকভকে। তাঁর হৃদয় ছিল, সেটার অপাত্রে অপচয় করেছেন।"

"শুনছি চেকভের বই আজকাল আবার ছাপা হচ্ছে। সকলের জন্যেই ছিল তাঁর দরদ। মানুষমাত্রেরই জন্যে।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"হ্যাঁ, চেকভের নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে। তিনি তো জাত বুর্জোয়া ছিলেন না। তবে ডস্টয়েভ্স্কি বরাবরের মতো বাতিল।" বাবলী যতদূর জানে।

"তা যদি হয় তবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠ থেকে তাঁর স্বদেশবাসী বঞ্চিত হবে। আমি 'ব্রাদারস কারামাজভে'র কথা ভেবে বলছি। তুমি যদি না পড়ে থাক তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কোনো সাহিত্যিককে লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। এর পরে ডস্টয়েভ্স্কির দিনও আসবে।" স্বপনদা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বাবলী এলফকে একটু আদর করে বলে, "যুদ্ধে যদি জিতি পমেরানিয়া আমরাই দখল করব।"

## ॥ একুশ ॥

পূজার বন্ধে কলকাতা গিয়ে মানস বিজন বর্ধনের অতিথি হয়। বিজনের গৃহিণী উদিতা জানতে চায় যূথিকা কোথায়। সে আসেনি কেন।

"যূথিকা এখন মহিলা সমিতির ভার নিয়ে হরেক রকম ধান্দায় জড়িয়ে পড়েছে। সুতো কাটা, তাঁত বোনা থেকে শুরু করে হাসপাতালে গিয়ে রোগিণীদের সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করা। বাচ্চাদের জন্যে দুধও নিয়ে যায়। তার উপর আছে নিজের বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার। আমরা ওদের ইস্কুলে দিইনি। গভর্নেস রাখারও ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও যূথিকার নিজস্ব ধারণা আছে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে শেখায়।"

উদিতা তা শুনে খুব খুশি হয়। সে নিজে এখন মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করছে। শীতকালের জন্যে পশমের মোজা গেঞ্জি পুলোভার ও কম্বল বানিয়ে নিয়ে সীমান্তে পাঠাচ্ছে। ছেলেকে দিয়েছে পাহাড়ের মিশনারী ইস্কুলে। সংসারের ভার হালকা।

বিজন আরো ভারিক্কি হয়েছে। আফিসের কাজের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকে। বাজে বই পড়ে না। বাজে কথা বলে না। পোশাক আসাকের শখ নেই। বাড়ীতে সেই বিলেতের ছাত্রজীবনের মতো গ্রে ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স আর ব্লু ব্লেজার কোট পরে থাকে। কী শীত, কী গ্রীষ্ম। বন্ধুরা হাসলে বলে, "আমি এখনো ছাত্র।"

কথায় কথায় স্ট্যাটিস্টিকস উদ্ধৃত করে। মজুত খাদ্যের হিসাব দিয়ে বলে, "ফসল ভালো হলেও লোকের খোরাকে টান পড়বে। বিদেশী সৈন্য আমদানী চলেছে, অথচ বার্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ। ঘাটতি পূরণ হবে কী করে? র‍্যাশনিং ছাড়া আর কোন্ উপায় আছে?"

মানসকে মানতে হয় যে সেটাই একমাত্র উপায়।

আরো একটা ফ্যাকৃটর কাজ করছে। সেটা আরো বেশী ভাবনার বিষয়। দেশে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন শুরু হয়ে গেছে। জাহাজের অভাবে বিলেত থেকে যা আমদানী হচ্ছে না তা এদেশেই তৈরি করে নিতে হচ্ছে। কতক মাল জাহাজ থাকলেও বিলেত থেকে সরবরাহ করতে পারা যেত না। ওদেশের কলকারখানাগুলো এখন যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণে ব্যস্ত। এদেশের পক্ষে এটা একটা মওকা। মাড়োয়ারীরা এতকাল কেনাবেচা করেই ক্ষান্ত ছিল। মওকা পেয়ে এখন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে উঠছে। ইউরোপীয়দের পার্টনার হচ্ছে। শ্রমিকরাও যে এর সুযোগ নিচ্ছে না তা নয়। ওদেরও মজুরি বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মঘট করবে কোন্ দুঃখে? তবে, হ্যাঁ, টাকা দিয়ে যদি খাদ্য কিনতে না পায় তবে পেটের দায়ে ধর্মঘট করবেই। তখন চড়া দামে চাল কিনে মালিকরা ওদের খাওয়াবেন। গরিবরা না খেয়ে মরবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন যেদেশেই হয়েছে সেদেশেই খাদ্যে টান পড়েছে। যদি না কৃষির জন্যে যথেষ্ট জমি থাকে, সার থাকে, পশু থাকে, পশুখাদ্য থাকে, মুনিষ থাকে, মুনিষখাদ্য থাকে। ল্যাণ্ড রিফর্মসও চাই। আর নয়তো উপনিবেশ থেকে সস্তায় খাদ্য আমদানি, উপনিবেশে মানুষ রফতানী।"

মানস এতটা চিন্তা করেনি। "তা হলে তুমি কী করতে বলো? যুদ্ধের আনুষঙ্গিক যে সম্ভবত সোশিয়াল রেভোলিউশন এইপর্যন্ত আমি জানতুম। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনও কি আনুষঙ্গিক?"

"গত মহাযুদ্ধেও এর লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নইলে টাটা উৎসাহ পেতেন কী করে? এবার বিড়লাও পাচ্ছেন। আরো অনেকে পাচ্ছেন। এইসূত্রে

যে ধনিককুল মাথা তুলছে এরাই ভাবী শাসককুলের পলিসি নির্দেশ করবে।"
বিজন মৃদু হাসে।

"ভাবী শাসককুল মানে কি কংগ্রেস?" মানস প্রশ্ন করে।

"বাংলাদেশে তো নয়। এখানে মুসলিম লীগ ঘাঁটি গেড়ে বসছে। তাকে বিনা যুদ্ধে হটানো যাবে না। সার নাজিমউদ্দীনের ঘরে গেলে দেখবে, সম্মুখেতে প্রসারিত তব বাঙ্গালার মানচিত্র। একটার পর একটা মহকুমায় মুসলিম মহকুমা অফিসার পাঠানো হচ্ছে আর মানচিত্রে সেই মহকুমার উপর সবুজ নিশান পিন দিয়ে আঁটা হচ্ছে। এমনি করে মুসলিমপ্রধান মহকুমাগুলোর বেশীর ভাগই সবুজ হয়ে গেছে। এর পরে আসছে জেলার পালা। সেটা অত সহজ হবে না। ডিষ্ট্রিক্ট আসলে রেভিনিউ ডিষ্ট্রিক্ট। রেভিনিউ না হলে রাজত্ব চলে না। এটা আকবর বাদশাও বুঝতেন। ইংরেজ লাটসাহেবরাও বোঝেন। রাজস্বের ব্যাপারে হিন্দুরই যোগ্যতা বেশী। সার নাজিমের ইচ্ছার চেয়ে লাটসাহেবের ইচ্ছাই প্রবল। তা ছাড়া জেলার দায়িত্ব নেবার মতো মুসলিম সিভিলিয়ানই বা ক'জন? প্রোভিন্সিয়াল সার্ভিস থেকে প্রমোশন দেবার সময় জাতধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতারও বিচার করতে হয়। প্রমোশনের বেলা সাম্প্রদায়িক অনুপাত খাটে না। ব্রিটিশ রাজ তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। দিলে হিন্দু কর্মচারীদের আনুগত্য হারাবেন। কেন আমি ভূতের মতো খেটে মরব বা মরে ভূত হয়ে যাব, যদি জানি যে আমার উপরওয়ালা হবে আমারই এক অধস্তন অফিসার? এরই নাম ব্রিটিশ জাস্টিস, যার জন্যে ইংরেজরা গর্বিত? আর আমরা কৃতজ্ঞ? যা বলছিলুম, বাংলাদেশে মুসলিম লীগ ঘাঁটি গাড়ছে। ইংরেজরা একটা স্তর পর্যন্ত গাড়তে দিচ্ছে। সেটা মহকুমা স্তর। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল তো সেই স্তরেই নির্ধারিত হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মহকুমা হাকিমের নিত্য যোগাযোগ। থানা আর ইউনিয়নগুলো তাঁরই তদারখে। সার নাজিমের দলটাই জিতবে। জিতে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে. কংগ্রেসওয়ালাদের মন্ত্রী হতে কেনই বা ডাকবে, যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে? তবে বাংলাদেশের আইনসভায় ইউরোপীয় ব্লকের ভোট না পেলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো পক্ষেরই নয়। অথচ ওরা যদি নিরপেক্ষ থাকে মুসলিম মন্ত্রীদের উপরেই বারবার শাসনভার বর্তাবে। মুসলিম লীগ চেষ্টা করবে সব ক'জনকে দলে টানতে। কংগ্রেস মুসলিম বলতে একজনও নেই। থাকলেই বা কী? কংগ্রেসের

এখানে কতটুকু চান্স? খালি গোলমাল বাধালেই হলো?" বিজন আশাবাদী নয়।

এরপর গোলমালের প্রসঙ্গ ওঠে। মানস চায় তথ্য জানতে।

"মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস ও ইংরেজ দুই পক্ষই গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসী দিয়েছে। আইনের ধার ধারেনি। একপক্ষ আইন অমান্য করলে অপর পক্ষও আইন অমান্য করে। এটা বোধহয় গান্ধীজী জানতেন না।"

মানস তো অবাক। "দুই পক্ষ বলছ কেন? কংগ্রেস তো জেলে। আর ইংরেজ নিশ্চয়ই ইংরেজ সিভিলিয়ান নয়।"

"না। এ পক্ষের 'জাতীয় সরকার' আর ও পক্ষের মিলিটারি অফিসার। মানছি এর জন্যে কংগ্রেস দায়ী নয়। গভর্নমেণ্টকেও দায়ী করা যায় না। যুদ্ধকালে মিলিটারি নিরঙ্কুশ। ওরা সর্বত্র জাপানের পঞ্চম বাহিনী দেখছে। এই বা কী! বিহারে, যুক্তপ্রদেশে ও অন্য কোনো কোনো প্রদেশে যা ঘটেছে তা আরো ভয়ঙ্কর। দেড়শোটার বেশী পুলিশ স্টেশন ও অন্যান্য সরকারী ইমারত আক্রমণ করা হয়েছে। ত্রিশজনের উপর পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। তা ছাড়া আরো কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও সৈনিককেও। অপর পক্ষও চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। গ্রামের লোকদের বন্য পশুর মতো মৃগয়া করেছে। আকাশ থেকে প্লেন নেমে এসে উপর থেকে মেশিন গান চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেছে। চাবুক মারা তো শত শত ক্ষেত্রে হয়েছেই, পাইকারী জরিমানাও আদায় করা হয়েছে কোটি খানেক টাকার। আন্দোলন এখনো থামেনি। রেল লাইন এখনো তুলে ফেলা চলেছে, টেলিগ্রাফের তার কাটাও। রাস্তা অবরোধ, কালভার্ট ধ্বংস এসব কর্মও। এটা হলো ইজ্জতের লড়াই। ভারত ব্রিটেনের চেয়ে খাটো নয়। ব্রিটেনও খাটো হবে না।" বিজন খুলে বলে না সে কোন্ দিকে।

"কী দরকার ছিল এই লড়াইয়ের? যখন জাপান এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। গান্ধীজীকে আচমকা না গ্রেপ্তার করলে কি এত কাণ্ড হতো? তোমার সহানুভূতি কার প্রতি জানিনে। আমার সহানুভূতি গান্ধীজীর প্রতি।" মানস ব্যক্ত করে।

"গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার না করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানো উচিত ছিল, একথা অনেকেই বলছেন। রামস্বামী আয়ার তো বড়লাটের শাসনপরিষদ থেকে পদত্যাগই করলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো এই যে গান্ধীজী

গণসত্যাগ্রহ করবেন বলে মনঃস্থির করেই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে বড়লাট তাঁকে গণসত্যাগ্রহ পরিচালনার অনুমতি দিতেন না। কিংবা তাঁকে খুশি করার জন্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন না। স্রোতের মাঝখানে কেউ ঘোড়া বদল করে? যুদ্ধকালে ক্ষমতার হস্তান্তর করে? গান্ধীজীও কি তাঁর যুদ্ধবিরোধী নীতি পরিত্যাগ করতেন? কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে বসলেও তিনি তাঁর যুদ্ধবিরোধী নীতি অনুসরণ করে যেতেন। ফলে কংগ্রেসও তাই করত। যতদিন না কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটছে ততদিন গান্ধীই কংগ্রেস আর কংগ্রেসই গান্ধী। বড়লাট এটা মর্মে মর্মে বোঝেন। বৃথা সময় বাইরে দিয়ে বামপন্থীদের আস্কারা দিলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত, বড়লাটের যেমন গান্ধীজীরও তেমনি। বামপন্থীদের একভাগ আবার জাপানভক্ত। যেন জাপানীরা ভারতমিত্র। আর ইংরেজরা ভারতবৈরী। এ ধারণা সম্পূর্ণ একপেশে। নিজেদের এই দুর্দিনে ইংরেজরা কেউ ভারতীয়দের শত্রু করতে চায় না। ভারতীয়রাও কেউ বিশ্বাস করে না যে জাপানী আক্রমণ ভারতের জওয়ানরা ব্রিটিশ অফিসারদের সহায়তা বিনা রুখতে পারবে।" বিজন যতদূর বোঝে।

"এই ট্র্যাজেডীর একটা অঙ্ক এখনো বাকী। গান্ধীজীর অনশনে দেহত্যাগ। ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের চিরবিচ্ছেদ। চিরশত্রুতা।" মানস কাতরস্বরে বলে।

"জোন অভ্ আর্ককে পুড়িয়ে মারার দরুন ফরাসীরা ইংরেজদের কোনো দিন ক্ষমা করেনি। করবেও না। অথচ জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধের বেলা ওরা পরস্পরের মিত্র। গরজ বড়ো বালাই। তেমন গরজ আজকের দিনে যেমন ইংরেজদের তেমনি ভারতীয়দেরও। কে জানে আবার এ রকম হতে পারে।" বিজন বাস্তববাদী।

"ভাবীকালের মুখ চেয়ে দুই পক্ষেরই কর্তব্য এ ট্র্যাজেডী নিবারণ করা। এখনো সময় আছে। কিন্তু বেশীদিন নয়।" মানস আশঙ্কা করে।

"সেটা তোমার আমার সাধ্য নয়। আমি অর্থনীতি বুঝি, রাজনীতি বুঝিনে। আর তুমি তো সাহিত্যিক, রাজনীতির কী বোঝ? চড়া স্টেক রেখে ব্রিজ খেলা চলেছে। ইংরেজে কংগ্রেসে।" বিজন শেষ কথা শুনিয়ে দেয়।

যূথিকা মানসকে বলে দিয়েছিল উদিতাকে জিজ্ঞাসা করতে ঝরনার খবর

কী। যদি তার জানা থাকে। তা শুনে উদিতা বলে, "আমার বোন সবিতার খবর জানিনে। ঝরনার খবর জানব কী করে? তবে খারাপ খবর হলে সরকার থেকেই জানিয়ে দিত। বাড়ীতে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যেত।"

"কথায় বলে, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। তা হলেও আত্মীয় স্বজনের বন্ধুবান্ধবের মন মানে না। কতরকম বিপত্তি আছে মানুষের জীবনে। বিশেষ করে মেয়েমানুষের জীবনে। কেন যে ওরা ওয়াকি হতে গেল! তখন কি জানত যে জাপানীদের কবলে পড়বে?" মানস উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"আমাদের সবিতার জন্যে আমরাও কি কম ভাবছি? কিন্তু ভেবে এর কোনো কূলকিনারা নেই। যুদ্ধ যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন প্রকৃত সত্য কেউ জানতেও পাবে না, জানাতেও পারবে না। রেড ক্রসও নাচার। সেই যে একটা কথা আছে, ট্রুথ ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যাজুয়ালটি ইন ওয়ার। সবিতাকে আমরা ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছি। সবাই ওকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল। ও নাছোড়বান্দা। আমার অনুমান ঝরনারও তেমনি জেদ।" উদিতা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের জল মোছে।

পরের দিন মানস স্বপনদার ওখানে হাজিরা দেয়। উনি মহাবিরক্ত হন সে ওঁর ওখানে ওঠেনি বলে।

"ভ্যাকেশন জজ হয়ে এসেছি। বিজনের ওখানে টেনিসকোর্ট আছে, র‍্যাকেট আছে। কাজে লাগবে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার আগে থেকে এনগেজমেণ্ট ছিল। আমাদের সতীর্থদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে বসব ও কর্তব্য স্থির করব। ইংরেজরা যদি সত্যি সত্যি ভারত ছাড়ে আমাদের কর্তব্য কী হবে।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"সেটা ভাববার সময় এসেছে। কংগ্রেসের চোখে তোমরাও দুশমন। কত লোককে জেলে দিয়েছ। শুনতে পাই মারধোরও করেছ। আর মুসলিম লীগ তো মুসলিম না হলে চাকরিতে রাখবে না। তবে ইংরেজ তোমাদের বিসর্জন দিয়ে যাবে না। সঙ্গে নিয়ে যাবে। যেমন বার্মা থেকে তোমাদের বেরাদরদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন।

"সেটা কিন্তু আমার পছন্দ নয়। আমার সাহিত্যের কাজের ক্ষতি হবে। যাকে রাখো সেই রাখে। সাহিত্যকে যদি রাখি সাহিত্যই আমাকে রাখবে। তবু জানতে চাই অন্যেরা কী ভাবছে।" মানস উৎসুক।

বৌদি এসে যুথিকার কথা জিজ্ঞাসা করেন। ওর সঙ্গে তো তাঁর দেখাই হলো না। কবে হবে?

"সবই অনিশ্চিত। ইংরেজরা যদি বাংলাদেশ থেকে আরো পশ্চিমে যায় আমাদেরও পশ্চিমমুখো হতে হবে। পূবমুখো হবার সম্ভাবনা কম। নইলে বলতুম বদলীর সময় দেখা হবে।" মানস উত্তর দেয়।

"আমার মনে হয় জাপানীরা ভারতে আসবে না। ওরা বার্মা দখল করেই দাঁড়ি টানবে। লাইন অভ্ কমিউনিকেশনস বাড়িয়ে ওরা মুশকিলে পড়বে। না পারবে বজায় রাখতে, না পিছু হটতে। ওই বার্মা পর্যন্তই ওদের দৌড়। তবে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে।" স্বপনদা দরজা জানালার কাঁচ কালো করে দিয়েছেন। পেছনের বাগানে গর্তও খুঁড়েছেন। ওটা হবে তার শেলটার।

"তুমি যা বলছ সেটাই যুক্তিসঙ্গত। সীমান্ত থেকে কেউ যদি আসত তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হতুম।" মানসের কলকাতা আসার সেটাও একটা উদ্দেশ্য।

স্বপনদা হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, তোমার বন্ধু সৌম্য চৌধুরী এমন কী করেছে যে ওর মাথার দাম নাকি পাঁচ হাজার টাকা?"

মানস তা শুনে হতবাক্। সে বৌদির দিকে তাকায়। তিনি বলেন, "কে জানে কতদূর সত্য? বাবলীও তো শোনা কথা শুনিয়েছে।"

"কী ভয়ঙ্কর কথা। সৌম্যদার মতো অহিংসাবাদীর মাথার দাম এত! আমার তো বিশ্বাস হয় না। আর কোনো সৌম্য চৌধুরী হবে। বাবলী কি ঠিক জানে কোন সৌম্য চৌধুরী?" মানস জেরা করে।

"নোটিফিকেশনে ওর আশ্রমের নামও ছিল। শহরের নামও ছিল। অমন একজন মার্কামারা যুদ্ধবিরোধীকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। গান্ধীকে যদি বন্দী করতে পারে তো ওকেই বা করতে চাইবে না কেন? ধরা না দিলে ধরতে না চাইবেই বা কেন? তা বলে পাঁচ হাজার টাকা। টাকাটা খুব বেশী দেখেই সন্দেহ হচ্ছে।" স্বপনদা মুখ ফুটে বলেন না কিসের জন্যে সন্দেহ।

"বিজনের ওখানে ফিরে যাবার পর মানস সোদপুরে টেলিফোন করে জানতে চায় সৌম্য চৌধুরী এখন কোথায়।

"জানি, কিন্তু বলব না।" যিনি বলেন তিনি হেরম্ব মৈত্রের মতো সত্যভাষী। 'প্রিয়তম জনকেও বলা বারণ। দয়া করে ক্ষমা করবেন।"

মানস বুঝতে পারে এই সৌম্য চৌধুরী সেই সৌম্য চৌধুরী। কিন্তু কেন তার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা। এ প্রশ্ন কাকেই বা করবে? কেই বা উত্তর দেবে? সোদপুরের দ্বিতীয় হেরম্বচন্দ্র কখনো নয়।

সেই ভদ্রলোকই বোধহয় মানসের কলকাতায় অবস্থানের খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দেন। মানসের নামে একটা চিরকুট আসে। "সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে রাস্তার অন্ধকারে দেখা হবে।" স্বাক্ষর নেই। কিন্তু হাতের লেখা থেকে মালুম হয় কে লিখেছে।

ব্ল্যাক আউট। রাস্তায় আলো নেই। মাথার উপরে চাঁদের আলোও না। কৃষ্ণ পক্ষ। লোক চলাচল খুবই কম। মুখ দেখে চেনা যায় না মানুষটা কে। টর্চ জ্বালাবার স্বাধীনতা নেই। রাম বলে যাকে আন্দাজ করলে সে হয়তো যদু। মোটর দুটো একটা আসাযাওয়া করছে, তাদের হেড লাইট কালিমাখা। গতি মন্থর।

বাড়ীর বাইরে ফুটপাথের উপর পায়চারি করছিল মানস। অন্ধকারে পিঠের উপর কে হাত রাখে। পেছন ফিরে মানস দেখে আলখাল্লা পরা এক বাউল কি ফকির। "কে আপনি? কী চান?" এই বলে পকেট থেকে টাকা বার করে। তার মাথায় আসে না যে ওটা ছদ্মবেশ।

"বাবুমশায়, আমরা ভিক্ষা নিইনে। গান শুনিয়ে পুরস্কার নিই। অধমের নাম ভজহরি দাস।" বলে বাউল তার একতারায় টুং টাং করে।

কণ্ঠস্বর থেকে মানস চিনতে পারে। সুধায়, "সৌম্যদা?"

"চুপ! চুপ! কেউ শুনতে পেলে ধরিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম পাবে। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হবে।" সৌম্য বলে।

"কিন্তু তুমি এমন কী করেছ যে তোমার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা? তুমি তো সন্ত্রাসবাদী নও।" মানস আশ্চর্য হয়।

"অত জোরে নয়। চুপি চুপি কথা বলো। আমি সন্ত্রাসবাদী নই বলে কি একেবারে ক্লীব? ইংরেজরা বলে, ইভ্‌ন আ ওয়ার্ম টার্ন্‌স। এমন কি একটা পোকাও ঘুরে দাঁড়ায়। আমরা কি পোকারও অধম? বাঙালীরা বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমরা অহিংসাবাদী বলে উলুখড়ের মতো প্রাণে মরতে চাইনে। কিংবা প্রাণ নিয়ে পালাতেও চাইনে। দুটোই খারাপ। আমরা দ্বান্দ্বিক অহিংসাবাদী। ইভিলের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব।"

"কিন্তু এই তো তুমি নিজেই পালিয়ে বেড়াচ্ছ।" মানস মন্তব্য করে।

"আগে তো সবটা শোন। আমরা উলুখড় হব না বলে স্থির করেছি যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধতেই দেব না। ইংরেজরা যদি জাপানীদের দিকে এগিয়ে আসে তা হলেই তো সংঘর্ষ বাধবে। আমরা ওদের মাঝখানকার পথঘাট ধ্বংস করব। রেল লাইন উপড়ে ফেলব, সড়কের পুল উড়িয়ে দেব, গাছের গুঁড়ি কেটে রাস্তার উপর পাতব। যোগাযোগের উপায় রাখব না। টেলিগ্রাফের তার কাটব। মাঝখানকার অঞ্চলটা হবে নিরপেক্ষ অঞ্চল। কেউ বলতে পারবে না যে আমরা জাপানের পক্ষে বা ইংরেজের বিপক্ষে। দেশটা আমাদের, ওদের কারো নয়। ইংরেজদের কে ডাকছে দেশরক্ষা করতে? জাপানীদের কে ডাকছে দেশকে মুক্ত করতে? উলুখড়ই আপনি আপনাকে রক্ষা করবে, মুক্ত করবে। ভারত থেকে হাত সরাও। হ্যাণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া।" বাউলের মুখে ইংরেজী।

মানস হতচকিত হয়। "এই কি তোমার অহিংসা?"

"কেন? আমি কি একটিও প্রাণীর গায়ে হাত দিচ্ছি? রেল লাইন নির্জীব। নদীর পুলও নির্জীব। পরে আমরা ওসব যেমনকে তেমন করে দেব। লোকসান যা হবে তা ভারতের। ব্রিটেনের বা জাপানের নয়। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় মস্কোর লোক শহর পুড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষতি যা হলো তা রাশিয়ার। ফ্রান্সের নয়। আমরাও বাধ্য হলে স্কর্চড আর্থ পলিসি অনুসরণ করব। সেটাও হিংসাত্মক নয়। কোনোরকম প্রতিরোধ না করে পলায়ন করা অহিংসা নয়। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসাও শ্রেয়। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার দেখা যাবে যে ভারতের জনগণ উলুখড় নয়। তাদেরও পৌরুষ আছে। আমার কাজ হচ্ছে তাদের সুপথে চালিত করা। সেটা করতে গিয়ে আমি কর্তাদের বিষ নজরে পড়ি। আমার নামে পরোয়ানা ও হুলিয়া বেরোয়। এবার আমাদের পলিসি নয় কারাবরণ। তাই আমাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এইখান থেকেই আমি আমার সহকর্মীদের নির্দেশ দিই। তারাও আসে নির্দেশ নিতে। আপাতত আমি আসাম প্রান্তের ভার পেয়েছি। আসামে আমাদের কার্যকলাপ চলেছে। কলকাতা থেকেই সুবিধের। কলকাতাই পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র। তবে মাঝে মাঝে সশরীরে আসামেও যেতে হবে। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে। অসমীয়া ভাষা শিখছি। অ' মোর আপোনার দেশ! অ' মোর চিকুণি দেশ!" এই বলে বাউল গান ধরে।

"জুলিও কি এইসব করছে? সে এখন কোথায়?" মানস সুধায়।

"কলকাতাতেই। কিন্তু তার ঠিকানা প্রতি দিন বদলায়। কোথাও দ্বিরাত্রিবাস করে না। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। এদের প্রোগাম আলাদা। কালেভদ্রে দেখা হয়। ওর সঙ্গিনীদের নিয়ে ও আজকাল বোরখা পরে বেড়ায়। ওরও ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম। ওর কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে পারব না। আমি নিজেও জানিনে।" সৌম্য এইবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

যুথিকা পই পই করে বলে দিয়েছিল যেমন করে হোক জুলির নিরাপত্তার খবর আনতে। সৌম্যদার উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সে যায় জুলির মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বলে, "জুলির জন্যে যুথী উদ্বিগ্ন। আপনার মেয়ে ভালো আছে তো?"

"আমার মেয়ে? আমার মেয়ে কাকে বলছ, মানস?" তিনি অভিমানে ফেটে পড়েন। "আমার সঙ্গে ওর কতটুকু সম্পর্ক? বাড়ী আসে না, চিঠি লেখে বা, টেলিফোন করে না, কারো হাতে খবর পাঠায় না। টোটাল ব্ল্যাক আউট। ও যে কাদের সঙ্গে মেশে, কোথায় থাকে, কী সব কাণ্ড করে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে ইলিসিয়াম রো'তে গিয়ে গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে হয়। জুলি ভাবছে ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না। কিন্তু বাবারও বাবা আছে। গোয়েন্দা দফতর সব খবর রাখে। ওদেরও মহিলা গুপ্তচর আছে। তারাও বোরখা পরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জুলিকে গ্রেপ্তার করা ওদের পলিসি নয়। ওর ভগ্নীপতি স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল, জানো নিশ্চয়। পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। ওদের কৌশল হচ্ছে জুলিকে না ধরে ওর দলের সবাইকে ধরে আটক করা। তা হলে জুলি একেবারে একলা হয়ে পড়বে। এ বাবা ব্রিটিশ সরকার। ছল, বল, কৌশল তিনটে পদ্ধতিতে দুরন্ত। তার উপর আরো এক পদ্ধতিতে ওস্তাদ। ভোজের বা নাচের নিমন্ত্রণ। লাটভবন থেকে আমার নামে চিঠি আসবে, গাড়ী আসবে, পদস্থ কর্মচারী আসবেন। স্বয়ং লাটগৃহিণী আমাকে অনুরোধ করবেন আমার অবুঝ মেয়েকে বোঝাতে যে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য যারা এসেছে তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল, যে যার নিজের পেশায় ফিরে যাবে। কেউ এদেশে থাকবে না। আর দেশীয় সৈনিকদের পদোন্নতির ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে, বর্ণবৈষম্য দূর হয়েছে, সুযোগ সুবিধে সকলের সমান। কেনই বা তারা

ইংরেজদের বিপক্ষে যাবে? জাপান যদি না জেতে তো একূল ওকূল দু'কূল গেল। আর ইংরেজরা যদি কোনোরকম বন্দোবস্ত না করেই ভারত ছাড়ে তা হলে পরে যাঁরা সরকার গঠন করবেন তাঁরা যে এত লোককে চাকরিতে রাখবেন বা এতরকম সুযোগ সুবিধে দেবেন তার গ্যারান্টি কি কেউ দিচ্ছেন? সরকারের নিমক খেয়ে দলে দলে জওয়ান নিমকহারামী করবে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করবে অতখানি স্বদেশপ্রেম ওদের নেই। ওরা রাজাকেই মানে, রাজার উপরেই ওদের আনুগত্য, রাজার নামেই শপথ। রাজার পরিবর্তে প্রেসিডেণ্ট ওদের সকলের আনুগত্য পাবেন না। হিন্দু হয়ে থাকলে মুসলমানের। মুসলমান হয়ে থাকলে হিন্দুর। তৃতীয়পক্ষ এখনো এদেশে দুই পক্ষের আস্থাভাজন। তোমার কী মনে হয়, মানস? জুলিকে বোঝালে বুঝবে? ও তো একটা কল্পজগতে বাস করে। ওর বিশ্বাস সব ইংরেজই শত্রু, সব জাপানীই মিত্র, সব ভারতীয়ই দেশের স্বাধীনতার জন্যে অধীর। ওর ডাকনাম বেবী। ও সত্যি একটা বেবী।" ওর মা সস্নেহে বলেন।

"কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হচ্ছে কোথায় যে আপনি ওকে বোঝাবেন? আপনি কি ওর ঠিকানা জানেন, মাসিমা?" মানস সুধায়।

"সীক্রেট এজেণ্টরা জানে। মুসলমানী সেজে কলকাতা শহরের সর্বত্র আত্মগোপন করা যায় না। এটা হিন্দুপ্রধান শহর। মুসলিম মহল্লাগুলো চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে ওকে আবিষ্কার করা শক্ত নয়। ও পড়বেই ধরা একদিন। কিন্তু ওর দলের আর সকলের আগে নয়। ওটাই সরকারী পলিসি। হয়তো তার দরকারই হবে না। ও নিজেই হৃদয়ঙ্গম করবে যে ইংরেজকে যুদ্ধকালে নড়ানো যাবে না। বাবলী বলে ওর এক বান্ধবী আছে, সে কমিউনিস্ট। এই নিয়ে বাবলীর সঙ্গে জুলির আড়ি হয়ে গেছে। আমি তো মনে করি বাবলীর থীসিসটাই ঠিক, জুলিরটা ভুল। জুলি যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে সেদিন ওর এই অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হবে।" ওর মা ততদিন ধৈর্য ধরবেন।

"আপনি আর উদ্বিগ্ন নন তো?" মানস বাজিয়ে দেখে।

"হব না? কোথায় রাত কাটাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে, সুস্থ আছে না অসুস্থ হয়েছে এসব ভাবনা কি আমাকে একটি মুহূর্তও ছেড়েছে? ও মেয়েটা হয়েছে আমার গেঁটে বাত। গেঁটে বাত কেমন কষ্ট দেয়, জানো তো? তবে

আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত। পুলিশ ওকে ঘাঁটাবে না। পুলিশেরও তো ভয়ডর আছে। গুপ্তচরের কথায় বিশ্বাস করে যদি জুলি বলে অন্য কোনো মুসলিম মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তা হলে সার নাজিমউদ্দীন ওদের চাকরি খাবেন। আব সার নাজিম যদি ওদেব চাকরি না খান তো তাঁর নিজের দলের লোক তাঁর উজিরী খাবে। বোরখার একটা মস্ত বড়ো সুবিধে কেউ গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। বোরখাব আড়ালে ছুরি ছোরাও থাকতে পারে। জুলির হাতে রিভলভার থাকে। সে যদি গুলী করে মারে তার সাফাই হবে তাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল সেই পুরুষ, যাকে সে গুলী করেছে। জুলির ভয়ডর নেই, কোনোদিনই ছিল না। ও যে রিভলভার গায়েব করে ডিটেন হয়েছিল সে ইতিহাস নিশ্চয়ই শুনেছ। সাফাই দিয়েছিল যে রিভলভারটা আর কেউ ওর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে রেখেছিল। ওর দলের ছেলেরা ওর হাতে রিভলভাব দিয়ে বলেছে আত্মরক্ষার জন্যে দরকার হলে পুলিশকে গুলী করতে, আর নয়তো নিজেকে গুলী করতে। ওই জিনিসটাকে আমি ভয় করি। হাজার হোক, বেবী তো। ওর কি পরিণামচিন্তা আছে? যা বলছিলুম, পুরুষ পুলিশ ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। মহিলা পুলিশ কোথায় যে ওকে পাকড়াবে? বাইরে থেকে আনাতে হবে। যদি সে গুলী খেতে সাহস পায়। কিন্তু জুলিকে পাকড়াতে গিয়ে আয়েষাকে বা ফতেমাকে পাকড়ালে মুসলিম জনতার হাতে নিজেই পিটুনি খেয়ে মরবে।" মিসেস সিন্‌হা খুব একচোট হাসেন।

মানস অতটা আশাবাদী নয়। ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করার ঘটনা সে তার কর্মজীবনে ঢের শুনেছে। পুলিশ তাতে সিদ্ধহস্ত। জুলি একদিন ফাঁদে পড়বেই। আর ওর মায়ের ওটা একটা দিবাস্বপ্ন যে লাটভবন থেকে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে চিঠি আসবে, নিয়ে যেতে গাড়ী আসবে, পদস্থ অফিসার আসবেন। দিবাস্বপ্ন যদি তাঁকে শান্তি দেয় তো স্বপ্নভঙ্গ করতে যাওয়া কেন? সে আশ্বাস দিয়ে বলে, "এই আন্দোলনটা জোর কদমে বেশীদিন চলবে না, চলতে পারে না। জাপানীরা না এলে তো জুলির উৎসাহ জল হয়ে যাবে। বামপন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে লড়বার মতো শক্তিমান নয়। ওরা লড়ে যখন কংগ্রেস লড়ে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে, তা সত্ত্বেও সরকারকে হটাতে পারেনি। আন্দোলনটা আবার জমতে পারে যদি জাপান সত্যি সত্যি আক্রমণ করে। কিন্তু আর কবে করবে! এর মধ্যে ইংরেজরাও তৈরি হয়েছে। ওই

বার্মাবিজয়ই জাপানের দিক থেকে চূড়ান্ত। জুলি একদিন বাড়ী ফিরে আসবে, মাসিমা। সেটার খুব বেশী দেরি নেই। তবে এখানের তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চেষ্টা করবেন যাতে ওর বিচার মিলিটারি ট্রাইবিউনালে না হয়ে আমাদের কারো কোর্টে হয়।"

## ॥ বাইশ ॥

স্বপনদা চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মানস গিয়ে দেখে সেটি রীতিমতো একটি চা চক্র। মীর সাহেব ছিলেন আর ছিলেন সুবিনয় তালুকদার, ইন্দ্রজিৎ রাহা, আদিত্য বর্মণ। মহিলারা অন্য ঘরে। এল্‌ফ এ ঘর ও ঘর করছিল। যেখানে যা পাবে সেখানে তা খাবে।

"আপনারা পাঁচজনে মিলে কিসের চক্রান্ত করছেন?" মানস মীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"চক্রান্ত কি কেউ জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফাঁস করে দেয়? ফাঁসী হয়ে যাবে না?" মীর সাহেবও রঙ্গ করেন।

"উকীল ব্যারিস্টাররা আছেন কী করতে? তাঁরা বাঁচিয়ে দেবেন না? নির্ভয়ে বলুন।" মানস অভয় দেয়।

স্বপনদা খেই ধরেন, আমিই বলছিলুম, "এঁরা শুনছিলেন। বিশ্বের মানচিত্র-খানা তোমার সামনেই রয়েছে। একবার চোখ বুলিয়ে নাও। লিবারল বলে গৌরব করতে পারে এমন একটিও দেশ কি আছে? হয়তো সুইডেন কি সুইটজারল্যাণ্ড। এই যুদ্ধ কাউকে লিবারল হতে দিচ্ছে না। মুখে লিবারল হলে কী হবে, কাজে স্বৈরাচারী। যুদ্ধ জিততে হবে, তাই যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে হবে। তফাৎটা এই যে কর্তা অর্ধেকটা সত্য হাতে রেখে বাকী অর্ধেক প্রকাশ করেন তাঁর দেশের পার্লামেন্টের বা কংগ্রেসের কাছে। নিজের মন্ত্রীদের কাছেও যে ভেঙে বলেন তাও নয়। এদেশের ব্যাপারও তেমনি। বড়লাট যা জানেন জঙ্গীলাট ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। এমনও হতে পারে যে জঙ্গীলাটই জানেন, বড়লাট জানেন না। দু'জনেই হিজ একসেলেন্সী। একজনের হাতে সিভিল পাওয়ার, অপরজনের হাতে

মিলিটারি পাওয়ার। সরাসরি লণ্ডনের সঙ্গে কারবার। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে কাজ দিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে খিটিমিটি বেধেছে। কিচেনার কার্জনকে মানবেন না। উপরওয়ালারা কিচেনারের পক্ষে। কার্জন পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। তবু তো সে যুগটা লিবারল ছিল। যুগের প্রভাব স্বৈরতন্ত্রী জার্মানীর উপরে, রাশিয়ার উপরেও পড়েছিল। কাইজারের পতনের পরে জার্মানী গণতন্ত্রী হলো বটে, কিন্তু রাশিয়া তা হলো না। আর জার্মানীও নাৎসীদের পাল্লায় পড়ে দ্বিগুণ স্বৈরতন্ত্রী বনে গেল। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি এবারকার মহাযুদ্ধে গুরুতর সিদ্ধান্তগুলো একা একা নিচ্ছেন চার্চিল আর রুজভেল্ট। আর সকলে একের পিঠে শূন্য। অপোজিশন বলতে বিশেষ কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে লিবারল অবশ্যই কতক লোক আছেন, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে দেশকে দেশ নির্বিচারে ও নির্বিবেকে একচ্ছত্রাধীন। আমার তো মনে হয় লিবারল যুগটাই অস্তাচলে গেছে। 'ফিরিবে না, ফিরিবে না সে গৌরবশশী। অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।" স্বপনদার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"তা হলে আমদের লিবারল হিউমানিজমের সার্থকতা কী? ভবিষ্যৎ কী? কাদের জন্যে আমরা ম্যানিফেস্টো রচনা করব?" মীর সাহেব সুধান।

"নাৎসীরা যদি হারে তা হলে আশা আছে বইকি। কিন্তু নাৎসীরা যদি হারে কমিউনিস্টরাও তো জিতবে। গোটা জার্মানী লাল হয়ে যাবে। তারপর গোটা ইউরোপ। সব লাল হো জায়েগা।" তালুকদার বলেন।

"সেইজন্যেই তো আমি কোনো পক্ষের হার চাইনে। নাৎসীরা ফিরে যাক জার্মানীতে। কমিউনিস্টরা তাদের নিজেদের এলাকার বাইরে গিয়ে বিপ্লব না ঘটাক।" স্বপনদা ফতোয়া দেন।

"সেটা যদি সম্ভব হতো এ যুদ্ধ আদৌ বাধত না। মূল কারণটা এই যে উভয় পক্ষই সম্প্রসারণ চায়। তার জন্যে একপক্ষ যাবে পূব মুখে, অপরপক্ষ পশ্চিম মুখে। সংঘর্ষ অনিবার্য। নাৎসীরা যদি পূব থেকে হটে গিয়ে পশ্চিমে চড়াও হয় আর ফ্রান্সের কাছ থেকে আলসাস লোরেন কেড়ে নেয় তা হলেও সংঘাত অনিবার্য। সম্প্রসারণই ওদের ধর্ম। বৃহত্তর জার্মানীই ওদের স্বপ্ন। ওদের হারিয়ে না দিলে ওদের প্রতিবেশীরা সবাই একে একে হারবে। সেইজন্যে চার্চিলে স্টালিনে কোলাকুলি হচ্ছে। যেটা ছিল কল্পনার অতীত। এটা কিন্তু ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের কোলাকুলি নয়। থীসিস আর

অ্যাণ্টিথীসিস মিলে সীন্থেসিস নয়। তার অনেক দেরি।" রাহা স্মরণ করিয়ে দেন।

স্বপনদা স্বীকার করেন যে এটা প্রেমের আলিঙ্গন নয়। তা বলে এ কী প্রলয় কাণ্ড চলেছে স্টালিনগ্রাডে! মানুষ মরছে লাখে লাখে। অত বড়ো যুদ্ধ কী আর কোথাও কখনো হয়েছে? কুরুক্ষেত্র তো ঐতিহাসিক নয়।

"আমি কিন্তু মনে করি কুরুক্ষেত্র নিছক পৌরাণিক নয়। কুরু পাঞ্চালের যুদ্ধই কুরু পাণ্ডবের বলে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও পুরোপুরি কবিকল্পনা নয়। মহাভারতের চরিত্রগুলি আশ্চর্য রকম বাস্তবানুগ। কেউ আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ রমণী নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নন। পরবর্তীকালের ভক্তিবাদীরা তাঁকে অবতারে পরিণত করেছেন। শুধু অবতার নন, তিনিই ভগবান। আমাদের কাজ হবে মহাভারতের একটা যুক্তিবাদী সংস্করণ বার করা। রামায়ণেরও। রামায়ণের যুদ্ধ আর্য সম্প্রসারণবাদীদের সঙ্গে দ্রাবিড় প্রতিপক্ষের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। বাকীটা কবিকল্পনা। কবিরাও চারণকবি। চারণদের মুখে মুখে পল্লবিত হতে হতে যে আকার ধারণ করে সেটাকেই মহাকাব্যের রূপ দেন বাল্মীকি ও তাঁর যারা উত্তরসূরী। ততদিনে মূল ঘটনাটার পর হাজার বছর কেটে গেছে। রামও একজন অবতার হয়ে গেছেন। তার থেকে স্বয়ং ভগবান। ভক্তিবাদ মহাকাব্যকে পরিণত করেছে ধর্মগ্রন্থে। একমাত্র ভারতবর্ষেই এটা সম্ভব।' আদিত্য বর্মণের মতে।

বর্মণের এই ব্যখ্যা মেনে নিলে বলতে হয় রামচন্দ্রও ছিলেন আর্য সম্প্রসারণ-বাদের অধিনায়ক। সেকালের নাৎসীদের হিটলার। বিভীষণ ছিলেন সেকালের কুইসলিং। মুসেলিনিকে সেকালের সুগ্রীব বললে কি ভুল হবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে হনুমানটি কে!" রঙ্গ করেন স্বপনদা।

"যাঁরা প্যারিস ছেড়ে দিয়ে নাৎসীদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁদেরই একজন। আমার মতে মার্শাল পেঁত্যা। প্রধান মন্ত্রী হয়ে তিনিই যুদ্ধবিরতির অগ্রণী হন। তার পর দক্ষিণে চলে যান। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ফ্রান্সের ইনটেলেক-চুয়ালরা ক্ষমা করেননি। ওদেশের রেজিস্টান্সের খবর নানা দেশ ঘুরে কানে আসছে।" রাহা প্রবেশ করেন।

স্বপনদা আহত হয়ে বলেন, "তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতা এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থে নয়। জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। মাজিনো লাইনের উপরে অন্ধ নির্ভর-তার দরুন দেশরক্ষার জন্যে ফরাসীরা বিকল্প ব্যবস্থা করেনি। পরাজয় আসন্ন।

বাধা দিলে প্যারিস ধ্বংস হতো। একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্তের আবশ্যকতা ছিল। ভার্দুনের ত্রাণকর্তা ভিন্ন আর কে পারতেন সে সিদ্ধান্ত নিতে? তাই সিদ্ধান্তটা মার্শাল পেতঁ্যার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি কলঙ্ক মাথায় নিয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেন। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যাজতি পণ্ডিতঃ। আধখানা ফ্রান্স জার্মানদের দখলে আসে। প্যারিস তার মধ্যে পড়ে। প্যারিসের কাছে ঠিক সেই জায়গাটিতেই সেই রেলগাড়ীর কামরায় আবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় যেখানে হয়েছিল গত মহাযুদ্ধের শেষে। সেবার নতিস্বীকার করেছিল জার্মানী। এবার সেটা করল ফ্রান্স। স্বয়ং হিটলার উপস্থিত থেকে মনের জ্বালা মেটালেন। নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কী বলব একে? অকারণ রক্তক্ষয়ে কী লাভ হতো ফ্রান্সের?"

"কিন্তু ব্যাপারটা সেবারকার মতো শেষ হয়ে গেল না, স্বপনদা।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "নাৎসীরা সহযোগিতা দাবী করবে, পাবেও। ফ্রান্সের একাংশ এখন শিবির বদল করেছে। সেটা তার মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। দ্য গল ব্রিটেনে গিয়ে নতুন এক সৈন্যদল গঠন করে মিত্রপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রমাণ করেছেন যে ফরাসীদের প্রতিরোধের আগুন অনির্বাণ। তা ছাড়া ইনটেলেকচুয়ালরাও তো অসি ধরেছেন। সেইভাবে দেশের মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস জানতে চাইবে নেপোলিয়নের আক্রমণের মুখে মস্কোর জনগণ যেমন নগরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ফরাসী আক্রমণকারীদের জয়ের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেছিল হিটলারের আক্রমণের মুখে প্যারিসের জনগণও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল না কেন। তা না করে তারা শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করছে কেন। পঞ্চাশ বছর বাদে কেউ কি ফরাসী ভাষায় এই মহাযুদ্ধ নিয়ে আরেকখানা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লিখবেন? গর্ব করার মতো কী আছে একালের ফরাসীদের? ফরাসী বিপ্লব আর নেপোলিয়ন নিয়ে আর কতকাল গৌরব বোধ করা চলবে? এপিক উপন্যাসের উপাদানটা কোথায়? জনগণ যোগ না দিলে এপিক উপন্যাস হয় না। ইনটেলেকচুয়ালরা তো জনগণ নন। সবটা দোষ পেঁত্যার ঘাড়ে চাপানো যায় না। যথা প্রজা তথা রাজা। একথা জার্মানদের বেলাও খাটে। জার্মানীর জনগণও হিটলারের অপকর্মের জন্যে দায়ী। জার্মান সাহিত্যের এটা একটা কুৎসিত অধ্যায়।"

স্বপনদার মুখখানা দেখে মীর সাহেবের মায়া হয়। "ও প্রসঙ্গ থাক। আমরা আজ মিলিত হয়েছি লিবারল হিউমানিজমের ভবিষ্যৎ ভাবতে। লিবারল

বিশেষণটা আজকের জগতে অর্থহীন। এখন বিচার করা যাক হিউমানিজম বিশেষ্যটা কতদূর অর্থবহ। আমি তো দেখছি ইংলিশম্যানরা ম্যান নয়, ইংলিশম্যান। জার্মানরা ম্যান নয়, জারম্যান। মুসলমানরা ম্যান নয়, মুসলম্যান। ব্রাহ্মণরা ম্যান নয়, ব্রাহম্যান। যে যার বৈশিষ্ট্য নিয়েই গর্বিত, সাধারণ মনুষ্যত্ব নিয়ে নয়। কবিগুরু যেমন বলেছেন, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি। এই উক্তি কি ওদের বেলাও খাটে না? এই মহাযুদ্ধে যেসব ভয়ানক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ও পরে ব্যবহারের জন্যে তৈরি হচ্ছে সেসব কি হিউমান না ইনহিউ-মান? এ বলে, আমায় দ্যাখ। ও বলে আমায় দ্যাখ। নির্বিচারে আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। সেটা এই শতাব্দীর পূর্বে কখনো ঘটেনি। এরা রাক্ষসেরও অধম।"

খাবারের প্লেট মীর সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বপনদা বলেন, "হিউমা-নিজম মানুষকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হবার প্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু মানুষ যদি সেই শক্তি ও সেই জ্ঞান সর্বনাশের কাজে লাগায় তা হলে তার প্রতিরোধ বা প্রতিকার হিউমানিস্টরা জানেন না। শুনছি আইনস্টাইন নাকি রুজভেল্টকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে পরমাণুর বিভাজন এখন সম্ভব। ফলে পরমাণবিক বোমা নির্মাণ করা যায়। তার মানে কী দাঁড়ায়? নাৎসীদের বিনাশ করতে গিয়ে জার্মান জাতিকেও সাবাড় করা হবে। নাৎসীরা যদি মরণ কামড় দিয়ে ইহুদী জাতিকেও উজাড় করে এর শোধ নেয় তবে ওদের রক্ষা করার কী উপায়!"

মীর সাহেব চার দিকে চেয়ে দেখেন খাবাবের প্লেট সকলের হাতে দেওয়া হয়েছে কি না। হয়েছে দেখে আশ্বস্ত হন। বলেন, "মানুষের যদি ধর্মবুদ্ধি না থাকে, সে যদি খ্রীস্টের প্রেমের দৃষ্টান্ত ভুলে যায় তবে সর্বশক্তিমান হয়ে সে শক্তির অপব্যবহার করবে। সর্বজ্ঞ হয়ে করবে জ্ঞানের অপব্যবহার। অপব্যবহার যে করে সে তার নিজেরই অহিত করে! জগতের অন্তর্নিহিত নৈতিক বিধান তার শক্তি খর্ব করে, তার জ্ঞান তাকে বাঁচাতে পারে না। হিউমানিজম মানুষের হৃদয়কে প্রেমে ভরে দেয়নি। করুণার বিগলিত করেনি। তবে চার্চের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছে। সাহিত্যে ও শিল্পে নব জাগরণ এনেছে। মানুষকে নতুন করে অনুসন্ধান করতে, চিন্তা করতে শিখিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রশক্তির বদলে যন্ত্রশক্তিকে মহামূল্য ভাবতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে তন্ত্রশক্তি। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি হরেক রকম তন্ত্র। মানুষ তান্ত্রিক বনে গেছে।

তান্ত্রিকরা কোনো কালেই নিঃস্বার্থ ছিল না। ব্যক্তির পক্ষে স্বার্থপরতা যেমন জাতির পক্ষে স্বার্থপরতাও তেমনি।"

মানস জিজ্ঞাসা করে, "আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে আপনি লিবারলও নন, হিউম্যানিস্টও নন, আপনি আর কিছু। সেই আর কিছুটা কী, মীর সাহেব? মানবোত্তর স্তরে উপনীত হতে চান? একা নয়, সবাইকে নিয়ে? আমরাও আপনার মতো এক একজন অতিমানব হব?"

"আরে না, না।" মীর সাহেব হেসে বলেন, "আমার বক্তব্য শুধু এই যে আধুনিক যুগের হিউম্যানিজম মধ্যযুগের খ্রীস্টধর্ম বা ইসলামের চেয়ে কম রণোন্মাদ বা কম মানববিদ্বেষী নয়। এই দুই মহাযুদ্ধকে যদি একই মহাযুদ্ধের দুই অঙ্ক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এটাও একটা ক্রুসেড। এবার খ্রীস্টান বনাম মুসলমান নয়, জার্মান বনাম ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান, আমেরিকান। এটাও একটা থার্টি ইয়ার্স ওয়ার। এবার ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্টাণ্ট নয়, ফাসিস্ট বনাম অ্যাণ্টিফাসিস্ট। হিউম্যানিস্ট তো এরা সবাই। খ্রীস্টান কি কেউ আছে? ইউরোপে ধর্মের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। গির্জাগুলো খালি। কিন্তু হিউম্যানিজমের যুগও তো সারা হয়ে আসছে। মহাযুদ্ধের তৃতীয় অঙ্কে হিউম্যানিজমেরও যবনিকা পতন। অতিমানব? আমার সে যোগ্যতা নেই। এ জীবনে হবেও না। সত্যিকার মানব হতে চাই। মানবরূপী দানব নয়। মনে হচ্ছে মানব হবে মানবাসুর। আরেক জাতের ডাইনোসর। তারই মতো নির্বংশ হবে। পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লড়তে।"

"নাৎসীদেরও কি আপনি হিউম্যানিস্ট বলবেন?" মানস বিস্মিত হয়।

"দর্শনে বিজ্ঞানে জার্মানদের স্থান সকলের উপরে। সঙ্গীতে ওরা অদ্বিতীয়। তা হলে ওরা হিউম্যানিস্ট নয় কেন?" মীর সাহেব সুধান।

"সেকথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু জার্মান হলেই কি ফাসিস্ট হয়? নাৎসীরা ক্ষমতা দখল না করলে যারা হিউম্যানিস্ট বলে গণ্য হতেন তাঁরা যদি পালাবার পথ না পেয়ে আপস করে থাকেন তবে কি বলতে হবে যে তাঁরাও ফাসিস্ট! ফাসিস্ট বলে পরিচয় দিলেও তলে তলে তাঁরা হিউম্যানিস্ট। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কাছে নতি স্বীকার করেও যেমন ছিলেন গালিলেও। সবাই কি ব্রুনো হবার সাহস রাখেন? আগুনে পুড়ে মরার সাহস। ইনকুইজিশনের যুগ আবার ফিরে এসেছে।" মানস বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে।

"নাৎসীদের হুকুমে যাঁরা নাৎসীদের মতো আচরণ করছেন তাঁরা একদা

হিউমানিস্ট বলে গণ্য হলেও এখন স্বধর্মভ্রষ্ট মানবাসুর। আসুরিক উপায়ে শত্রু ধ্বংস করার নিত্য নতুন বলকৌশল বার করে হিটলারকে উপহার দিচ্ছেন। ওদিকে রুশ হিউমানিস্টরাও স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে তাই করছেন। অন্যত্রও তাই দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্র হয়তো প্রাণে মারবে না, ভাতে মারবে। মল্লিক সাহেব, এটাও এক প্রকার ইনকুইজিশন। ব্রুনো হবার সাহস ক'জনের আছে? গালিলেও হবেন প্রায় সকলেই। এবার চার্চের হুকুমে নয়, স্টেটের হুকুমে। কে ভেবেছিল যে স্টেটও সমান নির্মম হবে?" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

"ওটা শুধু যুদ্ধকালে।" তালুকদার বলেন।

"যুদ্ধ পাঁচবছর চলবে বলে কি মানুষ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে রাজী হবে? মরে যাবে না?" মীর সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দেন। "মুসলমান তার নামাজ বন্ধ রাখবে? হিন্দু তার দোল দুর্গোৎসব বন্ধ রাখবে? হিউমানিজম যাদের কাছে ধর্মের মতো ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল তাঁরাও তেমনি তাঁদের সৃষ্টিকর্ম, গবেষণাকর্ম, দার্শনিক চিন্তা. বৈজ্ঞানিক চিন্তা বন্ধ রাখতে পারেন না। সেসব লিপিবদ্ধ করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। যাতে আর সকলে আলোচনা করতে পারে, সমালোচনা করতে পারে। মানবদেহের রক্ত চলাচলের মতো মানবমনেরও ভাব বিনিময় চাই। নইলে মন কখনো সুস্থ থাকতে পারে না। মানুষ মানসিক অসুখে ভোগে। এই যে আমরা অবাধে আলাপ আলোচনা করতে পারছি এটা সোভিয়েট রাশিয়া হলে অসম্ভব হতো। নাৎসী জার্মানী হলেও অসম্ভব হতো। অন্যান্য দেশেও ক্রমে অসম্ভব হবে, যদি যুদ্ধের ফলাফল দেশের বিপক্ষে যায়। লেখনীর মুখ তো আমাদের দেশেও বন্ধ হয়ে গেছেই। কথা বলার মুখও বন্ধ হবে, যদি না সত্য গোপন করি বা অসত্য প্রচার করি। মানবিকবাদ যাঁদের কাছে ধর্মের মতো জীবন্ত তাঁরা যুদ্ধকালেও জীবন্ত হতে সাহস পাবেন না। তার চেয়ে বলা ভালো আমি ধর্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু মানবিকবাদের জন্যে প্রাণ দিতে ডরাই। আপনারাও ভেবে দেখবেন, হিউমানিজম কি আপনাদের কাছে ভাইটাল? ধার্মিক যিনি তিনি বলেন, আমি সারা দুনিয়া পেলেও কী করব, যদি নিজের আত্মাকেই হারিয়ে ফেলি? মানবিকবাদী যিনি তিনিও কি তাই বলতে পারেন? যদি না পারেন তো অমন কোন মতবাদের দায় মাথায় না নিয়ে যেটুকু স্বাধীনতা পাচ্ছি তার সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।"

"অর্থাৎ চাচা, আপনা বাঁচা!" আদিত্য বর্মণ বিদ্রূপ করেন।

সবাই হেসে ওঠেন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেন না।

মীর সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, "আমরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে যা বিশ্বাস করি সেটাকে যত হাস্যকর ভাবছেন তত হাস্যকর নয়। আপনাদের বরাত ভালো যে এই গভর্নমেণ্ট এদেশের কনস্ক্রিপশন জারি করছে না। সত্যাগ্রহের ভয়ে করবেও না। নইলে আপনাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যেত ও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত। তখন আপনারা কোন্ ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন? চাচা, আপনা বাঁচা?"

এবার কারো মুখে হাসি ফোটে না। রাহা আমতা আমতা করে বলেন, "মীর সাহেব, আমরা কি তবে কনস্ক্রিপশনের জন্যে প্রস্তুত থাকব, যদি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়?"

"আমি তো প্রথম বোমাবর্ষণের দিন মোটা অঙ্কের লাইফ ইনশিওরান্স করে রেখেছি। লাইফ ইনশিওরান্স বলে বটে, আসলে কিন্তু ওয়াইফ ইনশিওরান্স। তাঁকে তো সান্ত্বনা দেবার কিছু থাকবে না, যদি পটল তুলি। ওই মোটা অঙ্কটাই সান্ত্বনা। যুদ্ধে যদি মরতেই হয় তবে ঘরে বসে বোমা খেয়ে মরা যা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গোলা খেয়ে মরাও তাই। তবে আমাকে ধরে নিয়ে না গেলে আমি যা'চ্ছিনে। যেতুম, যদি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতো। বলা যায় না দু'মাস পরে কী ঘটবে। জাপানীরা যদি গোটা দুই প্রদেশ কেড়ে নেয় ইংরেজকে বাধ্য হয়ে কনস্ক্রিপশন জারি করতে হবে। সেটা তারা করিয়ে নেবে কংগ্রেসকে দিয়ে। মৌলানা আজাদ তো প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হলে ও সামরিক ক্ষমতা হাতে পেলে তিনি কনস্ক্রিপশন করবেন। তা যদি হয় তবে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকাই সুবুদ্ধি। কংগ্রেস যদি গদীতে বসে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আপনি থেমে যাবে। আর জিন্না সাহেবের পাকিস্তানও জাপান অধিকৃত বাংলার মাঠে মারা যাবে।" মীর সাহেব জবাব দেন।

"জাপানীরা বাংলা কেড়ে নেবে এটা যে আমি ভাবতেই পারিনে, মীর সাহেব। এটা কি সম্ভবপর?" বর্মণ প্রশ্ন করেন।

"পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরাও ভাবতে পারতেন না যে ইংরেজ বাংলা, বিহার, ওড়িশা কেড়ে নেবে। যারা অপ্রস্তুত তাঁরা ইতিহাসের কাছেও অপ্রস্তুত হন। ওঁরা বাস করতেন মূর্খের স্বর্গে। ওদের ধারণা ছিল দিল্লীর বাদশা থাকতে ভাবনা কিসের? তিনিই রক্ষা করবেন। মালুম ছিল না যে বাদশাহী ফৌজও দূর্বল হয়ে পড়েছিল। সেকালের মতো একালের বাদশাহী

ফৌজও দুর্বল হয়ে পড়ে। নইলে সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা রাখতে পারে না কেন? জাপানীরা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। পরে একদিন বিপুল বেগে আক্রমণ করবে। ও তোমার পাঞ্জাবী সেনার কর্ম নয়। ওদের জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। আর ইংরেজ তো এখন ঘরমুখো। তার মন পড়ে আছে নিজের দেশে। যে দেশ এখনো বিপদমুক্ত হয়নি। যে কোনো দিন আক্রান্ত হতে পারে। বাঙালীকে বাঙালী না বাঁচালে কে বাঁচাবে?" মীর সাহেব পাণ্টা প্রশ্ন করেন।

"ওটা লাখ কথার এক কথা।" স্বপনদা উত্তর দেন। "কিন্তু বাঙালী যে পরিমাণে ধর্মসচেতন সে পরিমাণে জাতিসচেতন নয়। জাতি বলতে সে বোঝে ধর্মভিত্তিক জাতি। হিন্দু বা মুসলিম। দ্বিজাতিতত্ত্ব তার মজ্জাগত। তারা যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এটা কোনো পক্ষই অন্তর থেকে মানে না। সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হবে দু'পক্ষকেই হিউমানিস্ট করা আর ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করা।"

"গুপ্ত সাহেব, আপনি চান প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সীন্থেসিস। সে সাধনায় আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছেন। হিউমানিজমকে আপনি অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু একালের হিউমানিস্টদের একভাগ ডিভাইনকে অগ্রাহ্য করেছেন। যেন হিউমান আর ডিভাইন পরস্পরবিরোধী। হিউমানকে তাঁরা জন্মমৃত্যুর গণ্ডীর ভিতর পুরে তার অমরত্ব অস্বীকার করেছেন। এতটুকু সময়ের মধ্যে একজন মানুষ কীই বা জানতে পারে, বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, দিয়ে যেতে পারে, রেখে যেতে পারে! তা হলে ব্যক্তিকে ছেড়ে বংশপরম্পরার কথা ভাবতে হয়। আমরা যা পারলুম না আমাদের বংশধররা তা পারবে। একালে যা সম্ভব হলো না ভাবীকালে তা সম্ভব হবে। এযুগে যার উপর অবিচার হলো আগামী যুগে তার উপর সুবিচার হবে। কিন্তু ভাবীকাল বা ভাবী যুগের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নেও পরিণত হতে পারে। যেমন হয়েছে জার্মানীতে ও ইটালীতে। হিউমানিস্টদের আরেকদল ডিভাইনকে বাদ দেননি। অমরত্বে বিশ্বাস হারাননি। দুই ভাগের মধ্যে মতভেদ তীব্র ও গভীর। এই দ্বন্দ্ব ভারতেও এসে উপস্থিত হয়েছে বা হবে। আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ি কেন? আমিও একটা সাধনায় নিযুক্ত রয়েছি। সেটা হিন্দু মুসলমানের সীন্থেসিস। ভারতবর্ষকে এর জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। বেছে নিয়েছে বিশ্বের ইতিহাস। মুসলিম বিজেতারা এককালে ভেবেছিলেন তাঁরা ইরানের মতো ভারতবর্ষকেও পুরোপুরি ইসলামের দেশ বানাবেন।

তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদেরি একভাগ হিন্দুদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন, তাদের আদর অভ্যর্থনা করেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নেন। দারা শিকোহ্, করেন উপনিষদের অনুবাদ। আকবর তাঁর রাজপুত পত্নীর মহালে হিন্দু দেবদেবীর পূজা আর্চার আয়োজন করেন। হিন্দু রাজন্যদের অন্তঃপুরে মুসলিম খোজারাই হন রানীদের রক্ষক। হিন্দু আচার ব্যবহার মুসলিম পরিবারে ঢোকে। মুসলিম পোশাক আসাক হিন্দুদের গায়ে ওঠে। নানক কবীর আরো গভীরে গিয়ে সীন্থেসিসের সূত্রপাত করেন। নানক তো মক্কায় গেছলেন বলে শোনা যায়। গ্রন্থসাহেবের কতক অংশ ইসলাম থেকে নেওয়া হয়েছে। আওরংজেবের রাজত্বে একটা সেট-ব্যাক হয়। ফলে সীন্থেসিস ব্যাহত হয়। সীন্থেসিস কার সঙ্গে কার হয়? থীসিসের সঙ্গে অ্যান্টিথীসিসের। দেখা গেল শিবাজী হয়েছেন থীসিস, আওরংজেব তাঁর অ্যন্টিথীসিস। মরাঠা মোগলের দ্বন্দ্বে ভারতের স্বাধীনতা নিহত হয়। উড়ে এসে জুড়ে বসে ইংরেজ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমানে একটা আঁতাত হয়। সেটা গভীরতর স্তরে নয়। শিবাজী-আওরংজেবের স্পিরিট এখনো প্রবল। গান্ধীজী তাঁর মুসলিম সহকর্মীদের নিয়ে দেশকে আবার স্বাধীন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর একদিকে শিবাজী, আরেকদিকে আওরংজেব। ইংরেজ ভারত ছাড়লে সিভিল ওয়ার। কেউ কাউকে হারাতে সেকালেও পারেননি, একালেও পারবেন না। নীট ফল দেশভাগ। আমি কিন্তু যতদিন বাঁচি সীন্থেসিসের সাধনা করে যাব। আমি দারা শিকোহ্‌র অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করছি। সমাপ্ত করে যেতে পারব না, জানি। তবে লোকে একদিন এর প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করবে।" মীর সাহেব আশাবাদী।

মানস বলে, "আমিও আমার সাধ্যমতো আপনার সহায়তা করব। তবে আমার প্রবণতাটা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সীন্থেসিসের দিকে। এটা রাজনীতির চেয়ে গভীরতর স্তরের ব্যাপার। স্বপনদার সঙ্গে আমিও আছি। এটাও ভারতবর্ষের ইতিহাসবিধাতার নির্বন্ধ। ইংরেজ চলে গেলেও এর প্রয়োজন থাকবে।"

"প্রাচ্য পাশ্চাত্য সীন্থেসিস এখন অথই জলে।" তালুকদার মন্তব্য করেন। "দেশের অধিকাংশ লোক এখন ইংরেজবিরোধী, সেইজন্যে আমেরিকা-বিরোধী তথা পাশ্চাত্যবিরোধী। ইংরেজ যদি সত্যি সত্যি চলে যায় আবার সতীদাহ ফিরে আসবে। হিন্দুরা ফিরে যাবে গুপ্ত সম্রাটদের যুগে আর

মুসলমানরা খলিফাদের যুগে। রেনেসাঁস মিলিয়ে যাবে হাওয়ার সঙ্গে। রিভাইভালিজম হবে হিউমানিজমের যম। বেঁচে থাকলে হতাশ হব আমরা। মীর সাহেব একটা লস্ট কাজ নিয়ে লড়ছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ততর হচ্ছে। সীন্থেসিসের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষ গ্রীকদের হজম করেছে, শক হুন কুশানদের হজম করেছে, কিন্তু মোগল পাঠানদের হজম করেনি। উল্টে ওরাই হিন্দু সমাজের একাংশকে হজম করেছে। পারলে পূর্ণ গ্রাস করত। হিন্দুরা এতকাল ডিফেন্সিভে ছিল। এখন অফেন্সিভ নিচ্ছে। ওদের নিবৃত্ত করতে গেলে মার খেতে হবে। আমরা কেউ সে ঝুঁকি নিতে রাজী হব না। অন্তত আমি তো নয়ই।"

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উপর যবনিকা পড়ে যখন মহিলারা প্রবেশ করেন। তখন মীর সাহেব বিদায় নেন। তাঁর কাজ আছে। মানসও কিছুক্ষণ পরে বর্ধনের ওখানে ডিনার বলে মাফ চায়।

মানস ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই পাকড়াশি ওকে পাকড়ায়। "এই যে, স্বামী মানসানন্দ। তোমার কেন অমন দুর্মতি হলো? কেউটে সাপের গর্তে হাত দিতে গেলে? জানতে না সুলতান খান্ কেমন লোক? মেদিনীপুরের রাজদ্রোহীদের জব্দ করার জন্যে সাইক্লোন রিলিফ বন্ধ রেখেছেন। যাক না ওরা ওদের জাতীয় সরকারের দরবারে। দেখা যাবে কার সাধ্য দেয়।"

বর্ধন জানতে চান কী ব্যাপার। মানস বলে, "সমুদ্রের জল এসে দশ মাইল কি বিশ মাইল দূরের গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোক নিরাশ্রয়। একজন ডাক্তারি ছাত্রের অনুরোধে যূথিকা একটি মেডিকাল রিলিফ টীম পাঠিয়েছে। আমি সুলতানকে একখানা চিঠি লিখে অনুমতি দিতে বলেছি। পর পর আরো কয়েকটি টীম যাবে। ওষুধ পথ্য নিয়ে।"

"তুমি নও, তোমার মাতাজী?" পাকড়াশী হাসে। "তিনি কি জানতেন না যে ওদের কর্তব্য রিলিফের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের পায়ে ধরে সাধা? দেখছেন না কি যে অভ্ বেঙ্গল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের মিত্রপক্ষে। নইলে এমন সময় সাইক্লোন হবে কেন? সমুদ্রের জল এসে রাজদ্রোহীদের ঘরবাড়ী গোরুবাছুর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কেন? ক্ষেতখামার ডুবিয়ে দিয়ে যাবে কেন? যেমন কর্ম তেমন ফল। মাতাজীকে সতর্ক করে দিয়ো। নইলে নোয়াখালী।"

নোয়াখালী বদলীকে সবাই ডরায়। ইংরেজরাও। গত শতাব্দীতে ইংরেজ সিভিলিয়ান পেনেলকে মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে

নোয়াখালীর জেলা জজ করে পাঠানো হয়েছিল। পেনেল তার প্রতিশোধ নেন ইংরেজ পুলিশ সাহেবকে পরোয়ানা দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, তার রায়ে মুসলিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া সমালোচনা করে আর বেঙ্গল গভর্নমেণ্টকে এক হাত নিয়ে। জজ তাঁর রায়ে কী লিখবেন তা নিয়ে শাস্তিবিধানের কোনো রাস্তা নেই। বরখাস্ত করা যায় না। বদলী করলে কোথায়ই বা করা হবে? রায়টা কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে যায়। সরকার ফাঁপরে পড়েন। ছুটি না চাইলে ছুটি নিতে বাধ্য করাও যায় না। শেষে গেলেন তিনি বিলেত। নির্বাচন জিতে হলেন পার্লামেণ্টের মেম্বর। সরকারের শ্রাদ্ধ করলেন।"

## ॥ তেইশ ॥

মানসের টেনিস খেলার সাথী এক প্রতিবেশী কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবার সময় তাঁর রেডিওটা মানসের কাছে রেখে যান। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে সে একদিন হঠাৎ শুনতে পায়, "আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি।"

শুনে চমকে ওঠে। বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আরেকটু শোনার পর বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। "আমি ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে যেমন করে চলে এসেছি তেমনি করেই একদিন ফিরে যাব।"

"জুঁই! জুঁই! শীগগির! শীগগির!" কিন্তু মানসের ডাক শুনে জুঁই ছুটে আসার আগেই কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে যায়।

"সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নয়। তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ। কৌতুকমিশ্রিত। একটা বেপরোয়া ফুর্তির ভাব। যেন জীবনমরণ পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" মানস আবেগের সঙ্গে বলে।

"তারুণ্যের প্রতিমূর্তি!" হতচকিত ভাবটা কেটে গেলে যূথিকা বলে।

"মূর্তিমান বিদ্রোহ! কিন্তু কথা হচ্ছে উনি এ দেশ থেকে পালাবার পথ পেলেন কী করে? আমি তো ভেবে পাইনে কোন্ পথে আর কোন্ যানে। পালিয়ে যদি বা গেলেন ফিরে আসবেন কোন্ পথে আর কোন্ যানে? কোনো গতিকে বার্মায় যদি পৌঁছতে পারেন তা হলে অবশ্য সাম্পানে করে আকিয়াব থেকে চট্টগ্রামে আসা যায়।" মানস স্বীকার করে।

"আলনস্করের স্বপ্ন !" যুথিকা হেসে উড়িয়ে দেয়। "ওঁকে না চেনে এমন লোক ভারতে নেই। কেউ না কেউ চিনতে পেরে ধরিয়ে দেবে। তখন সর্বনাশ! মিলিটারি ট্রাইবিউনাল। বিচারের প্রহসন। ফায়ারিং স্কোয়াড। চিতাভস্ম ওঁর আত্মীয়দের হাতে সমর্পণ। খবরের কাগজে ঘুণাক্ষরেও বেরোবে না। তা সত্বেও যদি জানাজানি হয়ে যায় নিষ্ফল আন্দোলন। বড়ো জোর আর কিছু ভাঙচুর হবে। আরো কিছু আগুন লাগানো। তাতে কি মানুষটাকে ফিরে পাওয়া যাবে? সুভাষচন্দ্র যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। এখন আমার এই বার্তা আমি তাঁর কাছে পাঠাই কেমন করে?" যুথিকা প্রশ্ন করে।

"কোনো উপায় নেই। কেউ তাঁর ঠিকানা জানে না। সে ঝুঁকি তিনি নেবেন কেন? তা নয়। তিনি বোধহয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সদলবলে আসবেন। দু'পক্ষেই গুলী চলবে। আর একটা পলাশীর যুদ্ধ। এবার ক্লাইভের হার। সিরাজের জিৎ। সিরাজের পদেই সুভাষ। দেশশুদ্ধ ভেঙে পড়বে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। ইংরেজই পালাবার পথ পাবে না। কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ভাবছ এটা আমার কবিকল্পনা! আমি তো মনে করি সুভাষচন্দ্রের জন্ম পলাশীর কলঙ্ক মোচন করতে। ওই যে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ ওটা সেইদিকেই প্রথম পদক্ষেপ। দেখবে মুসলমানরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে কাতারে কাতারে। পাকিস্তানের আকাশকুসুম আকাশে মিলিয়ে যাবে।" মানস স্বপ্ন দেখে।

"তুমিই একালের আলনস্কর!" যুথিকা হেসে কুটি কুটি হয়।

রেডিওটা যথাকালে যথাস্থানে ফেরৎ যায়। কথাটা চাপা থাকে।

এর পরে একদিন লণ্ডন থেকে দত্তবিশ্বাসের চিঠি আসে। মানসের নামে। তার খামের ভিতর এক টুকরো চিরকুট। সেটা মিলির লেখা। যুথিকার নামে। সুকুমার লিখেছে, "এখানে গান্ধীজীর নাম এখন কাদা। জনমত তাঁর উপর বিষম ক্ষিপ্ত। অমন বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কেউ বা বলে, 'পরম ভণ্ড মহা ষণ্ড জপে হরির মালা।' কেউ বা বলে, 'ব্যাটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' যাঁরা অতটা উগ্র নন তাঁদের মতে গান্ধী লোকটা শতকরা পনেরো ভাগ সন্ত, পনেরো ভাগ বুজরুক, সত্তর ভাগ তুখোড় রাজনীতিক। কংগ্রেস নেতারা তো পথে আসছিলেনই, ওঁদের বিপথগামী করেছে কে? ওই তথাকথিত মহাত্মা। যাঁরা আদৌ উগ্র নন তাঁরা মনে-

করেন গত মহাযুদ্ধে লেনিনের যে ভূমিকা ছিল এই মহাযুদ্ধে গান্ধীরও সেই ভূমিকা। তিনি ক্ষমতা হাতে পেলে জাপানের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করবেন। তিনি ভারতের জন্যে চান শান্তি। এদেশে একদল প্যাসিফিস্টও আছেন। তাঁরা বলেন, শুধু ভারতের জন্যে শান্তি কেন? বিশ্বের জন্যে শান্তি। যুদ্ধের মতো শান্তিও অবিভাজ্য। ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বাকী পৃথিবীতেও শান্তি প্রসারিত হবে। তবে এঁরা মুষ্টিমেয়। কেই বা শোনে এঁদের কথা! খবরের কাগজগুলো একধার থেকে যুদ্ধবাদী। ব্যতিক্রম যে দুটি একটি তারা এই যুদ্ধের গর্ভ থেকে সমাজবিপ্লব ভূমিষ্ঠ হবে বলে এর সমর্থক। ইউরোপের অন্যান্য দেশে তো বটেই। এমন কী, শিব ঠাকুরের আপন দেশেও বিপ্লব না হোক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। রক্ষণশীলরা ভোটে হারবে। শ্রমিকরা জিতবে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, মল্লিক। চার্চিলের প্রেস্টিজ ডিউক অভ মার্লবরার চেয়ে কম কিসে? একই বংশ, একই রক্ত। চার্চিল অবশ্য কমন্স সভার সদস্যপদ ছাড়বেন না। নইলে তাঁকে ডিউক করতে রাজা সহজেই রাজী হতেন। আজকাল লর্ডস সভার সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয় না। নইলে তিনি ডিউক অভ ওয়েলিংটনের মতো ডিউকও হতেন, প্রধানমন্ত্রীও হতেন। এক শতাব্দীর মধ্যে চার্চিলের মতো প্রতাপশালী তথা জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আর হননি। যুদ্ধোত্তর সাধারণ নির্বাচনে তিনিই তাঁর দলটিকে জিতিয়ে দেবেন, নিজেও জিতবেন, তার পর আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। তা হলে ভারতের কী আশা? আমি শুধু নই, ভারতপ্রেমিক ইংরেজরাও সবাই হতাশ। স্বাধীনতা নৈব নৈব চ। তবে মুসলিম লীগ তথা রাজন্যবর্গ যদি সম্মত হন তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে। স্বায়ত্ত-শাসন, স্বাধীনতা নয়। ইংরেজরা শব্দের উপর অশেষ গুরুত্ব দেয়।"

মলি তার সংসারের সমাচার ও পুত্রের বর্ণনা দিয়েছে। আর লিখেছে, "জানো, চন্দ্র বোসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি এখন বার্লিনে। বেতারে তাঁর ভাষণ মনিটর করা গেছে। কর্তারা আগে থেকে টের পেলে জ্যাম করতেন। ওটা কোনো নাম করা স্টেশন থেকে নয়। সুভাষচন্দ্রের ঘোষণা থেকে মনে হয় তিনি বেশীদিন সবুর করবেন না। গান্ধী, নেহরু প্রভৃতির অনুপস্থিতির দরুন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা পূরণ করতে ছুটে যাবেন। সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্যদল। রাজনীতি একদম নয়া মোড় নেবে। এবার আসছে নয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সেনাপতিত্বে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র

নিয়ে যুদ্ধ। যেটা হওয়া উচিত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আমেরিকানরা যদি ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে থাকে তো ভারতীয়রাই বা জাপানীদের সাহায্য নেবে না কেন? প্রকারান্তরে ইংরেজরা কি রাশিয়ানদের মদত নিচ্ছে না জার্মানদের বিরুদ্ধে আজকের এই যুদ্ধে? স্টালিন কমিউনিস্ট বলে যদি মহা বাইবেল অশুদ্ধ না হয় তবে তোজো ফাসিস্ট বলে কেন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?"

চিঠিখানা পড়তে দেওয়া হয় ভবতোষবাবুকে। ইতিমধ্যেই তিনি যুথিকাকে দিয়ে লিখিয়েছেন ও সে লেখা ছাপিয়েছেন। সেটা তার হাতে খড়ি। আর মানসের বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে অগ্রিম সমালোচনা করেছেন। ওরা মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত্ত্ব নেয়।

চিঠিখানা পড়ে তিনি ভেবে চিন্তে মত দেন। "গান্ধীজার নৈতিক জয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। বিবেকচালিত আপত্তিকারীরা নানা দেশে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেও গান্ধী নেতৃত্বে ভারতের মতো আর কোনো দেশে হাজারে হাজারে ও কাতারে কাতারে নয়। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড। সারা বিশ্বের সব মানুষ এর জন্যে গর্ব অনুভব করতে পারে। ভারতীয় হিসাবে আমারও উচ্চতা এক ইঞ্চি বেড়ে গেছে। নিরস্ত্র পরাধীন দেশ এর চেয়ে উচ্চ হতে পারত না, সেদিক থেকে এটা একটা কীর্তি। কিন্তু আমার মনে কোথায় খটকা বাধছে, বলব? কংগ্রেসকর্মীদের বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেননি, রেল লাইন ভাঙতে, টেলিগ্রাফের তার কাটতে, সাঁকো উড়িয়ে দিতে, থানা চড়াও হতে জনতাকে শিক্ষা দিয়েছেন। জনতাও উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গিয়ে খুনখারাপি করেছে। রেল স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। অস্ত্র শস্ত্র লুট করেছে। এতে অহিংসার মহিমা রাহুগ্রস্ত হয়েছে। হিংসার সম্মোহন দুর্বার হয়েছে। আবার সেই এণ্ডস জাস্টিফাই মীন্স। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে সাত খুন মাফ। সেদিক থেকে আমরা গান্ধীপূর্ব যুগে ফিরে গেলুম। এটা একটা সুলক্ষণ নয়। একদিন হয়তো এরাই গৃহযুদ্ধ লড়বে আপনার লোকের সঙ্গে অহিংস উপায়ে নয়, সহিংস উপায়ে। কে শুনবে গান্ধীজীর বাণী, অনুসরণ করবে মহাত্মার আদর্শ? জিন্না এখন পর্যন্ত আসরে নামেননি। অপেক্ষা করছেন। তিনি ভায়োলেণ্টও নন ননভায়োলেণ্টও নন। তিনি কনস্টিটিউশন সম্মত উপায়ে বিশ্বাসী। তিনি যদি একদিন হতাশ হয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বিপরীত উপায় অবলম্বন করেন তবে তাঁর অনুগামীরা উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গিয়ে হিংসায় উন্মত্ত হতে পারে।

ইংরেজ না থামালে কে তাদের থামাবে? ইংরেজই বা থামাতে যাবে কেন, তাদের যদি ভারত ছাড়তে হয়? আর তাদের যদি ভারতে থাকতে অনুরোধ করা হয় সেটা রাজনৈতিক পরাজয়। আজকের দিনে আমরা যা করছি তার দ্বারা কালকের দিনের ইতিহাস নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে।"

মানস ও যূথিকা স্তব্ধ হয়ে শোনে। তাদের মুখ দেখে সম্পাদক মহাশয় আরো দু' চার কথা বলেন। "আমি ডিটারমিনিজমে বিশ্বাস করিনে। ইতিহাস আপনা হতে কিছু করে দেয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনা হতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় না। প্রকৃতির থেকে আলাদা করে মানুষের জগতের কথা ভাবলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে মানুষই তার অতীত কর্মের ফল ভোগ করে, বর্তমান কর্মের ফলও ভোগ করবে। তা সে ভালো মন্দ যাই হোক। ভোগ বলতে দুঃখভোগও বোঝায়। স্বরাজ হাতে পেলেই স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল এটা ভ্রম। নরকও হাতে পাওয়া যেতে পারে। ভুলের মাশুল দিতে হবেই। কেউ কেউ মনে করেন ক্রিপস প্রস্তাব স্বর্গ এনে না দিলেও নরক ডেকে আনত না। তাদের মতে সেটা প্রত্যাখ্যান করা ভুলই হয়েছে। আমি এ বিষয়ে 'হ্যাঁ' কি 'না' বলিনি। আজকেও বলতে পারব না। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।"

এর পর অন্য প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ।

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "সে কী! আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন কোথায়? যেখানে সন্ধ্যা হলেই বাঘের ভয়। সেই ভয়ে চারদিক অন্ধকার। কে জানে কোন্‌দিন হানা দেবে? শেয়ালের মতো গর্তে ঢুকতে হবে।"

তিনি সহাস্যে বলেন, "একটা কি দুটো বোমা তো কলকাতার মতো মহানগরীর সব ক'টা বাড়ীর উপর পড়বে না। আমার বাড়ীর উপর না-ও পড়তে পারে। শেয়ালের মতো গর্তে ঢুকতে গেলে দেখব সেখানে শেয়ালের ভিড়। এক একটা গর্ত যেন এক একটা অন্ধকূপ। সেই অন্ধকূপ হত্যার মতো ব্যাপার হবে। তার চেয়ে ঘরে বসে মরাই ভালো। বয়স তো হলো বড়ো কম নয়। আমার সহধর্মিণী আমার পূর্বেই স্বর্গে চলে গেছেন। আমিই বা আর কদ্দিন? আমিও স্বর্গের জন্যে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি।"

"এটাও তো আপনার নিজের বাড়ী। এখানে এমন কী অসুবিধে? আর ওখানে এমন কী সুবিধে?" মানস প্রশ্ন করে।

"আমাকে তো এই বয়সেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার রুটি অর্জন

করতে হয়। আমি তো পেনসন পাইনে। কলকাতায় আমি কেবল সম্পাদকীয় লিখিনে। সহকারীদের কাজকর্মও দেখি। স্বত্বাধিকারী তো আমিই। ম্যানেজমেণ্টও দেখাশুনা করতে হয়। নইলে কাগজ কবে উঠে যেত। তা ছাড়া আমার স্ত্রী না থাকলেও পরিবার আছে। রোজ আমার নাতি নাতনির সঙ্গে খেলা করি। সেটাই আমার একমাত্র বিনোদন। সেটা এখানে কোথায়? বড়ো বৌমা কত যত্ন করে আমার জন্যে রোজ কিছু না কিছু রাঁধেন। তা ছাড়া আমার পারিবারিক ডাক্তার তো এখানে থাকেন না। এখানকার এঁরাও সুচিকিৎসক। কিন্তু আমার শরীরটাকে তো চেনেন না। চিনলে অন্য রকম প্রেসক্রিপশন দিতেন। তারপর আমি একজন সামাজিক মানুষ। সপ্তাহে একদিন সমাজের মন্দিরে গিয়ে উপাসনায় যোগ দিই। মাঝে মাঝে আচার্যের স্থান পূরণ করি। বিবাহসভায় বা শ্রাদ্ধসভায়ও আমার ডাক পড়ে আচার্য হতে। আমি সাড়া না দিয়ে পারিনে। ওটাও আমার আর এক কর্তব্য। এখানে আমি আমার সেইসব কর্তব্য সম্পাদন করতে পারিনে। তেমন উপলক্ষও জোটে না।" তিনি উত্তর দেন।

"কিন্তু সাহিত্যিক কর্তব্যের উপলক্ষও তো জোটে। সাহিত্যসভায় তো ডাক পড়ে। এখানে আপনাকে কে না চায়? পায় না এই যা দুঃখ।" মানস বলে।

"কলকাতার মতো নয়। সেখানে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা বাস করেন। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যালাপ হয়। এখানে আমি সভাপতিত্বই করতে যাই, আলাপ করতে নয়। কার সঙ্গে আলাপ করব? মাফ করবেন। আপনাকে বাদ দিয়েই বলছি। দু'জন কি একজন আছেন পুরাতন সাহিত্যিক। তাঁরা সভায় যান না। আমিই তাঁদের বাড়ী যাই। তারা আধুনিক সাহিত্যের হালচাল জানেন না। প্রাচীন সাহিত্যে আমারও তেমন জ্ঞান নেই। প্রবন্ধ পেলে ছাপি। কলকাতায় একটা আধুনিকতার হাওয়া আছে। এখানে তা নেই। দু'দিনে হাঁফ ধরে যায়। আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। তবে এখনো দিনক্ষণ স্থির হয়নি। হলে আপনাদের খবর দেব। বাড়ী গিয়ে বিদায় নেব।" তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

"আপনি একদিন আমাদের সঙ্গে শাকভাত খাবেন। নিমন্ত্রণ রইল। আমি নিজে রান্না করে খাওয়াব।" যুথিকা আমন্ত্রণ করে।

"আচ্ছা, আমি খুশি হয়ে খাব।" তিনি কথা দেন। "আমি কিন্তু মাছমাংস খাইনে। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে খাইনি।"

নৈশভোজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে মানসের ওখানে উপস্থিত হন ভবতোষবাবুর পুত্র পরিতোষবাবু। কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর বলেন, "এসেছি বাবার হয়ে ক্ষমা চাইতে। কালকের মধ্যেই তাঁকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে, কারণ পরশু সকালেই তাঁর ট্রেন। নিমন্ত্রণরক্ষার জন্যে সময় কোথায়? তবে আপনারা যদি দয়া করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি দু'চার কথা বলার জন্যে সময় করে নেবেন।"

যূথিকা মানসের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হয়ে যায়। এরপর পরিতোষবাবুর আপ্যায়ন ও সেইসঙ্গে মানসের সঙ্গে কথোপকথন।

"আপনারা কি মনে করেন কলকাতা এখন নিরাপদ? জাপানীরা আর বোমা বর্ষণ করবে না? ইংরেজরা ওদের খোঁচাবে না?" মানস সুধায়।

"কার মনে কী আছে কেমন করে বলব? তবে যতদূর অনুমান করতে পারছি ওদের লক্ষ্য ভারত নয়, চীন। চীনকে ওরা ভারত থেকে সাহায্য পাঠাতে দেবে না বলেই বার্মা দখল করেছে। বার্মা ভিন্ন আর তো কোনো স্থলপথ নেই। তাই যদি হয়ে থাকে তবে বার্মা রোড পাহারা দেওয়াই তাদের লক্ষ্যভেদের সহায়ক। ভারত আক্রমণ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে যাবে কেন? তা ছাড়া কংগ্রেসই যখন ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত তখন ভারত আক্রমণ করে কংগ্রেসকে ইংরেজের কোলে ঠেলে দেওয়া কেন? হ্যাঁ, ইংরেজে কংগ্রেসে কোলাকুলি হতে পারে। ক্রিপস প্রস্তাব যদি সংশোধিত হয়। যদি দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যে কোনো একজন ভারতীয় নাগরিককে যুদ্ধ দফতর পরিচালনার ভার দিলেই চলবে। কংগ্রেস নিজের জন্যে সেটা চাইবে না। জিন্না সাহেবকে যদি দেওয়া হয় তা হলেও কংগ্রেস সহযোগিতা করবে। কংগ্রেস জাপানের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত ছিল। ইংরেজের সঙ্গে নয়। কিন্তু চার্চিলের অনড় মনোভাবের জন্যেই তো মোড় ঘুরে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থায় কংগ্রেসকে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হলো। আর একটা মাস। আর একটা মাস সময় পেলেই রাজশক্তিকে দেখিয়ে দিত ভারতের প্রজাশক্তি কেমন দুর্জয়। এরোপ্লেন থেকে মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করে ভারতীয়দের মেরেছে কারা? জাপানী না ইংরেজ? কংগ্রেস পক্ষের নিরক্ষর জনতা যদি বাড়াবাড়ি করেই থাকে তবু মোটের উপর তারা নিরস্ত্র। তোমরা সশস্ত্র। তোমরাও কি বাড়াবাড়ি করলে না? ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা আপস করতে আরো পেছপাও হবে। নয়তো বামপন্থীরা কংগ্রেস থেকে তাদের

হটাবে। তাদের মেজরিটি থাকবে না। স্বয়ং গান্ধীজীও তাদের জিতিয়ে দিতে পারবেন না। তেমন করতে গেলে তাঁর নিজের জনপ্রিয়তা হারাবেন। তাঁর এতকালের নেতৃত্ব চলে যাবে। বড়ো আপসোসের কথা সুভাষচন্দ্র এখন আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে বিকল্প নেতৃত্বের জন্যে ভাবতে হতো না। হয়তো তিনিই আবার কংগ্রেসে মেজরিটি পেতেন। 'হয়তো' বলছি এইজন্যেই যে সেবারকার মতো এবার বামপন্থীরা সবাই একজোট নন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁদের কাছে আগে রাশিয়া, তারপরে ভারত। আগে রাশিয়া নাৎসীমুক্ত হবে, তারপরে ভারত ব্রিটিশমুক্ত হবে। এটা মেনে নেওয়া অন্যান্য বামপন্থীদের পক্ষে অসম্ভব। এদের কাছে আগে ভারতের স্বাধীনতা, তারপরে রাশিয়ার বিপ্লবের সহায়তা। বিপ্লবের প্রতি তাদের অনুরাগ কারো চেয়ে কম নয়। তারাও বিপ্লবী। কিন্তু যেদেশ স্বাধীন নয় সেদেশে বিপ্লব হয় না।" পরিতোষবাবু চা খেতে খেতে বলেন।

"সমাজবিপ্লব হয় না।" মানস সংশোধন করে। "কিন্তু অন্যরকম বিপ্লব তো হতে পারে। আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামকেও আমেরিকান রেভোলিউশন বলা হয়। ওদেশে একটি সংস্থা আছে, তার নাম 'ডটার্স অফ দ্য রেভোলিউশন'। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

"শুনেছি বইকি। ওর মতো প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা ওদেশে আর নেই। ধনতন্ত্রের একটি স্তম্ভ।" পরিতোষবাবুর মতে।

"এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হলে এদেশেও সেইরকম একটি সংস্থার উদ্ভব হতে পারে। আমাদের জুলিও হতে পারে তার একজন পাণ্ডা।" মানস হাসে।

"জুলিটি কে?" কৌতূহলী হন পরিতোষবাবু।

"কেন, সেদিন তো আরতিদি বলে গেলেন জুলি তাঁর বিনু মাসীর মেয়ে। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকে। শুনছি ধরা পড়ে জেলে গেছে। আপনার কাছেই তো আশা করছি সঠিক খবর।" মানসও কৌতূহলী।

"আমি অত খোঁজখবর রাখিনে। রাখলে আপনাকে জানাতুম। তবে, হ্যাঁ, ওঁরা ধনতন্ত্রের সমর্থক। জুলি নিজে কি না, বলতে পারবে না। ওর কমিউনিস্ট কমরেডদের সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। জুলি এখন স্বাধীনতার

জন্যে লড়ছে। অরুণা আসফ আলীর মতো। উনিও এখন কলকাতায়। হ্যাঁ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকেই উনি যা আগুন ছড়িয়ে চলেছেন তা নেবানো দমকলের অসাধ্য। এ. আর. পি'র অসাধ্য। কে জানে জুলির সঙ্গে হয়তো ওঁর যোগাযোগ আছে। স্বাধীনতার পর এঁরা কে কোন্ পথে যাবেন এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতা হচ্ছে কী করে, বুঝতে পারছিনে। বামপন্থীরা দলে ভারী ছিল কমিউনিস্টরাও দলের সামিল ছিল বলেই না। নইলে সুভাষচন্দ্র কি ভোটে জিততেন? এখন তো সেই জোটবল নেই, সেই ভোটবল নেই। দক্ষিণপন্থীরা আপস করলে তাদের ভোটের জোরে হারাবে কে? আপস করে যদি আন্দোলন থামিয়ে দেন একে চালিয়ে নেবার সামর্থ্য কি জয়প্রকাশের কি অরুণার আছে? এই সাড়ে চার মাসের মধ্যেই আন্দোলনের মোমেণ্টাম ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কেউ কেউ নেপালে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু সেখান থেকে আন্দোলন চালানো আরো কঠিন হবে। তার চেয়ে জেলের ভিতর থেকে চালানো তত কঠিন নয়। জেলের ভিতর থেকে চিঠি চালাচালি অনবরত চলেছে। ওয়ার্ডারদের যোগসাজশে। ব্যতিক্রম অবশ্য গান্ধীজী যেখানে বন্দী আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যেখানে বন্দী বা নির্বাসিত বা ভারতের বাইরে প্রেরিত।" পরিতোষবাবু বলেন।

"এখন ওরা কোথায়?" মানস বোকার মত প্রশ্ন করে।

"দ্যাট ইজ মোর দ্যান আই ক্যান টেল ইউ।" তিনি ইংরেজীতে উত্তর দেন। তারপর বলেন, "প্রত্যেকটি কাগজের উপর নির্দেশ ফাঁস করেছ কি মরেছ। কোনো পত্রিকারই সাহস নেই। না নিউজ এজেন্সীর। নইলে আমেরিকানরা এতদিনে প্রকাশ করে দিত। হ্যাঁ, আমরা আমেরিকা থেকেও পত্রিকা পাই। বিলেত থেকে তো বটেই। ত্রিশ বছর হলো পেয়ে আসছি। আমরাও পত্রিকা পাঠাই। এমন গোপনীয়তা কোনো বারেই দেখা যায়নি। ওঁদের কুৎসা প্রচার সমানে চলেছে, অথচ ওঁদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অপরাধ যদি করে থাকেন তো আদালতে বিচার হোক। এমন কি, মিলিটারি ট্রাইবিউনালে। এটা কি রকম ব্রিটিশ জাস্টিস, বলুন তো জজ সাহেব?" পরিতোষবাবু পরিহাস করেন।

মানস লজ্জিত হয়ে বলে, "না, এটা ক্রিকেট নয়।"

"ইংরেজরা কত নিচে নেমে গেছে, দেখুন। ওরা বরং ওদের চিরশত্রু

স্টালিনের সঙ্গে ভাব করবে, তবু ওদেরই একজন যিনি, তাঁর সঙ্গে নয়। আমি কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন ?" তিনি রসিকতা করেন।

"নেহরুর কথা। এটা সহজেই বোঝা যায়। হ্যারো আর কেমব্রিজ। কত ভালো ইংরেজী লেখেন। পড়ে সুখ আছে।" মানস প্রশংসা করেন।

"গান্ধীজী আবার ওঁকেই ওঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। বেচারা উত্তরাধিকারীর একেবারেই ইংরেজের সঙ্গে লড়তে ইচ্ছে ছিল না। তার মহাশত্রু হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি ফাসিস্ট। ওঁকে শুধু ইংরেজ নয়, মার্কসিস্টও বলা যায়। ক্ষমতা হাতে পেলে ওঁর প্রথম কাজই হতো চার্চিলের সাথী হয়ে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। দ্বিতীয় কাজ হতো চীনদেশে গিয়ে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে মাও ৎসে-তুঙ্গের মিলন ঘটানো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওঁর মতো যোগ্যতা আর কার কাছে ? বড়লাট তবু পররাষ্ট্র দফতর কিছুতেই ওঁকে দেবেন না। ক্রিপস প্রস্তাব বানচাল করার পেছনে বড়লাটেরও হাত ছিল।" আপসোস করেন পরিতোষবাবু।

মানসও জানত যে জবাহরলাল একান্ত অনিচ্ছুক সত্যাগ্রহী। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মিত্র হিসাবে যুদ্ধে নামতে, তাঁবেদার হিসাবে নয়। কিন্তু এমনি ইংরেজদের জেদ যে ওরা দাবী করেছে ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসাবে লয়ালটি, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে মিত্রতা নয়। সুতরাং একজন অনারেবল ম্যানের কর্তব্য অসহযোগ করা। আমিও ব্রিটেনে থেকেছি, গত মহাযুদ্ধের সময় ছাত্রহিসাবে। আমিও তখন সাহায্য করেছি। আমিও এই যুদ্ধে ওদের পক্ষে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। ওদেশের পীপলের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ বা অভিমান নেই। ওরা সত্যিই ভালো। যত দোষ ওদের সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের। ওরাই তো এদেশে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি চালিয়ে হিন্দু মুসলমানের মনে এমন বিষ ঢুকিয়েছে যে ওদের গুরুমারা চেলারা শেষে হাঁকে কিনা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। লক্ষ করেছেন এই আন্দোলনে মুসলমানরা আগের মতো যোগ দেয়নি। ব্যতিক্রম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান। আন্দোলনের ফলাফল যাই হোক একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কংগ্রেস আটটা প্রদেশে আগের মতোই প্রভাবশালী। অধিকন্তু পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব পাঞ্জাবে। বাকী অংশে কংগ্রেস অত্যন্ত দুর্বল। মুসলিম জনতার দুর্বলতার

পূর্ণ সুযোগ নিলে আশ্চর্য হব না। ইংরেজরা করতেও পারে ভাগ আর ত্যাগ।" পরিতোষবাবু শঙ্কিত।

"সেটা তো যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে নয়। তার এখনো ঢের দেরি। যুদ্ধে জয় পরাজয় সমান অনিশ্চিত। কত কী ঘটতে পারে! সুভাষ বোসকে কেউ গণনার মধ্যে ধরছে না। গান্ধীজীর দম ফুরিয়ে আসছে, সুভাষের দম ফুরোয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?" মানস তর্ক করে।

"সে রকম কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। আমি ওটাকে সীরিয়াস মনে করিনে। সিপাহীদের রেজিমেণ্টগুলো সাম্প্রদায়িক নামে নামাঙ্কিত। অসাম্প্রদায়িক রেজিমেণ্ট একটাও নেই। ওরা কি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বে না পরস্পরের বিরুদ্ধে? ইংরেজরা দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে গর্ভের ভিতরেই বিনাশ করে রেখেছে। ওকে ওরা ভূমিষ্ঠ হতে দেবে না। ওটা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করবে। তেমনি বিপথগামী করবে জার্মান বা জাপানীদের সঙ্গে জোট বাঁধা।" পরিতোষবাবুর বিচারে।

পরের দিন মানস ও যূথিকা ভবতোষবাবুকে বিদায় দিতে যায়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা একটা সামাজিক অপরাধ। কিন্তু কাল সকালে কলকাতার ট্রেন ধরতে হলে আজ সন্ধ্যাবেলা কোথাও যাওয়া চলে না। অনেকেই আসছেন দেখা করতে।"

যূথিকা কলকাতায় তাঁর নিরাপত্তার জন্যে উদ্বিগ্ন। "এই যে আপনি জাপানী বোমাকে উপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে?"

তিনি স্নিগ্ধ হেসে বলেন, "আমার তো এমনিতেই যাবার বয়স হলো। মানে পরপারে। দু'দিন আগে গেলে এমন কী তফাৎ? লোকের ধারণা আমি জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। সেটা অর্ধ-সত্য। বাকী আধখানা হচ্ছে আমি সেই অজুহাতে কিছুদিন নিভৃতে বাস করতে চেয়েছি। আমি সাময়িকপত্র সম্পাদন করি, সাময়িককে নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে মানব অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই যে এত লক্ষ মানুষ দেশের নামে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে এরা কি মৃত্যুর পরেও জার্মান বা জাপানী বা ইংরেজ বা মার্কিন বলে পরিচয় দিতে পারবে? ওপারে কি কেউ চিনতে পারবেন এরা কোন্ দেশের মানুষ? মানুষ বলেই চিনবে কিনা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। মৃত্যুর পূর্বে তুমি জার্মান,

মৃত্যুর পরে তুমি কেউ নও। তুমি যা তোমার শত্রু রাশিয়ানও তাই। আমি চেষ্টা করছি দার্শনিকের চোখে দেখতে। আমার চোখে হারজিৎ দুই সমান। জার্মান ইটালিয়ান জাপানী শিবির জিতলে যে মানবজাতির সর্বনাশ হবে আর ইঙ্গ মার্কিন রুশ শিবির জিতলে যে সর্বলাভ তা আমার বিশ্বাস হয় না। সব যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। এই যুদ্ধেও কোনো এক পক্ষ জিতবে ও কোনো এক পক্ষ হারবে। তাতে সমগ্র মানবজাতির কি এল গেল? একজন ভারতীয় হিসাবে নয়, একজন মানুষ হিসাবে এই আমার জিজ্ঞাসা। সেই যে একটা কথা ছিল পশু যেমন বিবর্তনের সোপান বেয়ে ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়ে উঠেছে তেমনি মানুষও ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে উঠবে, সেই কথাটা কি সত্য? আপনাদের কি মনে হয় একটার পর একটা মহাযুদ্ধে মারতে মারতে ও মরতে মরতে মানুষ ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে উঠছে? না অসুর হয়ে উঠছে? না নেমে গিয়ে আবার পশু হচ্ছে? শেষে কি ডাইনোসরের মতো নির্বংশ হবে?"

মানস যূথিকার দিকে তাকাতেই সে ফিক করে হাসে। "দেবতা হয়ে উঠছে না তো কী? চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নন?"

ভবতোষবাবুর মতো গম্ভীর মানুষও হেসে ওঠেন। মানসের দিকে তাকান।

"তা যদি বলো তবে ওডিন, থর, ফ্রিগ এঁরাও তো দেবতা। ফ্রিগ হলেন ওডিনজায়া। টিউটনদের এই তিন দেবতার নাম এখনো বহন করছে ওয়েনসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। হপ্তার পর হপ্তা আমরাও এঁদের নাম করি। ইদানীং জার্মানীতে এঁদের যুগ ফিরে আসছে। নাৎসীরা প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনছে।" মানস বলে।

ভবতোষবাবু চমকে ওঠেন। "তার মানে কি জার্মানী থেকে খ্রীস্টধর্ম উঠে যাবে? হিটলারের জয় বলতে কি এত বড়ো বিপর্যয় বোঝায়?"

"স্টালিনের জয় হলে জার্মানী থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসই উঠে যাবে। যেমন উঠে গেছে রাশিয়া থেকে। যুদ্ধ ব্যাপারটা শুধু মানুষের মরণ বাঁচনের প্রশ্ন নয়। ধর্মেরও, মতবাদেরও, গভীরতম বিশ্বাসেরও ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রশ্ন।" মানস উত্তর দেয়।

ভবতোষবাবু স্বীকার করেন যে যুদ্ধে হার জিৎ মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।

## ॥ চব্বিশ ॥

এর পরে একদিন সাত সকালে রায় বাহাদুর এসে উপস্থিত। "আপনাকে এত সকালে বেরোতে দেখিনে। ব্যাপার কী, রায়বাহাদুর?"

"কী খাওয়াবেন, বলুন।" রায় বাহাদুর আসন নিয়ে বলেন, "বি. বি. সি'র খবর। স্টালিনগ্রাডে জার্মান সেনা আত্মসমর্পণ করেছে। বন্দী হয়েছে সেনাপতি সমেত একানব্বই হাজার সৈনিক।"

"কী আনন্দ! কী আনন্দ!" মানস যূথিকাকে ডেকে শোনায়।

"আপনার তো আনন্দ। আমার যে নিরানন্দ। কালকেই জামাই এসে হানা দেবে। আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবে। নাতি নাতনী সমেত। স্টালিনগ্রাডের পরাজয়ের পর জার্মানীর মিতা জাপান আর এদিকে পা বাড়াবে না। কলকাতা নিরাপদ। কী জানি, বাপু!" তাঁর প্রত্যয় হয় না।

"এই তো সেদিন ভবতোষবাবু কলকাতা ফিরে গেলেন। নিরাপদ না হলে কি যেতেন? তবে কেউ জোর করে বলতে পারবে না যে আর কখনো বোমা পড়বে না। ব্ল্যাক আউট বহাল থাকবে।" মানস যতদূর আন্দাজ করতে পারে।

যূথিকা চা করে এনেছিল। মানস বলে, "আসুন, একটু সেলিব্রেট করা যাক।"

"কেন, আপনি কি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট?" রায় বাহাদুর রসিকতা করেন।

"রুজভেল্ট, চার্চিল কি কমিউনিস্ট? অত বাছবিচার করলে কি যুদ্ধ জেতা যায়? স্টালিনগ্রাডে হিটলারের পরাজয় তাঁদেরও জয় সূচনা করছে। তাঁরা এবার দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার তোড়জোড় করবেন। স্টালিনগ্রাড একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই প্রথমবার হিটলারকে হার মানতে হলো। না, আমি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট নই। আমি নন-কন্‌ফর্মিস্ট। যেমন ধর্মে, তেমনি সমাজে, তেমনি সাহিত্যে, তেমনি রাজনীতিতে, তেমনি মতবাদে। তবে সরকারী চাকরিতে কন্‌ফর্ম করতেই হয়। নয়তো চাকরি ছাড়তে হয়। সেইজন্যেই পালাতে চাই।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"তা হলে আপনার বিয়ে না করাই উচিত ছিল। পুত্রকন্যার পিতা হওয়া তো একেবারেই অনুচিত।" তিনি সহাস্যে বলেন।

মানসও হাসতে হাসতে বলে, "নারীই হচ্ছে পুরুষের শক্তি। শিবের শক্তি যেমন পার্বতী, নারায়ণের শক্তি যেমন লক্ষ্মী, রামের শক্তি যেমন সীতা, কৃষ্ণের শক্তি যেমন রাধা, মানসের শক্তি তেমনি যূথিকা।"

"শিবপার্বতীর যেমন কার্ত্তিক গণেশ" বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠরোধ হয়। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "কালিদাস একটা মহাকাব্যই লিখে ফেলেন কুমারকে সম্ভব করতে গিয়ে। নইলে সেকালের স্টালিনগ্রাডে সেকালের নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন সেকালের রুশদেশের কোন্ সেনাপতি?"

"রুশদেশকে আপনি দেখছি মর্ত্যের স্বর্গ বলে কল্পনা করছেন। আমি কিন্তু ভাবছি এক নেপোলিয়নকে হারিয়ে দিয়ে আপনারা আরেক নেপোলিয়ন-কে জিতিয়ে দিলেন। হিটলারের মতো স্টালিনেরও বাড় বেড়ে যাবে। হিটলারের শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। তখন আবার 'সামাল' 'সামাল' রব উঠবে।" রায় বাহাদুর বলেন।

"দেখুন, রায় বাহাদুর, অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য। স্টালিন না থাকলে হিটলারকে কেউ রুখতে পারতেন না। আর চার্চিল, রুজভেল্ট সাহায্য না করলে স্টালিনও কি পারতেন? এক কথায় বলতে পারা যায় কমিউনিসট ও ক্যাপিটালিস্ট মিলে ফাসিস্টকে রুখেছেন।" মানস বিচারকের রায় শোনায়। যাঁকে শোনায় তিনিও একজন বিচারক ছিলেন।

"তা যদি বলেন, চার্চিলকে সাহায্য করেছেন অ্যাটলী, লেবার পার্টির নেতা। ক্যাপিটালকে সাহায্য করেছে লেবার। রুজভেল্টের পেছনেও তাঁর দেশের শ্রমিক নেতারা দাঁড়িয়েছেন। নাৎসীদের কেউ দেখতে পারে না। ওরা কি এতই খারাপ! ওরা যে বেকার সমস্যার সমাধান করে এতদিন সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছে, এটাও কি সত্য নয়?" রায় বাহাদুর আশ্চর্য হন।

"কিছু মাত্র কৃতিত্ব যে ওদের নেই এমন কথা আমি বলব না। স্টালিন-গ্রাডে শুনছি আড়াই লাখ জার্মান প্রাণ দিয়েছে। দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়াও একটা কৃতিত্ব। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে ওরা ওদের টিউটন পূর্বপুরুষদের যুগে ফিরে গেছে। খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের ধার ধারে না। গ্রীক রোমান

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। রেনেসাঁস. এনলাইটেনমেণ্ট, লিবারল ডেমোক্রাসীর ধারা প্রবহমান রাখতে চায় না। আর কারো সঙ্গে ওদের মিলবে কেন? আবার সেই উইচ হাণ্ট ফিরিয়ে এনেছে। উইচ হয়েছে ইহুদী মাত্রেই। জিপসী মাত্রেই। কৃষ্ণাঙ্গ মাত্রেই। আর্য আর অনার্য এ ভেদবুদ্ধি ওদের মজ্জাগত। অনার্যকে বাঁচতে দেবে না। সুতরাং প্রাণের দায়ে সবাইকে একজোট হতে হচ্ছে। নেপোলিয়নও এত রকম মানুষকে শত্রু করেননি। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। এরা প্রতিক্রিয়াশীল।" আবার রায় দেয় মানস।

রায় বাহাদুর ওঠেন। বলেন, "স্টালিনগ্রাডের খণ্ডযুদ্ধই তো সম্পূর্ণ যুদ্ধ নয়। আরো অনেক জায়গায় লড়তে হবে। এখন থেকেই সেলিব্রেট করা বিজ্ঞ জনের কাজ নয়। আপনি এখনো ছেলেমানুষ রয়েছেন।"

তাঁর প্রস্থানের পর যুথিকা মুখ খোলে। "চার্চিল আজ হাসছেন না কাঁদছেন তা আমি বাজি রেখে বলতে পারব না। স্টালিনই এখন থেকে সিনিয়র পার্টনার। 'মার্শল স্টালিন', 'মার্শল স্টালিন' বলে খোসামোদ শুরু হয়ে যাবে। লোকটা আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। স্তব স্তুতি নিন্দা কুৎসা কিছুই ওঁকে টলাতে পারবে না। ইউরোপের ভাগ্য উনিই নিয়ন্ত্রণ করবেন। এর পরে আর কোনো শক্তি রাশিয়া আমন্ত্রণ করতে সাহস পাবে না। ঢুকলে বেরোবার পথ পাবে না। ঘেরাও হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। গোটা রাশিয়াটাই হবে বৃহত্তর স্টালিনগ্রাড। চার্চিল মশায় হাত পা কামড়াবেন। মতলবটা তো জার্মানী দখল করে রাশিয়ার দিকে হাত পা বাড়ানো। শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যত হম্বি তম্বি গান্ধীজীর বেলা। সর্বংসহা বসুমতী আর কতদিন এই দাম্ভিক জাতিকে সহ্য করবেন? কবে এর নেতাকে দিয়ে বলিয়ে নেবেন 'মহাত্মা গান্ধী' 'মহাত্মা গান্ধী'? কবে এমন সুদিন হবে যেদিন চার্চিল উড়ে আসবেন সেবাগ্রামে তাঁর নৈতিক সমর্থন প্রার্থনা করতে? পৃথিবীতে নৈতিক শক্তি বলে কি কিছু নেই? তবে এত মানুষ যীশু খ্রীস্টের অনুগামী হতে যায় কেন? খ্রীস্টের অনুশাসনকে কাজে না হোক, মনে মনে অবলম্বন করে কেন?"

মানস এর উত্তরে বলে, "মনে মনে মানছেই বা ক'জন মানুষ! গির্জাগুলো জনবিরল বা জনশূন্য। খ্রীস্টানদের মধ্যে খাঁটি খ্রীস্টানরা সংখ্যালঘু। টলস্টয়ের কথা যদি শুনত রুশদেশের চার্চ আত্মসংশোধন করত। তা না করে তাঁকেই করে বহিষ্কার। ফলে জারও গেছেন, প্যাট্রিয়ার্কও গেছেন, চার্চও গেছে। সব

সাফ করে দিয়েছেন লেনিন ও তাঁর বিপ্লবী দল। তাঁরাও গড়ে তুলেছেন নতুন এক চার্চ। কমিউনিস্ট পার্টি। নতুন এক রাষ্ট্র, প্রোলিটারিয়ান রাষ্ট্র। তাঁদেরও একপ্রকার নৈতিক শক্তি আছে। আরো এক প্রস্থ নৈতিক অনুশাসন। তাঁদের রাষ্ট্রে বেশ্যাবৃত্তি নেই, বৈশ্যবৃত্তি নেই, প্রফিট মোটিভ নেই। আদি খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিলে যায়। তবে তলোয়ারের উপর অগাধ বিশ্বাস। অনেকটা আদি মুসলমানদের মতো। যারা তাঁদের মতবাদে বিশ্বাস করে না তারা ইনফাইডেল। তাদের কোতল করা হয়। প্রাণে বাঁচাবার জন্যে সবাইকে কমিউনিস্ট দীক্ষা নিতে হয়েছে। খাঁটি কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু। তাঁদের মধ্যেও ঝাড়াই বাছাই চলেছে। আদি কমিউনিস্টরাও প্রায় সকলেই নিপাত গেছেন। তাঁরা নাকি প্রতিবিপ্লবী বা অতিবিপ্লবী। স্টালিন এখন কেবল পার্টির পোপ নন, রাষ্ট্রেরও সম্রাট, এখন আবার সৈন্যদলের মহাসেনাপতি, ফীল্ড মার্শাল। সর্বপ্রকার র‍্যাঙ্ক তো বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।”

“কিন্তু বিপ্লবটা আদৌ হলো কেন বলতে পারো? অধিকাংশ রাশিয়ানই তো ছিল ধর্মভীরু ও রাজভক্ত?” যূথিকা জিজ্ঞাসা করে।

‘প্রধানত অর্থনৈতিক করণে। যুদ্ধের সময় সব দেশেই ইনফ্লেশন হয়ে থাকে কিন্তু তাকে অতি যত্নে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারের শাসনকালে হয়নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আপনা থেকে ঘটে যায়। জার সিংহাসন ত্যাগ করেন। লেনিন তখন দেশে ছিলেন না। কেরেন্স্কি ও তাঁর মেনশেভিকরা বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে গভর্নমেন্ট গঠন করেন। কিন্তু একই ভুল তাঁরাও করেন। যুদ্ধ চালিয়ে যান, যুদ্ধের খরচ ইনফ্লেশন দিয়ে মেটান। একই পরিণাম। আবার বিপ্লব। এটা আপনা থেকে ঘটে না। ঝোপ বুঝে কোপ দেন লেনিন ও তাঁর বোলশেভিক দল। এঁরা যুদ্ধ থামিয়ে দেন। রণক্লান্ত সৈনিকরা এঁদের পক্ষ নেয়। শ্রমিকরা তো নেয়ই, কৃষকরাও জমির স্বত্ব পেয়ে এঁদের পেছনে দাঁড়ায়। ইনফ্লেশনের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়। অবশ্য প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আবার পরিমাণ বাড়াতে হয়েছিল, তার সুযোগ নিতে চেয়েছিল অতিবিপ্লবীরা কিন্তু লেনিন ছিলেন বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ। সুতরাং তাঁর বিপ্লব আশাতীতভাবে সফল হয়। যদিও বিনা রক্তপাতে নয়। তবে ফরাসী বিপ্লবের মতো সন্ত্রাসের রাজত্ব তাঁর আমলে হয়নি। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায়নিষ্ঠাও মানুষকে মানুষের প্রতি অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত

করে। নইলে রুশবিপ্লবও ফরাসীবিপ্লবের মতো ব্যর্থ হতো। মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মন্দ উপায়ও সার্থক এমনতরো নীতিরও একটা মাত্রাবোধ আছে। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি উপায়কে উদ্দেশ্যের চেয়ে আরো বেশী গুরুত্ব দেন।' মানস ব্যাখ্যা করে।

"আচ্ছা, এখানেও তো ইনফ্লেশন থেকে বিপ্লব হতে পারে। ইনফ্লেশনের উপরে কি গর্ভনমেণ্টের কণ্ট্রোল আছে?" যূথিকা সুধায়।

"এখন পর্যন্ত আছে। এ যুদ্ধ আরো তিন বছর গড়ালে ইনফ্লেশনের তথা বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকবে। গান্ধীজী ততদিন অপেক্ষা করলে তাঁর আন্দোলনই বৈপ্লবিক আকার নিত। অসময়ে গণ আন্দোলন করতে গিয়ে তেমন বেশী সাড়া মেলেনি। শ্রমিকরা ও সৈনিকরা সরকার পক্ষে, মুসলমানরা উদাসীন।" মানস বলে।

দিন কয়েক পরে রায় বাহাদুরের পুনরাগমন। এবার রাত ন'টার পরে।

"শুনেছেন? মহাত্মা গান্ধীর অনশন আরম্ভ হয়ে গেছে। একুশ দিনের মেয়াদ। সরকার তাঁকে সেই একুশ দিন মুক্ত থাকতে দিতেন। তা হলে কিন্তু তিনি অনশন করতেন না। কাজেই তাঁকে বন্দী অবস্থায় অনশন করতে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে তাঁর নিজের ডাক্তার থাকবেন। নিকট আত্মীয়রাও থাকবেন। ফলাফলের জন্যে সরকার দায়ী নন। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর যে পত্রবিনিময় হয় তা প্রকাশ করা হয়েছে। কালকের কাগজে দেখবেন।" রায় বাহাদুর হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

যূথিকা বজ্রাহত। মানস যদিও জানত গান্ধীজী অনশন করতে পারেন, তবু ঠিক এই মুহূর্তে প্রত্যাশা করেনি। সেও হতবাক।

"চুয়াত্তর বছর বয়সে একুশদিন অনশন মানে কী, বোঝেন? নির্বাণ। কেউ যদি তাঁকে নিবৃত্ত না করে। সরকার পাষাণের মতো অবিচল। সব চেয়ে খারাপটার জন্যেও প্রস্তুত। দেশবাসীরও তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।" তিনি কাতরভাবে বলেন।

মানস তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসে। তিনি কেবলি আওড়াতে থাকেন, "অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

এক ফাঁকে মানস তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি অতবার মৃত্যুর কথা বলছেন কেন? আপনার কি মনে হয় মহাত্মা আর বাঁচবেন না?"

"ওই শরীর নিয়ে এই বয়সে কেউ বাঁচে না। বাঁচলে বাঁচবেন আত্মার

জোরে আর ভগবানের কৃপায়। সোল ফোর্স আর ডিভাইন গ্রেস। সেইজন্যেই তো এতবার জপ করছি, অমৃতং গময়।" তিনি উত্তর দেন।

মানস ফিরে এসে যুথিকাকে শোনায়। সে ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছে যে সেও অনশন করবে। সেটা তার অন্তরাত্মার নির্দেশ।

"সে কী! তুমি কেন করতে যাবে! করে কী লাভ হবে? তুমিও কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও?" মানস ব্যাকুল হয়ে বলে।

"পাগল! আমি ছেড়ে যাব কোন্ দুঃখে! আত্মার সঙ্গে আত্মার একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। আমার আত্মার প্রার্থনা তাঁর আত্মাকে শক্তি জোগাতে পারে। অনশনও একপ্রকার অব্যক্ত প্রার্থনা। অসুস্থ সন্তানের আরোগ্যের জন্যে উপবাস কি কোনো মা কখনো করে না? বাপুও তো আমার একটি ছেলে। ছেলের মুখে ভাত নেই, আমার মুখে ভাত রুচবে?" যুথিকা আবেগের সঙ্গে বলে।

"একুশ দিন তুমি পারবে কেন? শরীরেরও তো একটা দাবী আছে। মানুষের সমস্তটাই কি আত্মা?" মানস যুক্তির আশ্রয় নেয়।

"না, একুশ দিন নয়। দিন সাতেক।" যুথিকা জানায়।

পরের দিন যুথিকা অনশন শুরু করলে মানসও তাই করে। চা পর্যন্ত ছোঁয় না। পরিজ পড়ে থাকে।

"ও কী! তুমি অনশন করবে! তোমাকে আদালতে যেতে হবে, মামলা শুনতে হবে। পেটে কিছু না পড়লে কাজের ক্ষতি হবে না?" যুথিকা সুধায়।

"বাপুর জন্যে আমারও কিছু করা উচিত। অদৃশ্য একটা ভালোবাসার ডোর যখন আছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রত্যেকটি দেশবাসীর। কেউ মানে না, কেউ মানে। আমি তো মানি। রায় বাহাদুরের মতো আমারও আশঙ্কা এযাত্রা তাঁর প্রাণসংশয়। তিনদিন পর্যন্ত আমার দৌড়। এই তিনদিন আমি আদালতে গিয়ে শক্তিক্ষয় করব না। বাড়ীতে বসেই যা করতে পারি তা করব। অসুখবিসুখ করলে জজেরা তাই করেন ও হাইকোর্টকে জানিয়ে দিয়ে অনুমতি নেন। এ সপ্তাহে আমার কোর্টে দায়রার মামলা নেই। সিভিল ও ক্রিমিনাল আপীল তিনদিন সবুর করতে পারে। মামুলী ফাইল বাড়ীতে বসেও ডিস্পোজ করা চলে। ক্লার্করা এসে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।" মানস তার সিদ্ধান্ত জানায়।

সেরেস্তাদারকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি বলেন তিনদিন কোনো মতে চালিয়ে দিতে পারা যাবে। তবে অনশনের কথাটা গোপন রাখতে হবে। বাইরে রটে গেলে কলকাতার কাগজে বেরিয়ে যাবে। সরকার চেপে ধরবে। অসুখ তো সকলের করে। অসুখটাই হবে প্রকাশ্য কারণ।

"না। আমি মিথ্যা কথা বলব না, লিখব না। তা যদি করি আমার অনশন বৃথা হবে। এটা একটা রিচুয়াল নয়। গান্ধীজী সত্যের উপর জোর দেন। আমিও তাই করব। যদি হাইকোর্ট জানতে চায়। কিন্তু আপাতত কোনো কারণ দর্শাতে হবে না। কার্যবিধিতে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের অসুখ না করলেও স্ত্রীর অসুখ তো করতে পারে।" মানস দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"তা হলে মিথ্যা কথাটা আমিই মুখে আনব, সার। মেমসাহেব অসুস্থ, সাহেব ব্যতিব্যস্ত। এই চারটি শব্দই যথেষ্ট।" তিনি সাহস করে বলেন।

"তা হলে আবার সহানুভূতি জানাতে উকীল বাবুরা ছুটে আসবেন। কী দরকার কোনো কৈফিয়ৎ দেবার ? আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি সাব-জজ সাহেবের নামে। পরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সাহেবকে লিখব। কারণ কাউকেই জানাব না। সেটা প্রাইভেট।" মানস শেষ করে।

"কারণটা প্রাইভেট। ব্যস্, এই যথেষ্ট।" তিনি বিদায় নেন।

মানস জীবনে একটিবার উপবাস করেছিল। একাদশীর উপবাস। তার মা সেদিন দু'তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর অনুরোধ উপরোধ করে এটা সেটা ওটা খাইয়ে হাস্যস্পদ করেছিলেন। তার স্ত্রীও যে তাই করবেন এটা তার অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু সে সত্যি সত্যিই চব্বিশ ঘণ্টা অনশনে কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে পান করে লেবুর সরবত।

পরের দিন খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে হয় না। এক পেয়ালা চা দিয়েই অনশন শুরু করে। কিন্তু সারাদিন লেবুর সরবত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না। রাত্রে শোবার আগে আবার এক পেয়ালা দুধ। এই তার দ্বিতীয় দিনের রেকর্ড। তৃতীয় দিন সকালে চা ও রাত্রে দুধ আর মাঝে মাঝে লেবুর সরবত। বিকেলে আরো কিছু পেটে পড়ে। একটা আস্ত কমলালেবু। যুথিকা কিন্তু তার পরেও আরো দু'দিন অনশন চালিয়ে যায়। লেবুর সরবত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না। তারপরে সেও স্বীকার করে যে আর পারছে না। অক্ষরে অক্ষরে সাতদিন অনশন করলে শরীর সহ্য করবে না।

ইতিমধ্যে ওরা দু'জনেই অন্তরে অনুভব করে যে মহাত্মা এযাত্রা রক্ষা পাবেন। হয় বিশ্বের জনমত সরকারকে বাধ্য করবে তাঁকে একুশদিনের আগে মুক্তি দিতে, আর নয় তো তিনি অক্ষরে অক্ষরে একুশদিন পার করতে সমর্থ হবেন।

মানস বলে, "মলিকান্দায় তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি তাঁর ভিতরে একটা শক্তির রিজার্ভ। সে রিজার্ভ তাঁকে একুশদিন পার করিয়ে দেবে। আমাদের আর অনশন করতে হবে না। তবে প্রার্থনা সমানে চলবে।"

হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার পত্রপাঠ জবাব দেন। লেখেন, "আপনি তো কারণ দর্শাননি। মহামান্য হাইকোর্ট কারণ জানতে চান।"

তখন মানস উত্তর দেয়, "আমার একজন প্রিয়জনকে অনশন করতে দেখে আমিও অনশন করি। বাড়ীতে বসেই দরকারী কাজ করি। অনুমতি না দিলে ক্যাজুয়াল লীভ দেওয়া হোক।"

রেজিস্ট্রার জানিয়ে দেন অনুমতি বা ক্যাজুয়াল লীভ কোনোটাই মিলবে না। রেগুলার লীভের জন্যে সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে হবে।

রায় বাহাদুরকে খুলে বলতে হয়। তিনি শিউরে ওঠেন, "এই সেরেছে। সরকার সব খবর রাখে। ছুটির দরখাস্ত না-মঞ্জুর তো হবেই, তিনদিনের মাইনে তো কাটা যাবেই, চাকরিতে ব্রেক হয়ে যাবে। সে এক গুরুতর ব্যাপার। এতকাল যে চাকরি করলেন পেনসনের সময় এই কার্যকালটা বেঁচে যাবে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন না কেন? লিখলেই পারতেন প্রিয়জন মানে সহধর্মিণী। মিসেস মল্লিকের অনশন দেখে আপনিও অনশন করেন তাঁর অনশন ভাঙতে।"

"অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ। প্রিয়জন বলতে আমি কিন্তু বলতে চেয়েছি বাপু। বাপুর অনশনে ব্যথিত হয়ে আমরা দু'জনই অনশন করি। কেন মিথ্যা কথা লিখব? তিনি আমার কাছে সত্যভাষণের সাহস প্রত্যাশা করেন। নইলে অনশনের কী মানে? পেনসনের সময় কী হবে না হবে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব নাকি? তার অনেক আগেই চাকরি ছাড়ব। রাশি রাশি জবানবন্দী আর রায় লিখে লিখে যে সময়টা নষ্ট করছি সেটা আমারই আয়ু আর যৌবন। টাকা দিয়ে আর সব কেনা যায়, আয়ু আর যৌবন কেনা যায় না। আমাকে ঝাঁপ দিতেই হবে। সরস্বতীর কৃপা থাকলে তাঁর সেবককে তিনি

সপরিবারে অভুক্ত রাখবেন না। আমিও যে অনশন করতে পারি এটা আবিষ্কার করে আমি ভিতরে জোর পাচ্ছি।" মানস সবিনয়ে বলে।

"ছেলেমানুষ আর কাকে বলে। ছেলের লেখাপড়া বাকী, মেয়ের বিয়ে থা বাকী। স্ত্রীরও তো জামাকাপড়ের প্রয়োজন হবে। তিনি অনশন করতে পারেন, কিন্তু নিরাবরণ থাকতে পারবেন না। যাক, সরকার আপনাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেবেন না। ইংরেজরা একটা মহৎ জাতি। সত্যভাষণের মর্যাদা মানে। খুব সম্ভব আপনার কনফিডেনশিয়াল সার্ভিস রেকর্ডে একটা বিরূপ মন্তব্য থাকবে। আপনাকে লীগাল রিমেমব্রান্সার করবে না, সিলেকশন গ্রেড দেবে না, হাইকোর্টের জজ করবে না। আপনার নিচে যাঁদের পোজিশন তাঁরাই প্রমোশন পাবেন, আপনি সারা জীবন জেলা জজ হয়েই কাটাবেন। তবে গঙ্গায় ডুব দিলে সব পাপের ক্ষালন আছে। পুলিশকে যদি খুশি করে দেন তবে আপনার প্রমোশন আটকায় কে ?" রায় বাহাদুর রঙ্গ করেন।

"পুলিশকে খুশি করলে আমাকে তো জজ না করে ম্যাজিস্ট্রেট করা হতো, রায় বাহাদুর।" মানস তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

গান্ধীজীর অনশন খারাপের দিকে যাচ্ছে, অবস্থা উদ্বেগজনক। বিশ্বের নানা দিক থেকে অনুরোধ আসছে। বড়লাট কর্ণপাত করছেন না। তবে তাঁকে শেষবারের মতো দর্শন করতে তাঁর ভক্তদের জন্যে দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। যুথিকার ইচ্ছা ছিল, উপায় ছিল না। সে বম্বেতে তার এক বান্ধবীকে চিঠি লেখে বাপুকে দর্শন করে শুভকামনা জানাতে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার জেলা জজকে আধা-সরকারী ভাবে জানিয়ে রাখেন যে মিস্টার গান্ধীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সরকার সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত। হাঙ্গামার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। শান্তিভঙ্গ ঘটলে দৃঢ় হস্তে দমন করতে হবে।

যুথিকা মানসের মুখে শুনে কাঁদতে বসে। বলে, "মহৎ জাতি না শাদা হাতী! শয়তানের জাতি! ওদের অন্তঃপরিবর্তন কি কোনদিন হবে না? ইংলণ্ডে কি মানুষ নেই? সব বনমানুষ?"

ইতিমধ্যে হোমি মোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মাধবরাও অণে বড়লাটের শাসন পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাতেও বড়লাটের মন গলেনি।

দিনকয়েক পরে যুথিকার বান্ধবী শিরীন বিলিমোরিয়া লেখেন, "বাপু আমাকে দেখে চিনতে পারেন। শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে অতি কষ্টে

বলেন, 'তৃষ্ণার্তকে এক চামচ জল দিলে কি তার তৃষ্ণা মেটে ?' মনে হলো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এত কম সাড়া কেন ? দেশ কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ? আমিও তাই ভাবি। আগস্ট মাসের আগুন ফেব্রুয়ারিতে জল হয়ে গেছে ?''

যুথিকা রাগ করে বলে, "আমরাও মহৎ জাতি না কালো হাতী! কুম্ভ-কর্ণের জাতি! ছ'মাসের জন্যে জাগি, দশ বছরের জন্যে ঘুমোই।"

গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে সরকার নাকি যথেষ্ট চন্দনকাঠ জড়ো করে রেখে-ছিলেন। কিন্তু মরিয়ে না মরে রাম এ কেমন বৈরী! একুশদিন পরেও দেখা গেল তিনি বেঁচে বর্তে আছেন। কস্তুরবার হাত থেকে কমলালেবুর রস নিয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পনেরো দিনের উপর গান্ধীজীকে চোখে চোখে রেখেছিলেন। ওঁর মতে তিনি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। "মহাত্মাজী আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছেন।" বলেন্ ডাক্তার রায়।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে গান্ধীজী বেঁচে রইলেন আরেকদিন লড়বার জন্যে। মানস ও যুথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এর পরে তাদের ভাবনা সৌম্যদা আর জুলির জন্যে। ওদের কে যে কোন্ কারাগারে, কবে মুক্তি পাবে কেউ জানে না। মিসেস সিন্‌হাও অন্ধকারে। আগের বারের চেয়ে সরকার এবার আরো কড়া হয়েছেন। জেলখানা এখন আর বৈঠকখানা নয়। ওয়ার্ডাররা জেনে গেছে স্বদেশীওয়ালাদের দৌড় কত-দূর। তাদের চাকরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। লোকেও বুঝে গেছে জাপানীদের দৌড় কতদূর। ইংরেজকে হটায় কার সাধ্য!

মানসের দুর্ভাবনা ছিল সরকার হয়তো তার ছুটির দরখাস্ত না-মঞ্জুর করে তাকে জব্দ করবেন। তিনদিনের মাইনে তো কাটা যাবেই, তার মাথা কাটা যাবে। সে চারদিকে অন্ধকার দেখছে, এমন সময় চিঠি আসে ছুটি মঞ্জুর। সরকার থেকে জবাবদিহি চাওয়া হয়নি। সেও দরখাস্ত পেশ করার সময় জবাবদিহি করেনি।

যুথিকা বলে, ''একটা ফাঁড়া কেটে গেল। তুমিও পদচ্যুতির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলে।"

একদিন পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা। ''একটা বেড়ালের ন'টা জীবন। একজন মহাত্মার ক'টা জীবন? এই নিয়ে ক'বার প্রাণরক্ষা হলো? ফের ক'বার হবে?"

মানস বলে, "আপনারা তো তাঁকে পোড়াবার জন্যে চন্দনকাঠও আনিয়ে রেখেছিলেন বন্দিশালায়। এখন হতাশ।"

"আপনি ভুল বুঝেছেন। এটুকু জ্ঞান আমাদের আছে যে গ্যাণ্ডী ডেড ইজ মোর ডেঞ্জেরাস দ্যান গ্যাণ্ডী লিভিং। তিনি মারা গেলে নতুন করে টেররিজমের ঢেউ আসত। কয়েকটা জেলা থেকে, কয়েকটা প্রদেশ থেকে আমরা ভেসে যেতুম, হয়তো বা মুছে যেতুম। এবারকার টেররিজম মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত না, উন্মত্ত জনতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো। তার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলুম না। আমরা সিভিল অফিসাররা ভারতময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি। একজোট হবার সময় পেতুম কখন? ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকত না। রেলপথ বিপর্যস্ত। মোটরের রাস্তায় অবরোধ। প্লেন থাকলেও ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড কোথায়? যাক, এবারকার মতো ফাঁড়া কেটে গেছে। পরের বারের জন্যে সময় থাকতে প্রস্তুত হতে হবে। গ্যাণ্ডী লোকটা বিলকুল নাছোড়বান্দা। কিন্তু ওঁর দাবী মেটাতে গেলে তো সত্যি সত্যি আমাদের ভারত ছাড়তে হয়! তখন চাকরি পাব কোথায়? পেনসন দেবে কে? দেশে ফিরে গিয়ে কি না খেয়ে মরব? তার চেয়ে লড়তে লড়তে মরাই ভালো।" পুলিশ সাহেব উচ্চস্বরে চিন্তা করেন।

মহাত্মার নিধন হলে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হতো তাঁর প্রাণরক্ষার ফলে সেটা আর হয় না। আগস্ট মাসে যে স্বতঃস্ফূর্ত জন জাগরণের জোয়ার এসেছিল মার্চ মাসের মধ্যেই তাতে ভাঁটা পড়ে যায়। সরকারকে আর ধরপাকড় করতে বা গুলী গোলা চালাতে হয় না। গান্ধী মৃত নন, আন্দোলনটাই মৃত।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের পরিদর্শন উপলক্ষে হিতেশ ভৌমিক আবার একদিন আসেন। এবারেও মানসের অতিথি হন। বলেন, "উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সারা বাংলাই আমি চষে বেড়াচ্ছি। কোথাও একটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই। কেউ লড়তে চায় না। না জাপানীদের সঙ্গে, না ইংরেজদের সঙ্গে। ওয়ার ফ্রণ্ট এখন নাচ গান প্রোপাগাণ্ডার জায়গা। কবিদেরও আমরা যথেষ্ট সম্মান মর্যাদা দিই। তাঁদের কবিতা শুনি। 'কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি।' সকলেই ঘোর ফাসিস্টবিরোধী। কংগ্রেসওয়ালারা জেলে যাওয়ায় তাঁদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না। যাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের সাইক্লোস্টাইলে লেখা ইস্তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সরকার গ্রাহ্যই করেন না! তাতে তাঁদের যুদ্ধোদ্যোগের লেশমাত্র ইতরবিশেষ

হয় না। যুদ্ধ মানেই বিগ বিজনেস। সে বিজনেসে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নিযুক্ত। মুনাফা যা হচ্ছে তা আকাশছোঁয়া। এমনি করেই এদেশে ক্যাপিটাল ফরমেশন হচ্ছে। ক্যাপিটালিজমের বুনিয়াদ আরো শক্ত হচ্ছে। স্বাধীনতা দিতে ইংরেজদের আপত্তি কমে আসছে, কারণ স্বাধীন ভারত হবে ক্যাপিটালিস্ট ভারত। তাতে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, বোহ্‌রা ও খোজাদের সঙ্গে ইংরেজদেরও পার্টনারশিপ থাকবে। রতনে রতন চেনে। আমি ক্যালকাটা ক্লাবে থাকি। ওইখানেই আমার ডেরা। ইংরেজ, বাঙালী, মাড়োয়ারী, সিন্ধী সকলেরই লীলাখেলা দেখি। যোগ দিতে পারিনে। সঙ্গে বৌ নেই যে। না, আমি তেমন লোক নই যে স্ত্রীবিয়োগের পর সহধর্মিণীর প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করব।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়।

মানস খাপ্‌পা হয়ে বলে, "ওদিকে বাপু অনশনে মারা যাচ্ছেন, এদিকে এরা মুনাফা লুট আর মজা লুট করছে! বৌ থাকলে আপনিও যোগ দিতেন।"

"দূর। ঠাট্টাও বোঝেন না! বৌ থাকলে আমি ক্লাবেই থাকতুম না। আর সেও ছিল তেমনি পিউরিটান।" ভৌমিক নিজেও মদ খান না।

## ॥ পঁচিশ ॥

মহাত্মার মরদেহের জন্যে সরকার চন্দনকাঠ মজুত করেছেন এই গুজবটা সারা ভারতে রটে যায়। সৌম্য তা শুনে স্থির থাকতে পারে না। সব কাজ ফেলে পুণা ছুটে যায়। পথে ধরা পড়তে পারত, কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারেনি। ধরা পড়লে তার কী দশা হবে ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বাপু যদি সত্যি সত্যি চলে যান তবে শেষবারের জন্যে তাঁকে দর্শন করে বিদায় দিতেও নিতে হবে।

আগা খান্ প্রাসাদের সদর দরজা খোলা পেয়ে দলে দলে মানুষ আসাযাওয়া করছিল। কাউকেই দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছিল না। গান্ধী পরিক্রমা করে ফেরবার সময় হঠাৎ সোনাদির সঙ্গে মুখোমুখি। তিনি ছিলেন সেবিকাদের একজন। সেবাগ্রাম থেকে গিয়ে সরকারের অনুমতি নিয়ে কস্তুরবার সহায়িকা মণ্ডলীভুক্ত।

"বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।" বল্লেন সোনাদি। যাঁর ভালো নাম শোভিনী দেব রায়, বিবাহসূত্রে কেশবন্।

এই রে! চিনতে পেরেছে! সৌম্য ধরা পড়ে গেছে। কী আর করবে? কাষ্ঠ হাসি হাসে। মাথা নেড়ে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ পরে সোনাদি এসে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে যান। বলেন, "এট টু, ব্রুটে? তুমিও, ব্রুটাস!"

সৌম্য ভড়কে যায়। "ও কী বলছেন, সোনাদি? কবে আমি কাকে ছোরা মারলুম? আমি যদি ব্রুটাস হই তো সীজারটি কে?"

"বাপু। ভগবান না করুন, তিনি যদি সত্যি সত্যি এযাত্রা আমাদের ছেড়ে যান তা হলে তুমিও এর জন্যে দায়ী হবে, ভাই। তাঁর অনশন এই কথা জগৎকে জানাতে যে, এটা তাঁর পরিচালিত আন্দোলন নয়। তোমাদের বলা হয়েছিল গণসত্যাগ্রহ চালাতে। তোমরা যা চালিয়েছ তার মধ্যে অহিংসার ভাগ কতটুকু? আর সত্যই বা তার মধ্যে কোথায়? এই যে তুমি বাউল সেজে মহাত্মাকে দর্শন করে এলে এটাও তো তোমার অসত্য পরিচয়। তবে ও বুড়োকে ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়। টের পেয়েছেন ঠিকই। যাও, কাল আবার এসো। নিজ বেশে। মাফ চেয়ো। কলকাতা ফিরে গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে লালবাজারে ধরা দিয়ো। তোমরাই ধরিত্রীর লবণ। তোমরাই যদি লবণত্ব হারাও তবে তোমাদের লবণাক্ত করবে কে? বাপু এবার বাঁচলেও নতুন কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব করবেন না, যদি না জনগণকে তোমরা অসত্য ও হিংসার চোরাগলি থেকে সত্য ও অহিংসার রাজপথে ফিরে আসতে শেখাও।" এই বলে সোনাদি চলে যান।

সৌম্য জবাবদিহি করার সুযোগ পায় না। সোনাদির সঙ্গে তার আলাপ বছর বারো তেরো আগে লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে। পরে তিনি সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর সহকর্মীদের একজনকে বিয়ে করেন। দক্ষিণ ভারতীয়। সেবাগ্রামে গেলে সৌম্য তাঁদের কুটিরে অতিথি হয়।

কেশবন্ সুরসিক পুরুষ। বলতেন, "বাপু আমাকে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় বার করার ভার দিয়েছেন। আমি যখন বলি, বাপু, পপুলেশন না কমালে পভার্টি কমবে না তিনি বলেন, পপুলেশন কমালে ম্যান পাওয়ার কমে যাবে, ম্যান পাওয়ার কমে গেলে প্রোডাকশন পড়ে যাবে। আমি যখন অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিই যে যত লোক খায় তত লোক কাজ করে না, এত জমিই

নেই, জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়তি তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'ব্রহ্মচর্য'। হা হা হা হা!"

কেশবন্‌ও বাপুকে দর্শন করতে পুণা এসেছিলেন। তাঁর আস্তানায় গিয়ে সৌম্য বেশ বদল করে। কিন্তু ধুতী পায় না। দক্ষিণী লুঙ্গী পরে।

"আমার তো মনে হয় বাপু এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।" কেশবন্ বলেন। "তবু আরো দু'একদিন দেখে যাওয়াই ভালো। সোল ফোর্স। সোল ফোর্স ছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। সোল ফোর্সই তাঁকে এতদূর নিয়ে এসেছে। এত বড়ো দেশকেও। কিন্তু ক্রমেই ধরা পড়ে যাচ্ছে এর লিমিটেশন। সারা দেশে ওই একজনমাত্র সত্যাগ্রহী। আগেকার দিনে বলতে পারা যেত 'ওয়ান সত্যাগ্রহী ইজ ইনাফ।' এখন কিন্তু ও কথা বলা যায় না। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওয়ান সত্যাগ্রহী ইজ নট ইনাফ। জেলে যেতে রাজী হলেই সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। জেল তো আজকাল মামাবাড়ী। সেখানে কিসের অভাব? হা হা হা! শুধু শয্যাসঙ্গিনীর। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্রহ্মচর্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহের দিনে অন্তত শত খানেক সত্যাগ্রহী থাকা চাই যাঁরা গান্ধীজীর মতো শহীদ হতে প্রস্তুত। শতখানেক তো দূরের কথা দশজনও আছেন কি-না সন্দেহ। যাঁরা বার বার জেলে যেতে রাজী তাঁরা একবারও গুলী খেতে বা ফাঁসী যেতে রাজী নন। সাধারণ লোক সন্ত্রাসবাদীদেরই বীর বলে পূজা করে। আর এঁদের করে ত্যাগী বলে শ্রদ্ধা। সন্ত্রাসবাদীদেরও আর সে জলুস নেই। তাঁদেরও ভরসা সিপাহীদের উপরে। সিপাহীরা স্বার্থত্যাগীও নয়, দেশপ্রেমিকও নয়। যার নিমক খায় তার জন্যে লড়ে। জর্জ ওয়াশিংটনের বা গারিবাল্‌ডির ফৌজ এদেশে নেই। ডি'ভালেরার ফৌজই বা কোথায়? সুশৃঙ্খল সৈন্য যেখানে নেই সেখানে উচ্ছৃঙ্খল জনতা তার শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে না। নীরবে শুনে যায়। তার মনের ভিতর একটা মন্থন চলেছে। সে কি সত্যি ভুল করেছে?

কেশবন্ বলে যান, "ভগবান না করুন, মহাত্মাজী যদি চলে যান তবে তাঁর সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সত্য আর অহিংসাও চলে যাবে। নেতার অভাব হবে না, নীতির অভাব হবে। মরাল লীডারশিপই গান্ধীবাদীদের বৈশিষ্ট্য। সদলবলে জেলযাত্রা নয়। এইবারই শেষবার। পরে আর এর পুনরাবৃত্তি

জমবে না। জেলবাজ সত্যাগ্রহী নয়, জানবাজ সত্যাগ্রহীই চাই। কিন্তু কোথায় তাঁরা? তোমাদের এখন কঠোর আত্মপরীক্ষার সময়। আন্দোলন তো আপনা থেকেই থেমে এসেছে। তোমরা ক'জনা মিলে তো জগন্নাথের রথকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি রথের রশি টানবার জন্যে লক্ষ লক্ষ উৎসাহী ভক্ত না থাকে। তুমি ফিরে গিয়ে কী করবে, জানিনে। সেবা-গ্রামে বাস করতে চাও তো আমাদের ওখানে স্বাগত।"

সৌম্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, "আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার মাথার দাম এখন পাঁচ হাজার টাকা। ছদ্মবেশ পরে এতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছি। নিজ বেশ ধারণ করলে যেখানেই হোক ধরা পড়বই। সোনাদি বলেছেন লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতে। সেই কথাই ভাবছি। দ্বীপান্তর তো নিশ্চয়ই, ফাঁসীও অসম্ভব নয়।"

"কী সর্বনাশ! খুন করেছ নাকি?" তিনি আঁতকে ওঠেন।

"না, খুন করিওনি, করাইওনি। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ। সেটা যে আমি করেছি তা কি অস্বীকার করতে পারি? আমি যা করেছি তা অহিংস না হতে পারে, কিন্তু অসত্য নয়। এক হাতে ইংরেজদের, আরেক হাতে জাপানীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যেই রেল লাইন ওপড়ানোর, ব্রিজ কালভার্ট ওড়ানোর, টেলিগ্রাফের তার কাটার হুকুম দিয়েছি। দেশ যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়নি এটা তো সত্য। উপায়টা অবশ্য অশুদ্ধ। ভুল যদি বলেন তো ভুল। আমি দুঃখিত।" সৌম্য শান্তভাবে জানায়।

"কী সর্বনাশ।" অধ্যাপক আঁতকে ওঠেন। "লালবাজারে গিয়ে পুলিশের কাছে তুমি এইসব কবুল করবে নাকি? তা হলেই হয়েছে। তোমাকে ওরা অ্যাপ্রুভার করে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু তোমার সহকর্মীদের ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে। তোমার সোনাদি কি চান যে তোমার সহকর্মীরা ঝুলুক? তুমি আমার পরামর্শ শোন। শহীদ হয়ে তোমার কাজ নেই। তুমি আপাতত বাংলাদেশে ফিরে যেয়ো না। আমরা তোমাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিব। আমাদের কোনো একটি আশ্রমে গা ঢাকা দিয়ে গঠনের কাজ করবে। তোমার একটা দক্ষিণী নামকরণ হবে। লালবাজারে তুমি যেতে চাও তো বছর তিনেক পরে যেয়ো। ততদিনে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে ইংরেজদের দিক থেকে আগ্রহ দেখা দেবে। যদি ওরা যুদ্ধে জেতে। আমার কী মনে হয়, জানো? যুদ্ধে ওরা জিতবেই। রাশিয়া ওদের সাথী। আমেরিকা

ওদের আত্মীয়। গায়ের জোরেও জার্মানী, ইটালী আর জাপান ওই তিন প্রতিপক্ষের চেয়ে জোরদার নয়! ন্যায়ের জোরে তো নয়ই। যুদ্ধজয়ের লক্ষণও কি স্পষ্ট নয়? স্টালিনগ্রাডে কে জিতেছে? রাশিয়া না জার্মানী? ফলে ইংরেজদের মনের জোরও বেড়ে গেছে। ওরা এবার জার্মানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর বার্মার উপরেও। জাপানীরা হটে যাবেই। হেরে যেতেও পারে। তখন কথা উঠবে তোমরা জাপানের সাহায্য নিতে চেয়েছিলে। ব্রিটেনকে বিব্রত করতে চেয়েছিলে। চাপ দিয়ে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলে। তুমি তো হিংসাত্মক কার্যকলাপও করেছ—”

“হিংসাত্মক নয়, কেশবন্‌দা। ধ্বংসাত্মক।” সৌম্য শুধরে দেয়।

“হো হো!” কেশবন্ হেসে বলেন, “সেটা তিন বছর পরে আদালতে গিয়ে বোলো। লালবাজারে গিয়ে নয়। লালবাজারে যদি যাও তবে শুধু এইটুকুই বলবে যে, আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি। আমার যা বক্তব্য তা আমি আদালতে পেশ করব। খবরদার, সৌম্য, যুদ্ধকালে ওসব কবুল কোরো না। তোমাকে ওরা যদি মিলিটারি ট্রাইবিউনালে পাঠায় তো আদালতের এক্তার থাকবে না। আদালতের রায় মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। তোমার প্রাণদণ্ড নাও হতে পারে। না, না, তোমাকে আমরা শহীদ দেখতে চাইনে।”

সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনার পর সোনাদি আগা খান্ প্রাসাদ থেকে ফেরেন। রাতে ওঁকে সেখানে থাকতে দেবে না। জেল কোড তো রদ হয়নি। তা ছাড়া কস্তুরবাকে সাহায্য করতে যারা বেহ্‌ন তো রয়েছেন।

“শুনেছ সৌম্যর কাণ্ড।” কেশবন্ বলেন, “ওসব কাণ্ড হয়তো অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, ইতিহাসে নজীর আছে। নেপালিয়নের আক্রমণের মুখে মস্কোর নাগরিকরা নিজেদের শহরে নিজরাই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তা বলে ওসব ব্যাপার কি গান্ধীজীর অহিংস নীতিসম্মত? সৌম্য যদি গান্ধীবাদী না হতো তবে ওর দিক থেকে ও ঠিক কাজই করেছে। গান্ধীবাদী হয়ে ওসব কাজ করা চলে না। করেই থাকে যদি তো কবুল করে সবান্ধবে ফাঁসীতে ঝুলতে এত তাড়া কিসের? শহীদ হওয়া কি এতই জরুরি? বছর তিনেক সবুর করলে এমন কী ক্ষতি? অন্তত মিলিটারি ট্রাইবিউনালের সরাসরি বিচারের হাত থেকে তো বাঁচুক। পরে আদালতের বিচারে যা হয় হবে। তোমার ভাইকে তুমি লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতে বলেছ। আমি বলেছি দক্ষিণে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে গঠনের কাজ করতে। আচ্ছা, সুন্দরম্ নামটা কেমন?”

সোনাদি ভেবে চিন্তে বলেন, "সুন্দরম্ নাম নিয়ে অসুন্দর কাম করা কি ভালো ? গা ঢাকা দেওয়াটা অসুন্দর কাম। লালবাজারে গিয়ে ধরা দিক তো আগে। তার পরিণাম কী তা দেখা যাবে পরে। বিলেতে আমাদেরও বন্ধুজন আছেন। তুমি চিঠি লিখবে হরেস আলেকজাণ্ডারকে। আমি লিখব মুরিয়েল লেস্টারকে। সৌম্যকে যদি চিঠি লিখতে দেয় সেও লিখবে তার প্যাসিফিস্ট বন্ধুদের। আচ্ছা, সৌম্য, পার্লামেণ্টে তোমার চেনাশোনা কেউ আছেন ?"

"আমার নেই, আমার বন্ধু সুকুমার দত্তবিশ্বাসের আছেন।" সৌম্য উত্তর দেয়। "কিন্তু কাউকেই আমি চিঠি লিখব না, সোনাদি। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করতে চাই। ফাঁসী হয় তো ফাঁসী, দ্বীপান্তর হয় তো দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড হয় তো কারাদণ্ড। দেশের স্বাধীনতা সেই পরিমাণেই মূল্যবান যে পরিমাণে কষ্টার্জিত। সুলভে যা পাওয়া যায় তা আসল মুক্তা নয়, নকল মুক্তা। সেটা তো আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। তারপরে আবার দত্তবিশ্বাসের মারফৎ সার স্টাফোর্ড ক্রিপসের কাছে দরবার। কিসের জন্যে ? না আমার প্রাণরক্ষার জন্যে। দেশের জন্যে লড়ব, অথচ বিদেশের কাছে কৃপা চাইব। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না, দিদি। তবে এটাও ঠিক নয় যে আমি পুলিশের কাছে ধরা দিতে গিয়ে আমার সহকর্মীদেরও ধরিয়ে দেব। যদি ওদের নামধাম আমি ফাঁস করি তো ওদের ফাঁসীর জন্যে আমিই দায়ী হব। কিন্তু মারের চোটে ফাঁস করে ফেলা অসম্ভব নয়। টরচার সহ্য করার মতো তপোবল এখনো আমার উপজায়নি। যদিও ব্রহ্মচর্যের ত্রুটি নেই। বাপুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কী ? কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থায় তাঁকে শান্তিতে বাঁচতে বা শান্তিতে মরতে দেওয়াই শ্রেয়।"

"না, বাপুকে বিরক্ত করা চলবে না। তাঁকে বাঁচতে দিতে হবে। তোমার মনে দ্বিধা থাকে তো লালবাজারে যেয়ো না। তার আগে তোমার সহকর্মীদের অভিমত জানতে চেষ্টা করো।" সোনাদি বলেন।

মহাত্মার মহাপ্রয়াণের আশঙ্কায় নানা দিগ্‌দেশ থেকে দর্শন করতে শত শত যাত্রী এসেছেন। বন্দিশালার দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাঁর কানে কুলুপ, মুখে কুলুপ। চারদিকে গুপ্তচর গিজগিজ করছে। সৌম্য বুঝতে পারে ও দর্শন করেই ক্ষান্ত থাকে। প্রতি-দিনই একবার করে আগা খান প্রাসাদে যায়, খোঁজ নেয় তিনি কেমন

আছেন। তাঁর অনশনভঙ্গের সময় সেও উপস্থিত থাকে। সেও জয়ধ্বনি দেয়। চন্দ্রের রাহুমুক্তির পর বিশ্বাসী হিন্দুদের মতো।

ইতিমধ্যেই সে মনঃস্থির করেছিল যে নিজের আশ্রমেই ফিরে গিয়ে নিয়মিত গঠনকর্ম শুরু করে দেবে। ছেড়ে দেবে যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ। তা সত্ত্বেও যদি তাকে ধরতে আসে সে সানন্দে ধরা দেবে। কিন্তু এমন কিছু বলবে না যাতে আব কেউ বিপন্ন হয়। টরচার করলে সঙ্গে সঙ্গে নির্জলা একাদশী। সেটা সে প্রত্যেক মাসেই দু'দিন পালন করে থাকে। এবার না হয় পূর্ণিমা অমাবস্যা অবধি জের টানবে। তবে পুরোপুরি নির্জলা নয়। গান্ধীজীর অনশনের সময় কিন্তু সে একদিনও অনশন করেনি। ওটা হাতে রেখেছে।

সোনাদিকে বলে, "ওখানে আমাকে কে না চেনে? কী পুলিশ, কী ম্যাজিস্ট্রেট, কী জজ, কী পাবলিক প্রোসিকিউটর। সরকারী বেসরকারী ডাক্তাররাও আমার চেনা। আমাকে ডাক দিচ্ছে আমার নিজের আশ্রম। ধরতে এলে সেইখানেই ধরা দেব। সহকর্মীদের ধরিয়ে দেব না। কিন্তু চায় তো ওরাও ধরা দেবে। এবার হবে আমাদের ত্যাগশক্তির অগ্নিপরীক্ষা।"

জুলির সঙ্গে পথে দেখা করে যায়। কলকাতায়। আন্দোলনে ভাঁটা পড়তে দেখে সেও ভাবছে মাটির তলা থেকে উপরে উঠবে। ধরা পড়ে তো পড়বে। ওর মনে দুঃখ কেবল এই যে বাবলীটা জিতে গেল। স্টালিনগ্রাডে রাশিয়ার জিৎ মানে কলকাতায় বাবলীদের জিৎ। রেডিওতে নাকি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। তিনি ফিরবেন। কিন্তু কবে ফিরবেন, কোন্ পথে ফিরবেন, জলপথে না স্থলপথে না আকাশপথে, কেউ তা জানে না। জুলি মনঃস্থির করতে পারছে না। এই ইঙ্গদ্বীপের পঙ্গপালগুলো যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে। ডেকে নিয়ে এসেছে মার্কিনী সাঙ্গোপাঙ্গদের। এদের দাপট দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গান্ধী তো ব্যর্থ। নেহরু তো অপদার্থ। কংগ্রেস তো আপসের ধ্যানে মগ্ন। জুলিরা একা কী করতে পারে?

"তুমি তা হলে ফাঁসী বা দ্বীপান্তরের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ?" জুলির গলা কাঁপে।

"সেও ভালো, কিন্তু এই ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভালো নয়। যখন হাতে বিশেষ কোনো কাজ নেই। আমাদের আন্দোলন তো তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে। মহাত্মার অনশনও গতিবেগ সঞ্চার করতে পারেনি। লোকের মনে কেমন একটা হতাশ ভাব। যেন কিছুতেই

কিছু হবার নয়। ইংরেজরা হেরে না গেলে ভারত ছাড়বে না। তাদের হারাবে কে? ভারতীয়রা তো নয়ই।" সৌম্য উত্তর দেয়।

সব চেয়ে খারাপটা ধরে নিয়েই সে স্বস্থানে ফিরে যায়। সেখানে দেখে তার আশ্রম সরকারের দখলে। তার খাদিভাণ্ডারও সীলবদ্ধ। কর্মীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। কাকে নিয়ে সে কী কাজ করবে? কোথায়ই বা উঠবে? পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়।

ক্যাপটেন মুস্তাফী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। "যতদিন খুশি আমার এখানে থাকতে পারো। তুমি নিজের থেকে ধরা না দিলে কেউ তোমাকে ধরতে আসবে না। ইউরোপীয়ান অফিসার একজনও নেই। সব উধাও। এখন সবাই তোমার স্বদেশীয়। হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। তুমি দেখবে পুলিশের লোকই এসে তোমাকে বলে যাবে ওরা তোমাকে ধরতে চায় না। তুমি যদি নতুন কিছু না কর তবে তুমি যতদিন খুশি আমার এখানে থাকতে পারো। তুমি ধরা দিলেও ওরা ঝট করে তোমার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেবে না। এক বছর ধরে তদন্ত চালাবে। চার্জশীট দিলেও গুরুতর অভিযোগ আনবে না। তোমার ফাঁসী বা দ্বীপান্তর ওরা চায় না। তুমি তো দেশকে মুক্ত করতেই যা কিছু করেছ। দেশের মুক্তি ওদেরও অন্তরের কামনা। পরের গোলামী অসহ্য হয়েছে। সবাই তোমার পক্ষে। তবে তলে তলে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরবিদ্বেষ চায়ের কেটলীর মতো ফুঁসছে। কখন যে ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসবে কে জানে।"

মুস্তাফী কি জানতেন না যে সৌম্য একজন ঘোষিত অপরাধী, যার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা? তাকে আশ্রয় দেওয়াটাও একটা অপরাধ। এর জন্যে তার আশ্রয়দাতারও হাতে হাতকড়া পড়তে পারে। সে সবিনয়ে বলে, "আপনি যে নির্ভীক তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার সমস্যাটা আশ্রয়ঘটিত নয়। আশ্রমঘটিত। আশ্রম যদি বাজেয়াপ্ত থাকে, ভাণ্ডার যদি বন্ধ থাকে, তবে আমার মুক্ত থাকাটা নিরর্থক। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকে একমুঠো চালও জোগাতে পারছিনে. এমন মুক্তি কি একটা আশীর্বাদ, না একটা অভিশাপ? আমার মুক্তি জেলখানায়, আমার মুক্তি দ্বীপান্তরে, আমার মুক্তি ফাঁসীকাঠে। আপনার পেসেন্টদের মধ্যে এমন গরিব কি কেউ নেই, যার জীবন নির্ভর করছে পাঁচহাজার টাকা দামের যন্ত্রপাতির উপর? তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। সে আমাকে ধরিয়ে দিক।"

মুস্তাফী 'তোবা' 'তোবা' করে ওঠেন। "বলো কী হে, সৌম্য? আমার পেসেণ্ট কি জুডাস যে ত্রিশটা রৌপ্যমুদ্রার জন্যে যীশুকে ধরিয়ে দেবে? না, বাবা, তেমন অপকর্ম কেউ করবে না। আমিই বা তার নিমিত্ত হতে যাই কেন? আমার কি পাঁচহাজার টাকা খয়রাত করার সামর্থ্য নেই? যাও, যাও, তুমি যেখানে খুশি যাও। মনে রেখো, গরিব হলেই কেউ অমানুষ হয় না। তোমারই এটা জানা উচিত, কারণ তুমি গান্ধীবাদী। আর গান্ধী তো গরিবের বন্ধু।"

সৌম্য মাফ চায়। "কথাটা আমি না ভেবে চিন্তে বলেছি। আমার বলার উদ্দেশ্য টাকাটা যেন কোনো একজনের জীবনদায়ী হয়। অহিংসাবাদীর ধর্মই হচ্ছে মানুষকে প্রাণ দেওয়া, তার প্রাণ নেওয়া নয়। দুর্ভিক্ষের দিন ও টাকা ত্রাণকার্যেও লাগতে পারে, যদি রামকৃষ্ণ মিশনে দেওয়া হয়। তেমন প্রস্তাব কি নতুন পুলিশ সাহেব শুনবেন? জাফর হোসেন তো নেই।"

"দূর, পাগল! রামকৃষ্ণ মিশন কি তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে যে রামকৃষ্ণ মিশন ও টাকা পাবে? ওটা কোনো কাজের কথা নয়। পুলিশ সাহেব গোলাম নবী আমার পেসেণ্ট। যাচ্ছি ওঁর চিকিৎসাসূত্রে। তোমার সমস্যাটার কথা খুলে বলব। দেখা যাক তিনি কী করতে পারেন।" মুস্তাফী আশ্বাস দেন।

পুলিশ সাহেব ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলেন যে সৌম্য চৌধুরী ক্যাপটেন মুস্তাফীর আশ্রয়ে। তিনি চুপি চুপি বলেন, "আপনি কি জানেন না যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনটেলিজেন্স অফিসার আছেন? তিনি সরাসরি দিল্লীতে খবর পাঠান। সৌম্যবাবুর খবর কি এতক্ষণে দিল্লীতে পেঁছয়নি? কেসটা যদি মিলিটারির নজরে পড়ে তবে ওদের হাতেই তাঁর জীবনমরণ। ও ব্যাটারা সবাই গোরা। কংগ্রেস যে যুদ্ধকালে যুদ্ধ দফতর চেয়েছিল সেটা অযথা নয়। তবে কেসটা শুরু করতে ওদের সময় লাগবে। তার আগেই যদি সৌম্যবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও সাহেব তাঁর কেসটাকে নিজের কোর্টে রাখেন তা হলে মিলিটারি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার আগেই বিচারপর্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাজা অবশ্য হবেই, কিন্তু সেটা দারুণ কিছু নয়। তার পরে সরকার হয়তো হাইকোর্টে আপীল করবেন, কিন্তু হাইকোর্ট আরো বেশী উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। ততদিনে যুদ্ধও খতম হয়ে থাকবে।"

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মীরচন্দানী। সিন্ধী। মুস্তাফী সৌম্যকে নিয়ে

হাজির করে দেন তাঁর আপিসঘরে। পরিচয় দেন, বৃত্তান্ত বলেন। সৌম্য একটা লিখিত বিবৃতি পেশ করে। সাহেব বলেন, "আচ্ছা, চৌধুরীজী, আপনি ইচ্ছে করলে আরো দু'তিন বছর আত্মগোপন করতে পারতেন। ভারত দেশটা তো ছোট নয়। কে আপনাকে ধরতে যাচ্ছিল? কাগজে তো ফোটোও ছাপা হয়নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। আপনি বলছেন আপনার মনে গভীর অনুতাপ জন্মেছে। আপনি ভেবেছিলেন ধ্বংসাত্মক কাজ হিংসাত্মক কাজ নয়। এখন বুঝতে পেরেছেন যে ধ্বংসাত্মক কাজও হিংসাত্মক কাজ। হোয়াট ননসেন্স। আবে মশায়, করেছেন তো করেছেন। তাতে হয়েছেটা কী? ওসব ব্রিজ কালভার্ট এর মধ্যেই সারানো হয়েছে। টেলিগ্রাফের তারও জোড়া লেগেছে। আপনি যদি জাপানী এজেন্ট হতেন তা হলে নিশ্চয়ই মিলিটারি ট্রাইবিউনালের পাল্লায় পড়তেন। তেমন কোনো রিপোর্ট আপনার বিরুদ্ধে নেই। রেকর্ড তো আপনার বরাবর ভালোই। এটা আপনার বুদ্ধিভ্রম। আপনার সাজা হবে বইকি। কোন্ ধারায় সাজা, কী রকম সাজা, এসব আমি পাবলিক প্রোসিকিউটরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করব। আপাতত আপনাকে জেলখানায় বিচারাধীন বন্দীহিসাবে থাকতে হবে। প্রথম শ্রেণীতেই স্থান পাবেন। তারিখ পডছে দুই সপ্তাহ পরে।"

সৌম্য কী বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পায় না। শুধু বলে, "চরম দণ্ডের জন্যেও আমি প্রস্তুত। বার্মায় যেমনটি ঘটেছে বাংলায়ও তেমনিটি ঘটত, ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিয়ে যেত, তা কি কখনো সহ্য করা যায়, সার? অসামরিক জাতি বলে আমাদের অপবাদ আছে। সে অপবাদ আমি খণ্ডাতে চেয়েছি। তবু তো কারো প্রাণ নিইনি। নিলে এমন কী অন্যায় হতো? যদি সেটা দেশরক্ষার জন্যে হতো। আমাদের দেশরক্ষা আমাদেরই দায়। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজের নয়। পেরেছে কি ওরা বার্মা রক্ষা করতে? পারত কি ওরা পূব বাংলা রক্ষা করতে, আসাম রক্ষা করতে? ছিল তো ওরা পালাবার তালে। পালাত আর পোড়ামাটি করত। আমাদের নৌকা ডোবাত, ধানচাল পোড়াত, বন্দর ভাঙ্‌ত, রেল লাইন ওড়াত, ব্রিজ কালভার্ট ধ্বংস করত। ওরা করলে এসব হতো মিলিটারি নেসেসিটি! আমরা করলে সাবোটাশ! যাক্‌- জাপান আসছে না। আনন্দের কথা। কিন্তু ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন কোনো কোনো ঐতিহাসিক আমাদের সাধুবাদ দেবেন। লিখবেন জাপানীরা যে এল না তার কারণ তারা

বুঝতে পেরেছিল যে আমরা তাদের হাতের পুতুল না হয়ে পায়ের কুড়ুল হতুম। ইংরেজের শূন্যতা পূরণ করতুম আমরাই। জাপানীরা নয়। এখন ইংরেজরা বাহবা নিচ্ছে নিক। আমরা বাহবার জন্যে দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করিনি, আমাদের ওটা অ্যাডভেঞ্চারও নয়। বুদ্ধিভ্রম কেন বলছেন, সার? আমরা কি কম বুদ্ধি এঁটেছি? আমাদেরও একটা ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ছিল। কিন্তু থাক ওসব কথা। আমি কারো নাম ফাঁস করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের হাতে ক্ষমতা যেদিন আসবে—যদি কখনো আসে—তা হলে ওঁদের সোনার পদক দিতে বলব। তবে এটাও আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে আমরা যেটা অনুসরণ করেছি সেটা গান্ধীপন্থা নয়। বাপুর নামে কলঙ্ক রটেছে বলে আমি নিরতিশয় দুঃখিত। তাঁর অনশনের জন্যে আমিও দায়ী। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। একভাবে না একভাবে। আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি নিজেকে ছাড়ব না। ক্রমফাল্ড সাহেবকে গান্ধীজী যা বলেছিলেন আপনাকেও আমি তাই বলছি। দিন আমাকে আপনার ক্ষমতায় যেটা কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু আমার সাথীদের যেন রেহাই দেন।"

মীরচন্দানী শুনে অভিভূত হন। বলেন, আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন। আমার কর্তব্য আমি করব।" এর পর মুস্তাফীর দিকে ফিরে বলেন, "এবার আপনার পালা। ওই পাঁচহাজার টাকা পুরস্কারটা আপনারই পাওনা, ক্যাপটেন মুস্তাফী।"

"আরে, না, না। আমি ও টাকা স্পর্শ করতে পারিনে। লোকে বলবে অত বড়ো দেশপ্রেমিককে ধরিয়ে দিয়েছি আমি, দেশদ্রোহী অর্থপিশাচ। না, না, ও টাকা হারাম। ও টাকা আপনারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণ তহবিলে দিন। যারা খেতে পাচ্ছে না তারা খেতে পাবে।" মুস্তাফী মিনতি করেন।

"দুর্ভিক্ষ! কোথায় দুর্ভিক্ষ! ওটা সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। চাল কম পড়েছে। আমরা চাল আনিয়ে নিয়ে বাজারে ডাম্প করব। বাজার ভাসিয়ে দেব। খেতে না পেয়ে একটিও মানুষ মরবে না।" মীরচন্দানী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পান না।

যথাকালে সৌম্যর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রথম শ্রেণীতে ওর আপত্তি এত তীব্র যে ওটাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। তাতেও ওর আপত্তি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, "একজন বিলেতফের্তা বাঙালী ভদ্রলোককে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করতে আমার হাত উঠবে না।"

খবরটা কলকাতার কাগজে বেরিয়ে যায়। জুলি তা পড়ে কেঁদে ফেলে। তারপরে সামলে নিয়ে বলে, "ভারী তো তিন বছর! দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

একদিন ইলিসিয়াম রো থেকে এক বাঙালী পুলিশ অফিসার আসেন মিসেস সিন্‌হার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। "আইচ আমার নাম। শুনে দুঃখিত হবেন যে আপনার মেয়ে মঞ্জু আমাদের ওখানে গিয়ে স্বেচ্ছায় সারেণ্ডার করেছে। আমরাও দুঃখিত। ওর হাতে বোমা নেই, রিভলভার নেই, কিন্তু যা আছে তা আরো মারাত্মক। কলম! ইংরেজ সৈনিকদের সম্বোধন করে ও লিখেছে, 'তোমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন, মাতৃজাতি বিপন্ন, এদেশে এসেছ তোমরা কী করতে? আমাদের মাতৃভূমিকে ও মাতৃজাতিকে বিপন্ন করতে? তোমরা এসেছ বলেই জাপানীরা আসছে, তোমাদের তাড়াতে। তার আগেই তোমরাও সরে পড়ো না কেন? কুইট ইণ্ডিয়া।' আমেরিকান সৈনিকদের সম্বোধন করে লিখেছে, 'ওয়াশিংটন ও লিংকনের বংশধর! লিবার্টি মূর্তির উপাসক! তোমরাও শেষকালে কন্‌স্ক্রিপ্ট হলে! কোন্ মহান আদর্শ সাধন করতে? ভারতের মাটিতে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে? ভেবেছ আমরা উলুখড়? দুই আগুনের মাঝখানে পড়ে প্রাণ হারাব? শাদা মানুষের সঙ্গে হল্‌দে মানুষের যুদ্ধে কালো মানুষের টান কার দিকে তা অনুমান করতে পারো। নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবহারটা যদি একটু ভালো করতে তা হলে না হয় আমাদের সহানুভূতি আশা করতে। তবে আমরা কেউ জাপানীদের অগ্রগতি চাইনে। তার আগেই তোমাদের পশ্চাদ্‌গতি চাই।' ভারতীয় সৈনিকদের সম্বোধন করে লিখেছে, 'তোমাদের দেশরক্ষার জন্যে তোমরাই তো যথেষ্ট। তোমাদের কেন পাঠানো হচ্ছে ইউরোপে, আফ্রিকায়, পশ্চিম এশিয়ায়? ইঙ্গ-মার্কিনদের কেন ডেকে আনা হচ্ছে তোমাদের জায়গায়? ওদের জন্যে কত গোমাংস আর কত নারীমাংস রোজ সরবরাহ করতে হচ্ছে, জানো? হয় চাকরি ছেড়ে দাও, নয় ওদের ওসব খোরাক বন্ধ করো। যে যার নিজের দেশ থেকে আনিয়ে নিক ওসব খোরাক।' দেখুন, মিসেস সিন্‌হা, এ সমস্তই আমাদের প্রাণের কথা। ওকে আমরা প্রাণ ধরে মিলিটারি ট্রাইবিউনালের খপ্‌পরে ঠেলে দেব না। কিন্তু বেকসুর ছেড়ে দিই বা কী করে? বড়ো সাহেবকে বুঝিয়েছি যে ওর ভগ্নীপতি স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। তাঁর মানরক্ষা করতে হবে। হোম ইণ্টার্ন করাই শ্রেয়। আপনি যদি ওঁকে রাজী করাতে পারেন তা হলে আমরাও মনস্তাপ থেকে বেঁচে যাই।"

জুলির সঙ্গে কথা বলে ওর মা মিস্টার রবার্টসনকে বলেন, "ওর ফিয়াঁসে সৌম্য চৌধুরীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে স্থান হয়েছে। সমতা রক্ষার জন্যে ওকেও দিতে হবে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে স্থান। অবুঝ, একগুঁয়ে মেয়ে। আমার কন্ট্রোলের বাইরে। আমার মেজ জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনারাই যা করবার করবেন। আমি তাতেই রাজী।"

তাই হলো। পর পর দু'দুটো খারাপ খবর পড়ে যূথিকার মন খারাপ বলে খারাপ। মানস তাকে সান্ত্বনা দিতে বলে, "যারা চড়া স্টেকে খেলতে যায় তারা চড়া স্টেকে জেতে বা চড়া স্টেকে হারে। আর একটু হলে ওরাই তো জিতত। প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করে দেশের একাংশের স্বাধীনতা ঘোষণা করত। হয়তো বেশীদিনের জন্যে নয়, তবু ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা লাল অক্ষরে ছাপা হতো। মহাত্মার একুশ দিনের অনশনও চড়া সেটকের খেলা। শিরদার তো সরদার। মরতে মরতে বেঁচে গেলেন।"

গান্ধীজীর অনশন সারা হতে না হতে তাঁর দেশবাসীর অনশন শুরু হয়। মানস ও যূথিকার মন আরো খারাপ। ছুটি নিয়ে মানসসরোবর অভিমুখে যাত্রা করে মানস ও তার হংসবলাকা। থামে আলমোড়ায়। অত দূর থেকে শুনতে পায় না বাংলাদেশের রাজধানীর রাজপথে কারা সব কেঁদে বলছে, "একটু ফ্যান দাও, মা। একমুঠো ভাত দাও, বাবা।" বিপ্লবীরা কর্ণপাত করে না। বিপ্লবের লগ্ন বয়ে যায়।

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥